শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

(কন্যারূপে)

শিবানীশঙ্কর

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—ফাল্গুন ১৩৭১

SHISHURA MATRIKRORA

প্রকাশনা :
তুলিলিপি
৫৭, এ-নগর
কলিকাতা-৮৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
শ্রীরাধানাথ দত্ত
অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫ই, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

মাতা বসুমতী—পিতা রত্নাকর। আকাশ বাতাস সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র-মণ্ডল তার পরিবেশ—প্রতিবেশী। অনন্তকাল ধরে চলে আসছে সকলের সহাবস্থান। সাগর কখনও ধরিত্রীকে—এই মাটির পৃথিবীকে—ত্যাগ করে না। চিরচঞ্চল সাগরের ঢেউগুলি যেন সহস্র বাহু বিস্তার করে ধরণীকে ঘিরে থাকে। সর্বংসহা অচঞ্চলা ধরণীও সাগরের কোলে নিজেকে সমর্পণ করে আছে—নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে।

এই পিতা মাতাই হল সকল মানুষ পশুপাখী কীট পতঙ্গ গাছ পালা তৃণলতার আদি ও উৎস।

আদি অবিনশ্বর এই পিতা মাতার সন্তান সকলেই মরণশীল। পতি-পত্নী, মাতা-পিতা—পুত্র-কন্যা—কেউই চিরজীবি নয়। কেন? আদি পিতা মাতার মত সকলে কেন একে অপরকে অসীম আদরে ভালবাসায় চিরকাল বুকে ধরে রাখতে পারে না? লোকে বলে ভগবানের লীলা। ভগবান কে? অমরত্ব কি?

ভগবান এই আদি পিতা মাতা। তারা অমর। কিন্তু অমরের সন্তানরা অমর নয়। কি আশ্চর্য্য এই বৈপরীত্য! সে কি সৃষ্টির বৈচিত্রের জন্য—নব সৃষ্টির আকর্ষণে? স্বামী স্ত্রীকে—স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যাবে বলেই যেন তাদের মিলন হয়। সন্তানকে মাতৃহারা করতে বুঝি মা জন্ম দেয় শিশুকে। শিশুরাও জন্মে, আবার মায়ের কোল খালি করে চলে যায়—বাবাকে ভাসিয়ে দিয়ে যায় দুঃখের সাগরে।

শত কাতর প্রার্থনাতেও এই মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। আর সেজন্যই আছে সংসারে চির বিচ্ছেদের বেদনা। দুঃখ শোক ব্যথা বেদনা আছে সুখ আনন্দ উল্লাস উৎসবের পাশাপাশি। আছে হাসি, আছে অশ্রু। সুখের অপর দিক দুঃখ—আনন্দের ওপারে বিষাদ।

দুই

অসীম সাগরের তীরে বহু পুরোনো ছোট্ট এক জনপদ—মন্দির শহর।

শ্রাবণ মাস—তারিখটা বোধ হয় ৭ই, রবিবার। সময়টা ছিল বর্ষন মুখর উষাকাল। শ্রাবণের অঝোর ধারায় ভেসে যাচ্ছে ধরণীর বুক। অল্প ক'হাত দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশি প্রবল বর্ষণে ও দুরন্ত বায়ুবেগে অশান্ত হয়ে উঠেছে।

এ দিকে সমুদ্র তীরের এই ছোট্ট অথচ প্রাচীন মন্দির শহরে মৈত্রদের প্রায় কুড়ি বছরের পুরোনো বাড়ীটার লেগেছে এক চাপা ব্যস্ততার ছাপ। গৃহকর্তা মহিম মৈত্রের বড় পুত্রবধু দ্বিতীয়বার সন্তান সম্ভবা। অপরূপ রূপসী গিরিনজায়া পদ্মিনী দেবী আর একটি শিশুর আগমন লগ্নে বেদনাবিধুর অচৈতন্য প্রায়। আঁতুড় ঘরে শিক্ষিতা ধাত্রী ও তার সহকারিণী ঘাসউলী হোতার মা প্রাথমিক আয়োজনাদি সম্পন্ন করে প্রসূতির সেবায় রত। গৃহ কর্তা মৈত্র মহাশয় অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে উঠে থেকে বাইরের প্রশস্ত বারান্দায় আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত—চিন্তামগ্ন। বড়পুত্র গিরিন পিতার দৃষ্টির আড়ালে বাড়ীর চিলে কোঠায় আশ্রয় নিয়েছেন। মৈত্রগৃহিনী নির্ঝরিণী দেবী ভিতরের বারান্দায় বসে ঝি চাকরদের ব্যস্তভাবে নানা নির্দেশ দিচ্ছেন—'বৃষ্টির ছাঁটে আঁতুড়ের ভিতর যেন জল না যায়'—'আঁতুড় ঘরে মালসায় আগুন যেন ঠিক থাকে'—'আঁতুড় ঘরের প্রদীপ যেন নিভে না যায়।' কোলে তাঁর সাড়ে তিন বছরের প্রথমা নাতনী কিঙ্কিণী—সংক্ষেপে কিঙ্কু। কাঁকনের মতই সে মিষ্ট কলকণ্ঠী। ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে আধো আধো ভাষায় জিজ্ঞেস করল—

'বলত থাকুমা—ভাই না বোন?'

কাছাকাছি ছিলেন বড়কাকা সদ্য ডাক্তারী পাশ করা হৈম। তিনি মুখ ভেংচে ধমক দিলেন—

'চুপ কর। ঐ টুকু মেয়ে, এখনই বলে কিনা-ভাই না বোন!'

অদূরে দাঁড়িয়ে ভাবী ইঞ্জিনীয়ার ছোটকাকা অবিনাশ প্রশ্রয় ভরা চোখে ভাইঝির দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসলেন। মহিমের অতি বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী, সকলের কর্তামা, নিস্তারিণী দেবী তাঁর শোবার ঘরের একপাশে পূজোর

আসনে বসে নতুন একটি প্রাণের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনায় নিবিষ্ট।

সেই মুহূর্তে উষালগ্নে প্রচণ্ড বর্ষণ মুখর প্রকৃতির কান্নাকে ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বেজে উঠল সদ্যজাত শিশুর কান্নার ধ্বনি। পারিপার্শ্বিক ভুলে হৈম ছুটে যেতে চাইলেন আঁতুড় ঘরে—ছোট অবিনাশ হাত ধরে তাঁকে বাধা দিলেন। ধাত্রী ও হোতার মার ব্যস্ততা। ঠাকুমা শাঁখে দিলেন ফুঁ। মৈত্র মহাশয় ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ভিতরের বারান্দায়। গিরিন চিলেকোঠা থেকে গুটি গুটি নেমে এলেন সিঁড়ির শেষ ধাপে। বৃষ্টি ভেজা বারান্দার একপাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুর পিটার চমকে জেগে, উঠে দাঁড়ায়—হাই তুলতে ভুলে গিয়ে ধীরে ধীরে লেজটা নাড়তে থাকে। সাময়িক মানবিক নিস্তব্ধতা। ওদিকে চলেছে প্রকৃতির বিরামহীন কান্না।

ক্ষণিক বিরতির পর সদ্যজাত শিশুকণ্ঠ আবার সেই কান্নায় সুর মেলাল ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া। এবারের কান্না অনেক চাপা—কিছুটা একটানা। অঝোর বর্ষণে ও শিশুর কান্নায় এই আনন্দময় শুভ মুহূর্তটি ভারী হয়ে উঠল। বুকভরা উৎকণ্ঠা ও আবেগ নিয়ে মৈত্র পরিবারের প্রত্যেকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে আঁতুড় ঘরের দিকে। কিন্তু কথা বলতে ভুলে গেছে—অজানা বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। সেই মুহূর্তে আঁতুড় ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে মুখ বাড়াল বাসউলী হোতার মা—এক গাল হেসে ঘোষণা করল—

'মেয়ে হয়েছে গো—সোনার প্রতিমা, যেন সাক্ষাৎ রাজকন্যে। দুধে আলতায় গোলা রং—মেয়ে রংএ বুঝি তার মাকেও হার মানায়।'

শুনে ঠাকুমা আবার শাঁখে দিলেন ফুঁ—পরপর তিনবার। বললেন—

'ঘরে আমাদের লক্ষ্মী এসেছেন।' আশপাশের নারীকণ্ঠে উঠল সমবেত হুলুধ্বনি। প্রকৃতির তুমুল আলোড়নে সত্যিই বুঝি সেদিন সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী উঠে এলেন মৈত্র মহাশয়ের ঘরে। মৈত্র মহাশয় দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম জানালেন—তারপর ধীর পায়ে অন্দর মহল থেকে সরে এলেন। কর্তামা তাঁর পূজার আসনে বসে আভূমি নত হয়ে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

ততক্ষণে বাতাসের বেগ অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু অবিশ্রান্ত বর্ষণের বিরাম নেই। মাতা ধরিত্রী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। কেন এত কান্না? কিছুক্ষণ কেঁদে শিশু কন্যাটি চুপ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির কান্না যে থামে

না। তার চোখে এত জল কেন? যে সুন্দর শিশু কন্যাটির এই মাত্র আবির্ভাব ঘটল তারই জন্য কি ধরণীর এত উদ্বেগ—আকুলতা? ধরিত্রী কন্যা সীতার মত এই কন্যাও কি হবে চির দুঃখিনী? ভাবী জীবনের বার্তাবহ এই কান্না? মাতা ধরিত্রীকে বেষ্টন করে আছে যে মহাসমুদ্র—রত্নাকর, সে-ও বারবার ধরণীর তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ে একদিকে জানাচ্ছে তার অতলান্তিক আক্ষেপ, আর দিকে দয়িতা ধরিত্রীকে দিচ্ছে সান্ত্বনা। যে সমুদ্রের বারি সিঞ্চনে মাতা বসুন্ধরা আজ শস্য শ্যামলা জননী, তারই কোলে সদ্য-আসা এই জন্ম দুঃখিনী কন্যার ভবিষ্যতের চিন্তায় তাই বারবার দুলে উঠছে আদি পিতা রত্নাকরের বুক। সহস্র বাহুর আলিঙ্গনে বসুমতীকে জড়িয়ে তার কান্নার আবেগ প্রশমিত করার চেষ্টা করছে—চেষ্টা করছে নিজের বেদনাকে সংহত করতে। এক অপরূপ রূপসী শিশু কন্যার জন্ম লগ্নে কাঁদছে মাটির পৃথিবী, উদ্বেল হয়ে উঠছে সাগরের বুক, কাঁদছে বিশ্বপ্রকৃতি।

সময়ে অর্ধচৈতন্য ভাব থেকে চেতনায় ফিরে এসে পদ্মিনী দেবী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমে আঁতুড় ঘরের অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছুই ঠাহর হল না। চোখ সয়ে এলে প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় চোখে পড়ল অদূরে শায়িত একরাশ জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে একটি শিশু—যেন অঞ্জলি ভরা এক-রাশ শিউলি ফুল। প্রদীপের আলো না থাকলেও আঁতুড়ের এই প্রায়ান্ধকার ঘরে সে শিশু বুঝি নিজের রূপের আলোতেই ফুটে উঠত। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ধাইমাদের দিকে তাকালেন তিনি। খাসউগ্গী হোতার মা ইশারা করল ধাত্রীকে। ধাত্রী শিক্ষিতা—নিজের মত করে জিজ্ঞাসুর কৌতূহল নিবারণ করল—

'কন্যা-রূপে সরস্বতী।'

ক্লান্তিতে মায়ের চোখ দুটি বুজে এল। পরক্ষণেই আবার চেয়ে দেখলেন, একটা হাত বাড়িয়ে কন্যার শরীর স্পর্শ করলেন গভীর স্নেহে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন আত্মজা—আপন প্রতিচ্ছবির দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে আনন্দে বেদনায় দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভাবলেন, সত্যি বুঝি শাপভ্রষ্টা দেবী সরস্বতী তাঁর কোলে এসেছেন। কিন্তু তিনি পুরাণে শুনেছেন, শাপভ্রষ্টারা নিজেরা কখনও সুখী হন না—অপরকেও ভাসিয়ে দিয়ে যান চিরদুঃখের সাগরে। না, না—ছিঃ ছিঃ—এসব তিনি কি ভাবছেন? ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর এইটুকু মেয়ে—তার কেন অমঙ্গল হবে?

ষাট! ষাট! ভাবতে ভাবতে আপন হাতে চোখের জল মুছলেন পদ্মিনী দেবী।

বেলা বাড়তে বৃষ্টিও থেমে এল। এক সময়ে কুল পুরোহিত চক্রবর্তী মহাশয় এলেন গৃহকর্তার আমন্ত্রণে নবজাতকের জন্মলগ্ন বিচার করতে। পাঁজি পুথি দেখে নানা দিক ও লক্ষণ বিচার করে বললেন—

'এ কন্যা সর্ব সুলক্ষণা, মিষ্ট ও মৃদু ভাষিণী হবে। তবে কিছু অমঙ্গলের ছায়া দেখা যায়, বিশেষ করে আয়ুর ক্ষেত্রে।' এর বেশী তিনি আর কিছু বললেন না। সমবয়সী বন্ধু স্থানীয় মৈত্র মহাশয়ের কাছ থেকে ভারাক্রান্ত মনে তিনি বিদায় নিলেন।

কিছুদিন ধরে এই নিয়ে মৈত্র পরিবারে চলল বিষণ্ণ আলোচনা। নিখুঁত নিষ্পাপ ফুটফুটে মেয়েটিকে নিয়ে সবার দুশ্চিন্তা। সুস্থ সবল এই শিশুটি কি সত্যিই স্বল্পায়ু! বাড়ীর পুরুষ মহল কথাটিকে আমল দিতে চান না।

এদিকে মায়ের কোমল মনে আশঙ্কার কাঁটা সবসময় খচখচ করে—শঙ্কায় বুক কাঁপে। মা, ঠাকুমা, ঘাসউলী হোতার মা মিলে আড়ালে আলোচনা করতে লাগলেন। নানা রকম তুকতাক, মেয়েলী বিশ্বাস, প্রথা ও ব্রত নিয়ে চলল কানাকানি। বৃদ্ধা কর্তামার মতামতটাও নেওয়া হল। শেষে ঠিক হল, কোন এক অনাত্মীয়া সপুত্র সধবার হাতে যদি এই কন্যাকে গচ্ছিত রাখা হয় তবে নিশ্চয়ই আশু অমঙ্গলের ছায়া শিশুটির উপর পড়বে না। প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন পালন করে শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে শুভক্ষণে শিশু কন্যাকে তুলে দেওয়া হল ঘাসউলী হোতার মার কোলে তিন কড়ির বিনিময়ে। নিয়ম হল, ঐ রাতটি কন্যা থাকবে হোতার মার কোলে—তবে যদি রাতের গভীরে মা ষষ্ঠী কন্যার ভাগ্যলিপি রচনা করতে এসে আনমনা হয়ে অন্য কিছু লিখে যান, দিয়ে যান অধিক আয়ু।

রাত কাটল, কি ভাগ্যলিপি রচনা হল কেউ জানে না। পরদিন সকালে কথামত কন্যাটিকে পদ্মিনী দেবীর কোলে দিয়ে ঘাসউলী হোতার মা নিজের গ্রামে ফিরে গেল। কথা রইল—এখন থেকে পদ্মিনী দেবী আপন কন্যাকে পালিকা মা-রূপে লালন পালন করবেন, বিবাহাদি জাত কর্মের সময় ঘাসউলী হোতার মাকে ঐ তিনটি কড়ি দিয়ে তবে গচ্ছিত কন্যা রত্নকে আবার একান্ত ভাবে নিজের করে ফিরে পাবেন পদ্মিনী দেবী। এ সবই হল মেয়েলী বিশ্বাস আর মায়ের অসীম মমতার ফলশ্রুতি। এই ভাবে বিধিলিপি এড়িয়ে যাওয়া বা পরিবর্তন করা গেল কিনা তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

তিন

বিধিলিপি যাই হোক, শিশু কন্যা তার আপন প্রাণশক্তিতে সুস্থ দেহে দিনে দিনে বড় হতে লাগল। বাবা-মার সে নয়নের মণি, সকলের কাছেই পায় অফুরন্ত আদর আর প্রশ্রয়। দিদি কিঙ্কিনীর সে সবসময়ের খেলার সাথী, এক মুহূর্ত তার কাছ ছাড়া হয়না। ঘরের কাজে মা-যখন ব্যস্ত, দিদিই তখন মায়ের মমতা নিয়ে তাকে আগলে রাখে। মা-ও পারত পক্ষে দ্বিতীয়াটিকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে চান না। সময়ে তাকে নাওয়াচ্ছেন খাওয়াচ্ছেন ঘুম পাড়াচ্ছেন কাজল পরাচ্ছেন সাজাচ্ছেন মনের আশ মিটিয়ে। প্রথমা থাকতেও বাবা-মার দ্বিতীয়ার প্রতি স্নেহ মমতা যেন অতিরিক্ত ধারায় আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়ছে। বাবা চিরকালই গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের করুণার প্রকাশ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু মা তাঁর সমস্ত প্রাণমন একান্তভাবে ঢেলে দিয়েছেন দ্বিতীয়ার প্রতি। সে যে এখন অপরের গচ্ছিত ধন স্বরূপ। কেউ ভুলতে পারে না জন্মলগ্নের ভবিষ্যৎবাণী।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয়ার মুখে ভাত ও নামকরণ হয়েছে। শিউলি ফোটা শ্রাবণের ধারা বেয়ে নেমে এসেছে যে মেয়েটি—বাবা মা আদর করে তার নাম রেখেছেন—'শ্রাবণী'—গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এবং কর্তামার অনুমোদন নিয়ে। সবাই আদর করে ডাকে 'শবু' বলে। লোকে বলে নদীর নামে, মাসের নামে নাম রাখলে চিরকাল দুঃখ পায়—অকালে ঝরেও যেতে পারে। সে কথাটা কারো মনে পড়ল না। মা ও বাড়ীর সকলের অফুরন্ত আদর যত্নে শ্রাবণী বড় হতে লাগল—এমনি করে কেটে গেল আরও দু আড়াই বছর। পেরিয়ে গেল হামাগুড়ি থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা-র দিন গুলি।

শ্রাবণী এতদিনে বেশ বড়সড় হয়েছে। হাঁটা চলা থেকে এখন বেশ দৌড়োদৌড়িও করে। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ নিয়ে রাঙা পায়ে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। দিদি কিঙ্কিনীর সঙ্গে যখন সে বাড়ীর উঠোনে কুমীর কুমীর খেলে বাড়ীর কুকুর পিটার তখন তাতে রীতিমত যোগ দেয়—একবার কিঙ্কুকে দৌড়তে দেখলে তার সঙ্গ নেয়, আবার শবুকে দৌড়তে দেখে তারও সাথে দৌড়য়

কিছু না বুঝেই। পিটারকে নিয়ে ওরা আর পারে না, ওকে খেলতে নেয়নি তবু খেলতে নামবে, পায়ে পায়ে দৌড়বে।

শ্রাবণীর গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়েছে, যেন ফেটে পড়ছে। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে গালে মুখে সর্বাঙ্গে রক্তিমাভা, বিশেষ করে ঠোঁট দুটি যেন ডালিম ফুলের পাপড়ি। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর সুডৌল কোমল রমণীয়, হাতের আঙুলগুলো চাঁপার কলির মত, চোখ দুটো বড় বড়, টানা টানা ভুরু দুটি এখনই যেন বাঁকানো ধনুকের মত স্পষ্ট, সুন্দর সুঠাম চেহারা, সুন্দর মুখ—শুধু নাকটা একটু চাপা। লাল ইঁটের পরে খালি পায়ে যখন ছুটাছুটি করে ঘেমে নেয়ে মার কোলে ফিরে আসে, মা তার গা মুখ মুছিয়ে কোলে তুলে আদর করে চুমো খান। এখন শবুর মুখে বেশ কথা ফুটেছে, মার আদরে কোলে বসে বলে—

'মা, মা—পিটার দুষ্টু, আমাদের খেলতে দেয়না।'

সব কথাই বেশ স্পষ্ট বলতে পারে। মিষ্টি করে হাসে, মিষ্টি করে কথা বলে, কিন্তু বেশী কথা বলে না।

এত বড় মেয়ে শবু আজও কিন্তু ভাত খেতে চায় না। পদ্মিনী দেবীর মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। স্বামীকে বলতে তিনি বললেন—

'অত ব্যস্ত হবার কি আছে, যখন ইচ্ছে হবে তখন ভাত খাওয়া ধরবে।'

এটা কি কোন অসুখের লক্ষণ? প্রশ্ন শুনে ডাক্তারী পাশ করা হৈমবাবু বললেন—

'ভাত খায় না—দুধ ত খায়। আর দুধেই আছে সবরকম খাদ্যগুণ।'

ডাক্তার স্বামী, ডাক্তার দেওর কেউ গা করে না দেখে মা পদ্মিনী দেবী শাশুড়ী ঠাকরুনের শরণাপন্ন হলেন। মৈত্র গৃহিণী বললেন—

'নাই বা খেল ভাত। আমাদের গোয়াল ভরা গরু, অনেক দুধ হয়—দুধের অভাব কি, দুধই খাক।'

দেখে শুনে মা পদ্মিনী দেবী হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারে কোন কিছুর অভাব নেই। নেই কোন ঝগড়া মনোমালিন্য মারা-মারি কাড়াকাড়ি। নাই-মেয়ের সংসারে প্রথম দুটি মেয়ে কিন্তু আর শবু স্নেহে আদরে ভালবাসায় সুখে ও শান্তিতে মানুষ হচ্ছে। তারই মধ্যে শবুর প্রতিই সকলের নজরটা যেন একটু বেশী। ওকে যে দেখে সে-ই একবার কোলে তুলে আদর না করে ওর দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে না। দিদি

কিস্কুর সে গর্ব তার বোন কত সুন্দর, সবাই তাকে আদর করে, ভালবাসে।

ঠাকুমার আছে আড্ডা দেওয়া স্বভাব, রোজ বিকালে ও বাড়ী সে বাড়ীতে বসে মহিলাদের তাসের আসর। যাতায়াত তাঁদের বাড়ীর খিড়কী দুয়োর দিয়ে একেবারে অন্দর মহলে। সদরে থাকেন কর্তা ব্যক্তিরা—আব্রু রেখে ত চলতে হবে। মৈত্র পরিবারে সচ্ছল অবস্থার গুণে বাড়াতে ঝি চাকর রান্নার ঠাকুর গরু বাছুর এমনকি কিছু জমিজমা ও শেয়ারের কাগজও আছে। কিন্তু ঠাকুমার কি এক অদ্ভুত স্বভাব। বাইরে যখন যাবেন গা ভর্তি থাকবে চাপ চাপ সোনার গহনা, চওড়া পাড় শাড়ী পরণে, ওপরে জড়ানো থাকবে গায়ের চাদর—মেয়েদের আব্রু, আর থাকবে খালি পা। পুত্র পুত্রবধূ সবাই মিলে হাজার সাধাসাধি করেও পাদুকায় তাঁর পা গলাতে পারে নি। বলেন—

'মেয়েমানুষের পায়ে জুতো মানায় না।'

তিনি যখন আড্ডায় বের হন সঙ্গী হয় বাড়ীর এক চাকর আর দুই নাতনী। কিস্কু বড়, সে হেঁটেই চলে ঠাকমার পাশে পাশে। সে কি শবুর মত ছোট যে কোলে চড়ে যাবে? আর শবু? সে রওনা হয় চাকরের কোলে-পিঠে চড়ে—আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছয় পাঁচ কোল করতে করতে। কারণ তার ঐ সুন্দর ফুটফুটে চেহারা—তার উপর বেড়াতে যাবার আগে মা তাকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। যাঁরাই ঠাকুমার সঙ্গিনী হন তাঁরা প্রথমেই হাত বাড়িয়ে শবুকে নিজের কোলে তুলে নেন। একটু যেতেই তিনি বলেন—

'দিদি, আপনার এই নাতনীকে কোলে করা সহজ কথা নয়, যা ভারী। কোমর ব্যথা হয়ে যায়।'

ততক্ষণে আর একজন পথ সঙ্গিনী জুটে গেছেন, তিনি বলেন—

'দাও ভাই আমার কোলে।' বলে আদর করে শবুকে নিজের কাঁখে তুলে নেন। কিস্কু নাচতে নাচতে পাশেপাশে চলে আর অনর্গল কোলে বসা শবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকে। তাস খেলার বাড়ীতে পৌঁছে ঠাকুমা চাকরকে বলে দেন বাড়ী চলে যেতে, আর সন্ধ্যের সময় আবার এসে যেন নিয়ে যায়। চাকরটা রঙ্গ করে বলে—

'আপনহর ঠিয়া গল্পটা অগরু সারি রাখিব।'

যেদিন ঠাকুমার দলবল ম্যাটিনি শো সিনেমাতে যায় তখন তাঁর কোলে

চড়ে শবু ও হাত ধরে কিঙ্কু দুজনেই হলে ঢুকে পড়ে—ওদের দুজনের টিকিট লাগেনা।

বড় মন্দিরে ছিল কি এক বিশেষ পুজো। চাকর ও ছোট নাতনী শবুকে নিয়ে ঠাকুমা গেছেন পুজো দিতে। সেখানে এক অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে দেখা। শবুর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মহিলাটি ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

'ব্রাহ্মণ?' ঠাকুমা সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন।

'বিপ্রবর্ণ, মেয়েটিকে দেখেই বোঝা যায়।' মহিলাটি মন্তব্য করলেন।

বাড়ী ফিরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে পুত্রবধূকে সেই কথা উল্লেখ করে হেসে ঠাকুমা বললেন—

'কে জানে, আমার রং দেখে উনি আমাকে হয়ত চাকরানী শূদ্রাণী বলে ধরে রেখেছেন।' শুনে পুত্রবধূ লজ্জায়, কন্যা গরবে অধোমুখী হলেন।

আবার কদিন পরে সেই মন্দিরে আর এক মহিলার সাক্ষাৎ পান ঠাকুমা, সঙ্গে এবার দুই নাতনী—কিঙ্কু ও শবু। মহিলা কোন এক বৈষ্ণব সাধিকা হবেন। শবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন—

'এ কন্যার নিশ্চয়ই শ্রীরাধার অংশে জন্ম। জয় রাধে।'

মন্দির ফেরৎ শাশুড়ীর মুখে সে কথা শুনে মা পদ্মিনী দেবী ভাবতে লাগলেন—রাধা ত চির দুঃখিনী, সারাজীবন কেটেছে মিথ্যা কলঙ্কে আর শাশুড়ী ননদীর নিন্দা গঞ্জনায়। আমার সোনার পুতুলী শবুরও কি তাই হবে? আশঙ্কায় মার বুক কাঁপে। মেয়েকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বারবার আশীষ চুম্বনে মেয়ের সব অমঙ্গল মুছে দিতে চাইলেন।

একদিন কে যেন কিঙ্কুকে ঠাট্টা করে বলেছে—

'শোন কিঙ্কু, শবু তোর আপন বোন নয়, দেখিস না মা শবুকে কি ভীষণ ভালবাসে। আর তোকে?'

কিঙ্কু তাকে দুহাতে মেরেধরে মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল—

'বল মা, শবু আমার আপন বোন নয়? আমি কি তোমার মেয়ে না?' মা বললেন—

'তোমরা আমার সাত রাজার ধন জোড়া মানিক। শবু ছোট বলে ওকে সবাই বেশী আদর করে। তোমাকে রাগানোর জন্য ওকথা বলেছে।'

সেই থেকে কিঙ্কু আর কখনও পরের কথায় কান দেয়নি। শবুকে আরো

নিবিড় করে আপন করে নিয়েছে।

দুপুর বেলা। ঘরের কাজ সেরে সবাই যে যার মত বিশ্রাম নিচ্ছে। মৈত্র মহাশয় সরকারী সফরে কয়েক দিনের জন্য বাইরে গেছেন। ঠাকুমা দুই নাতনীকে নিয়ে শুয়েছেন। বড়দের ঐ এক দোষ! রোজ রোজ দুপুরবেলা শুতে বলবে। নিশুতি দিনদুপুরে খেলা আর গল্প কেমন সুন্দর জমে—ওরা কেন তা বোঝে না!

না বুঝুক। যেই দেখেছে ঠাকুমা ঘুমিয়েছে অমনি দুবোন গুটি গুটি উঠে পা টিপে টিপে সোজা একেবারে উঠোনে। পিটার ওদের সব সময়ের সাথী, বিশেষ করে এই দুপুর বেলাটায়। পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে। ওরা দুজনে ফিসফিস করে গল্প করছে। বাবা মেয়েদের পুতুল খেলা পছন্দ করেন না, এতে নাকি মেয়েরা অল্প বয়সে ডেঁপো হয়ে ওঠে। তাই ওদের কোন পুতুল নেই। না-ই বা থাকল। বাড়ীর নানান ফেলনা জিনিষ থেকে কল্পনায় প্রয়োজনীয় খেলনার মালমশলা যোগাড় হয়ে যায়। শিশু মনে যে কল্পনার স্রোত অবিরাম বয়ে চলে আর ছোঁয়ায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষও হয়ে ওঠে মহা মূল্যবান। কল্পনার মূল্যবান জিনিষগুলোকে একখানে জড়ো করে নানান ভাবে সাজিয়ে নানা ধরনের খেলা হয়।

'ওই যাঃ একটুখানি চুন লাগবে যে, ঘটে চুনের দাগ দিতে হয়। যা তো শবু খাটের নীচে থেকে একটু চুন নিয়ে আয়'—দিদি কিস্কু বলল।

'যাই-নিয়ে আসি'-বলে শবু চলল মা-বাবার খাটের নীচে পানের সরঞ্জামের পাশে রাখা চুনের হাঁড়ি থেকে চুন আনতে।

অতি সন্তর্পনেই সে চলেছে, কিন্তু সব বৃথা, বাবার দিবানিদ্রা ভেঙে গেল। বাবাকে উঠতে দেখে শবুর পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল—ভীরু অপলক দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাবা কিছু না বলে আস্তে করে শবুর একটা হাত ধরে বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় রাখা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে আবার দরজা ভেজিয়ে রেখে বিছানায় গিয়ে শুলেন। বাবাকে দেখে কিস্কুর খেলা মাথায় উঠেছিল, বাবাকে আবার শুতে দেখে ত্রস্তে চলে এল বারান্দার দিকের বৈঠকখানার খোলা জানলার পাশে। গরাদের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট হাতখানি গলিয়ে শবুর গা ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিয়ে ফিসফিস করে বলল—

'একটুও ভয় পাসনা শবু, এই দেখ আমি তোকে ছুঁয়ে আছি।'

সান্ত্বনা—সমবেদনায় শবুর রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল, অনুশোচনায়

অভিমানে কান্নায় তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অভিমানী শবু এতটুকু অবহেলা বা তিরস্কার সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আবার বলল—

'তোর কি দোষ বল? আমিই ত তোকে চুন আনতে পাঠালাম। তুই কাঁদিস না।'

তাইত। শবু ত নিজে থেকে কিছু করেনি, দিদির কথামতই সে যাচ্ছিল। এবার নামল অঝোর ধারায় কান্না তার দু চোখ বেয়ে। সে-কি কান্না—ফুলে ফুলে—অস্ফুটে! আদুর গায়ে পরনে ইজের ছাড়া একটুকরো সুতোও নেই যা দিয়ে দিদি ওর চোখ দুটো মুছিয়ে দেবে। দরজা ত শুধুমাত্র ভেজানোই আছে, তবু দু'বোনের সাহস নেই ঐ অনুচ্চারিত নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে একে অপরের কাছে চলে আসবে। দিদি অসহায় ভাবে তার ছোট বোনকে হাত বাড়িয়ে আদর করে সান্ত্বনা দিতে কত কথা বলছে—

'ঐ দেখ শবু, গীর্জার চূড়ায় কি সুন্দর একটা পাখী। এ দিকে দেখ গাছটায় কি সুন্দর থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। তুই কাঁদিস না, মার ঘুম ভাঙলে মা এসে তোকে কোলে করবে।'

কত কথা দিদি বলে যাচ্ছে, কিন্তু শবুর মুখে একটা কথা নেই। বরং দিদির কথায় শবুর চোখে যেন বাঁধভাঙা বন্যা নামে। ভরাট কান্নায় রাঙা গাল দুটো বেয়ে শ্রাবণের ভরা নদীর ঢল নামে। মনে মনে সে কত কথা ভাবছে—সে ত খুব সাবধানেই ঘরে ঢুকেছিল। কচি রাঙা পায়ে দ্রুত চলায় পাকা মেঝেতে যে একরকম ভুম ভুম শব্দ ওঠে সে কি তা জানে? কেন সে বাবার ঘুম ভাঙালো অসময়ে—সেই অনুশোচনায় মরমে মরে গিয়ে তার কান্না আর কিছুতেই বাধা মানে না। নিজ হাতে চোখ মোছারও চেষ্টা করে না। অসহায় ভাবে কিন্তু ওর গায়ে মাথায় কেবল হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে বাবা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর ধীরে সুস্থে জামা কাপড় পরে কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পদ্মিনী দেবী পান সেজে কৌটায় ভরে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তা থেকে এক খিলি পান মুখে পুরে কৌটোটা পকেটে রাখতে রাখতে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এলেন।

একি! মেয়েটা এখনও এখানে একা একা বসে আছে, কেউ এসে ভিতরে নিয়ে যায়নি!

সত্যি ত, শবুকে বাবা হাত ধরে এনে যেভাবে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন

ঠিক সেই ভাবেই বসে আছে—এক চুলও নড়েনি। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে এখন কান্না তার থেমে গেছে। অভিমানী শবু উদাস দৃষ্টি মেলে এখন সামনের ঐ গীর্জাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবাকে আসতে দেখে কিঙ্কু আড়ালে সরে গেছে। বাবার আসা টের পেয়ে শবু লজ্জায় মাথা নীচু করে নিজেকে লুকোতে চাইছে। বাবা আদর করে ডাকলেন—

'শবু, এস, ঘরে এস।'

শবু এবার ডুকরে কেঁদে উঠল—

'বাবা, আমি দুষ্টু হয়েছি।'

গিরিনবাবু তাঁর ছদ্ম গাম্ভীর্য্য দিয়ে আর নিজের হৃদয়াবেগ সামলাতে পারলেন না। অভিমানিনীকে বুকে তুলে নিয়ে ধরা গলায় বললেন—

'না মা, তুমি না, আমিই দুষ্টু হয়েছি—তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি।' মেয়েকে কোলে করে গিরিনবাবু আবার বাড়ীর ভিতর ঢুকে ক্ষোভে দুঃখে অনুশোচনায় একেবারে ফেটে পড়লেন। বললেন—

'বাড়ীতে এতগুলো লোক রয়েছে, মা-ঠাকুমা আছে। মেয়েটা সারা দুপুর একা একা বাইরে পড়ে রইল, কেউ তাকে ভিতরে নিয়ে এলনা? যদি মনের দুঃখে কোথাও হারিয়ে যেত, সমুদ্রও ত বেশী দূরে নয়। কিম্বা কোন ছেলেধরাও তুলে নিয়ে যেতে পারত। তোমাদের মনে কি স্নেহ মায়া মমতা কিছু নেই? আমার এই আপন ভোলা মেয়েটিকে সবাই এত অবহেলা করে? আর যদি কখন এমন হয়, যে দিকে দু চোখ যায় আমি চলে যাব।' বলে ধীরে যত্ন করে শবুর চোখ দুটো মুছিয়ে আদর করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন নিজের চোখের জল গোপন করতে।

কথাটা মিথ্যে নয়। এই ত কদিন আগে শবু আর কিঙ্কু সকালে বাইরের বারান্দায় খেলা করছিল। কি জন্য যেন কিঙ্কু বাড়ীর ভিতর এসেছে, শবু তখন বাইরে একা। গিরিনবাবু সে সময় বাইরে বের হতে গিয়ে দেখেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক বারান্দায় উঠে শবুকে কোলে করে আদর করছেন। গিরিনবাবুকে দেখে ভদ্রলোক অপ্রতিভের মত বললেন—

'আপনার মেয়ে বুঝি? এমন সুন্দর আর আদুরে চেহারা, পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, একে দেখে একটু কোলে করে আদর করার লোভ সামলাতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না' বলে শবুকে আদর করে চুমু খেয়ে কোল থেকে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। যাবার সময় বার বার ফিরে

ফিরে শবুকে দেখছিলেন।

সে ভদ্রলোক হয়ত ভাল লোক ছিলেন। যদি অন্য প্রকৃতির লোক হ'ত তবে যে কি হ'ত ভাবতে গিয়ে মা ঠাকুমার বুক কাঁপে।

বেদনায় ঠাকুমার মুখে কথা সরল না। আসলে বড় ছেলের অপ্রিয় কাজ করা হবে ভেবে কেউই সাহস করেনি। না হলে মা পদ্মিনী দেবীর ঘুম অনেক আগেই ভেঙেছিল। আর কিঙ্কুর মুখে সব শুনে মার মনটা যে কেবলই আকুলি বিকুলি করছিল স্নেহের দুলালীকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি, শুধু দূর থেকে মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছেন।

স্বামীর কথায় এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগ তাঁর বুকের কাছে আছড়ে পড়ল। শবুকে ঝাপটে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার মুখখানা ভরিয়ে দিলেন। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে কত আদর করলেন। মার পাশে বসে কিঙ্কুও চোখের জল ফেলতে লাগল নিঃশব্দে। বাবার সহানুভূতি ও মার আদরে অভিমানী শবুর কান্না মিলিয়ে গিয়ে মুখে হাসি ফুটল। মার গলা জড়িয়ে বলল—

'মা, খিদে পেয়েছে।'

মা ছুটলেন শবুর জন্য দুধ আনতে। আহা, নিশ্চয়ই মেয়ের খুব খিদে পেয়েছে, কখনও ত নিজে মুখে খেতে চায় না।

চার

গৃহকর্তা মহিম মৈত্র খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশী কথাবার্তা বলেন না, তাঁর উপস্থিতিতে বাড়ীর সকলে তেমনি সমঝে চলে। তাঁর বড় বড় ছেলেরাও কোন বেচাল করতে সাহস করে না। তবে সুবিধে এই যে মাসের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশীদিন তাঁকে সরকারী কাজে বাইরে থাকতে হয়। যে কটা দিন বাড়ীতে থাকেন তখন কখন সখন দুই নাতনীকে নিয়ে একটু রঙ্গ তামাশাও করেন। কিঙ্কুর বয়স তখন ছয় সাত বছর। সে মাঝে মাঝে ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরতে চায়। ওর আর নিজের শাড়ী কোথায়, কারো একটা শুকনো গামছা নিয়ে শাড়ী পরার মহড়া দিতে লেগে গেছে। যতবার কোমরে গিঁট বেঁধে সামনে ঝুঁকে দেখছে সব ঠিকমত ঢাকা পড়ল

কিনা ততবারই গামছার কোণ আঁচল সরে গিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দাদু ভিতরের বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ধরে বড় নাতনীর শাড়ী পরার কসরৎ দেখছিলেন আর মিটি মিটি হাসছিলেন। শেষে কিঙ্কুকে ডাকলেন—

'এসো আমার কাছে। আমি ঠিক করে পরিয়ে দিচ্ছি।' কিঙ্কু কাছে যেতে গামছার গিঁটটা সামনে না দিয়ে পিছন দিকে দিয়ে বাকি গামছাটা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে দিলেন। কিঙ্কু সামনে ঝুঁকে দেখল, ঠিক হয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। শাড়ী পড়ার আনন্দে সে উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদিকে পিছন দিকে সব দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুমা বললেন—

'ও আবার কি ছিরি হল ?'

দাদু হেসে বললেন, 'তবু ত সামনেটা ঢাকা পড়ল।'

শবু একখানা গামছা হাতে নিয়ে দাদুর কাছে এসে দাঁড়াল—'শাড়ী পরিয়ে দাও।'

দাদু হেসে বললেন—'তোমার ত শাড়ী পরার বয়স হয়নি, তোমার খোঁপা বেঁধে দিচ্ছি।' বলে গামছাটা মাথায় জড়িয়ে পিছনে দলা পাকিয়ে কোন রকমে আটকে দিলেন। দুই বোন কোমরে ও মাথায় গামছা পরে বাড়ীময় ঘুরতে লাগল। এই রকম অবসর সময়েই শুধু ওরা দাদুর একটুখানি নাগাল পায় আর দাদুকেও বেশ সহজভাবে ওদের সঙ্গে মিশতে দেখা যায়।

বড়কাকা হৈমবাবুর সব ব্যাপারই যেন কেমন অদ্ভুত ধরণের। এদিকে আবার ডাক্তারী পাশ করেছে। হয়তো দেখা যাবে জামা উল্টো করে গায়ে দিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। কিঙ্কু বলল—

'বড়কাকা, তোমার জামাটা উল্টো।'

কাকা জবাব দিলেন—

'ঠিক আছে, জামাটা ময়লা হয়ে গেছে, তাই।'

আবার কোথাও বাইরে আড্ডা দিতে গিয়ে অসময়ে প্রবল প্রকৃতিক বেগে তাড়িত হয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে ঢুকেই সোজা পায়খানার দিকে—বলতে বলতে গেলেন—

'বৌদি, এক বালতি জল পাঠিয়ে।'

কিছু পরে বেরিয়ে এসে কুয়োতলায় স্নানে বসে গেলেন। পদ্মিনী দেবী

মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন—

'কি হল ঠাকুরপো, এই অবেলায় আবার স্নান করছেন?'

বড়কাকা গম্ভীর হয়ে বললেন 'কুলায় উঠতি পারলাম না।' এসব সময় বড়কাকার মুখ দিয়ে খাস দেশী ভাষা বের হয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিন্তু শবু হাততালি দিয়ে নাচতে থাকে—

'কাকা এ্যা করেছে, কাকা এ্যা করে ফেলেছে।'

বড়কাকা জোর মুখ ভেংচে দিতেই দুবোন সামনে থেকে ছুটে পালায়।

বড় কাকা সব সময় নিজের টুকিটাকি জিনিষ বৈঠকখানা ঘরে টেবিলের উপর অগোছালো করে রাখবে। কিন্তু আর শবু বারবার সেগুলো ভাল করে গুছিয়ে রাখতে আর পারেনা। এই গুছিয়ে রেখে গেল, পরমুহূর্তেই বড়কাকা এসে সব ওলট পালট করে রাখবে। আবার উল্টে বলবে 'টেবিলের জিনিষ পত্র সব আউলে ঝাউলে করে রাখল কে?' শবুরা বলে কত কষ্ট করে গোছাল, তাকে বলে 'আউলে ঝাউলে।'

আবার এই বড়কাকার সঙ্গেই দু বোনের খুব ভাব। বড়কাকা দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে পড়েন। চোখ দুটো নিজেই গামছা দিয়ে বেঁধে নেন, না হলে ভাল ঘুম হয়না চোখে আলো লেগে। ঘন্টাখানেক শোয়া হল কি না হল, বাড়ীর অন্য লোকেরা হয়ত তখন ভাল করে ঘুমোয়নি, বড়কাকা উঠে একেবারে সোজা ভাঁড়ার ঘরে। হাতমুখ ধোয়ারও তর সয় না। আর ঐ সময়টা কিন্তু শবুদেরও চরাবরায় সময়। ওরা বুঝে গেছে বড়কাকা আশ্চার্য্য রকমের পেটুক, হ্যাংলা। এখন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে নাড়ু-বড়ি, আচার, আমসত্ব এটুক সেটুক যা পাবে তাই খাবে। বড়কাকাকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে দেখলেই দুই বোন গুটি গুটি গিয়ে দরজার পাশ থেকে উঁকি দেয়। কাকা মুখরোচক জিনিষগুলো টপাটপ মুখে পুরতে পুরতে মাঝে মাঝে একটা দুটো তাঁর ভাইঝিদের হাতে গুঁজে দেন। ওরাও মহা আনন্দে খেতে থাকে। একটু বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে যেতে যেতে বলেন—

'হাউরে গুলান, খেলাতে ছিলি—খেলাগা না গিয়ে, পাছে পাছে ঘোরে'—বলতে বলতে বৈঠকখানা থেকে জামাটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

কিন্তু শবুর কাছে নিত্যদিনের এ এক মস্ত তামাসা। বলা বাহুল্য এ সময়ও কাকার মুখ থেকে খাস দেশী ভাষা ঝরে পড়ে—অতি আদরে।

বাড়ীতে ভালমন্দ কিছু খাবার তৈরি হলে বড়কাকা সবার আগে চাখতে

বসে যাবে। ভাল লাগল ত বেশ কিছুটা খেয়ে ফেলল, আর যদি ভাল না লাগে তবে দুটো একটা মুখে দিয়ে ভাইঝিদের দিকে খাবার পাত্রটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়েন। বলতে বলতে যান—

'অন্য বাড়ীতে দেখি, ভালমন্দ যা হয় আগে ছাওয়াল পাওয়াল গুলানরে দেয়, এ বাড়ীতে দেখি সবই উল্টো।' বলেই আর না দাঁড়িয়ে বৈঠকখানা থেকে জামাটা কাঁধে নিয়ে রওনা হন।

এই বাবা কাকাদের কত কীর্ত্তি কাহিনীর কথা ওরা শুনেছে মা ঠাকুমার কাছে।···

গৃহকর্তা মহিম কান্তি মৈত্রের তিন পুত্র—গিরিন হৈম ও অবিনাশ। বড়ভাই স্কুলের পাঠ শেষ করেছে, ছোট দুজনও প্রায় শেষ করে এনেছে। তাদের অনেক দিনের ইচ্ছে তিনজনে মিলে একবার হেঁটে কোনারকে বেড়াতে যাবে। সমুদ্রের ধার দিয়ে কাঁচা পথে দূরত্ব প্রায় ১৫।১৬ মাইল—যেতে চার ঘণ্টা আসতে চার। খুব সকালে বের হলে বেড়িয়ে টেড়িয়ে অনায়াসে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়। আগে গৃহকর্তার অনুমতি দরকার। এ সব ব্যাপারে বলির পাঁঠা সব সময়ই বড়কাকা হৈম। ভাইদের কথায় হৈম গিয়ে মাকে বলল বাবাকে বলে অনুমতি আদায় করতে। মা বললেন—

'তোমরা বেড়াতে যাবে, তোমরাই গিয়ে বল।'

শেষটায় আবার হৈমকেই গিয়ে দাঁড়াতে হল বাবার সামনে। মহিমবাবু জিজ্ঞেস করলেন—

'কি ব্যাপার, কি চাই?'

একটা ঢোক গিলে হৈম মুখস্ত বলার মত আউড়ে গেল—

'বাবা, আমরা তিনজনে হেঁটে কোনারক যেতে চাই। তুমি যদি অনুমতি দাও।'

বাবা, একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর অনুচ্চস্বরে শুধু বললেন—

'না, এখন না।'

শুনে মুখ চুন করে হৈম চলে এল বাবার সামনে থেকে। পরে বাবা অফিসে চলে গেলে তিন ভাই মিলে মাকে বলতে লাগল, আমাদের একটু স্বাধীনভাবে চলা ফেরার অধিকার নেই। যেতে চাইলাম ত—'না এখন না।' কেন না? এখন না কেন? এখন নয় ত কখন? মা বললেন—

'তা সে কথা বাবাকে শুধোলেই পারতিস তোরা। আমার কাছে প্যানর

প্যানর করছিস কেন ?'

হৈম বলে উঠল—'অনেক কষ্টে মুখস্ত করা কথাগুলো আউড়েছি। আবার বলব 'কেন ?' আমার সাধ্য কি ?'

মা মুচকে হেসে বললেন 'তবেই বোঝ।'

কিন্তু তিন ভাই ঠিক করেছে হেঁটে তারা কোনারক যাবেই, কোন বাধা মানবে না। পরের বারেই যখন বাবা আবার সফরে বেরিয়েছেন সপ্তাহ খানেকের জন্য, সেই অবসরে, একদিন খুব সকালে মাকে বলে তিনজনে বেরিয়ে পড়ল কোনারকের উদ্দেশ্যে। চারঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটে, পথে দুটো নদী পার হয়ে তিন ভাই গিয়ে পৌঁছল কোনারকে। তখনকার দিনে কোনা-রকে বেশী যাত্রী ভিড় করত না, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য। তাছাড়া তারা গিয়ে স্থানীয় লোকমুখে শুনল মন্দিরের মেরামতের জন্য প্রায় মাস-খানেক হল সেখানে ঢোকা বারণ, চলবে আরো কিছুদিন।

তখন তাদের যা অবস্থা, আশপাশে একটা চায়ের দোকানও নেই—যা-ও ছিল মন্দির বন্ধ বলে সেগুলোরও ঝাঁপ বন্ধ। তিন ভাই খিদে তেষ্টায় কাতর। দূরে একটা ডাকবাংলো দেখে তিন ভাই সেই দিকেই রওনা হল—ওখানে যদি একটু খাবার জলও পাওয়া যায়।

ডাক বাংলোর খুব কাছাকাছি গিয়ে তিন ভাইয়েরই পা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ডাকবাংলোর সামনের বারান্দায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে রয়েছেন যিনি, তিনি কি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিম কান্তি মৈত্র—অর্থাৎ পরম পূজনীয় পিতৃদেব ? না, কোন ভুল নেই, ওইত বারান্দার এক ধারে অতি পরিচিত মুখ, মৈত্র মহাশয়ের খাস আর্দালী। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয় !

ওদিকে মৈত্র মহাশয়ও দূরে অগ্রসরমান তিন মূর্তিকে দেখে আন্দাজে বুঝেছেন ওরা তাঁর আত্মজ তিন ভূত। আর্দালীকে কি যেন ইশারায় নির্দেশ দিলেন। আর্দালী এসে সসম্মানে তিন ভাইকে ডাক বাংলোয় ডেকে নিয়ে গেল—ওদের আর পালাবার পথ রইল না। বাবা কিছুই বললেন না, ডাক বাংলোর খানসামাকে তিন ভাইয়ের জন্য স্নান খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে নির্দেশ দিয়ে, মন্দির দেখার বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করে ও ফেরার জন্য গরুর গাড়ী আনিয়ে দিয়ে নিজস্ব সফরের জন্য রাখা অন্য গরুর গাড়ীতে চেপে ভুবনেশ্বর রওনা হয়ে গেলেন।

আর এদিকে সন্ধ্যের মুখে তিন ভাই গরুর গাড়ীতে চেপে ধূলিধূসরিত চেহারা নিয়ে মুখ কালো করে, এসে বাড়ীতে ঢুকল।

এর পর থেকে বাবা আর তিন ভাইয়ের কোন ব্যাপারে 'না' করতেন না। মা বলতেন—'তুমি বারণ কর না কেন?' বাবা বলতেন 'আমি বারণ করব আর ওরা তা মানবে না, তাতে কি আমার সম্মান বাড়বে? মনে নেই, সেবারের কথা? আমি সেবার বারণ করেছিলাম মন্দির বন্ধ ছিল বলে। ওরা কি আমার কথা শুনল?'...

একবার এক নিমন্ত্রন বাড়ীতে সবাই গেছে। এক সারিতে অন্যান্যদের সঙ্গে বসেছেন মৈত্র মহাশয়, হিতেন বাবু, রাখহরি বাবু ও সমবয়স্করা। অপর এক সারিতে ছেলে ছোকরাদের দলে আছে গিরিন, হেম, অবিনাশেরা। কথায় কথায় হিতেন উকিল বললেন—

'মহিম, তোমার ছেলে তিনটি এক একটি রত্ন, যেমন লেখাপড়ায় ভাল—তেমনি বেশ ধীর স্থির বাধ্য।'

মৈত্র মহাশয় বললেন,—'বোলোনা সেকথা, তিনটিই ভূত। আমি মাসের অর্ধেকদিন বাইরে বাইরে থাকি। শুনতে পাই বৈঠকখানা ঘরে দিনরাত চলে গান বাজনার আসর। বলি, গান বাজনায় কি পেট ভরবে? আমি যতদিন আছি চলে যাচ্ছে, পরে বুঝবে।'

বাড়ীতে ফিরে, মৈত্র মহাশয় তখনও ফেরেন নি, হেম বাবার উপর মহা খাপ্পা, মাকে বলল—

'মা, শুনেছ বাবার কথা? নিজে ত কখনো ভাল বলবেই না, অন্যে বলছে তা একটু চুপ করে শোনো। তা না, আমরা নাকি সব ভূত, আড্ডা-বাজ।'

মা বললেন—'ছেলে মেয়েদের সামনে তাদের অকারণ প্রশংসা করতে নেই—করলে তাদের শুধু ভবিষ্যৎ নষ্ট করাই হয়।'

এখানেও কিছু সুবিধে হল না। বাবাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে তিন ভাই তাড়াতাড়ি মার সামনে থেকে সরে পড়ল।

কথাটা মিথ্যে নয়। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনভাই বেশ জোর কদমে সঙ্গীত চর্চা করে তখন। বড় গিরিন বেহালা এস্রাজ বাজায়—গানের গলাও তার বেশ মিষ্টি, কিন্তু নিজে বেশী গায় টায় না। হেমের গানের গলাটা বেশ ভরাট আর দরাজ, অর্গ্যান বা হারমোনিয়ম বাজিয়ে যখন গান করে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। ছোট অবিনাশ দেয় তবলায় তাল—যদিও

গানের উপরও তার বেশ দখল। এ ছাড়া আছে অনেক গায়ক বাদক বন্ধু-বান্ধব—চন্দ্রকান্ত, বংশী, যদু, মন্তোষ। আর মন্তোষের বোন বিদিশা—সে ত সবার সেরা গায়। অবশ্য বিদিশা কোন আড্ডায় আসে না।

শহরের একমাত্র ক্লাব 'সঙ্গীত সম্মিলনী' এই সব কলা-রসিকের গুঞ্জনে সদা মুখরিত। পুজো পার্বনে চলে নাটকের মহড়া। এই সেদিনও কিন্তু শবুরা দেখেছে ক্লাবের স্টেজে বাবা কাকাদের পার্ট করতে গান গাইতে মুখে পেন্ট আর মাথায় পরচুলা লাগিয়ে। তবে হ্যাঁ, বৈঠকখানায় গানের আসর বসে মৈত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে। কারণ এখানে আরাম আয়েস বেশী। অন্য সময় অগত্যা সঙ্গীত সম্মিলনীর চাটাই আর ভাঁড়ের চা।

এই গান বাজনার আবহাওয়ায় দু বোন বড় হচ্ছে। কিন্তুর গলা ভারী মিষ্টি ও সুরেলা। বড়কাকার কাছে তার গানের হাতেখড়ি। কাকা শেখান ভজন, রবীন্দ্র সংগীত আর অতুল প্রসাদের গান। শবুর গলাও মিষ্টি, কিন্তু সুরেলা নয়। তবু দিদি যখন গানের রেওয়াজ করে সঙ্গে সে গান ধরবেই। আর দিদি থামলে শবুর কণ্ঠও নীরব। বাড়ীতে যত গান গাওয়া হয় শুনে শুনে শবুর সব মুখস্ত। অদ্ভুত তার স্মৃতি শক্তি। একবার বিকেলের দিকে ক্লাবে নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। একটা দৃশ্য হয়ে যাবার পর সবাই চা পান খাচ্ছে। কিন্তু আর শবুও রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিল অন্যদিনের মত কাকাদের সঙ্গে। সকলের চা খাওয়ার অবসরে হঠাৎ শবু, ঐ টুকু মেয়ে, স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে সবাইকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে হাত পা নেড়ে প্রথম দৃশ্যের প্রতিটি পার্ট আউড়ে গেল। অবাক হবারই কথা। লিখতে পড়তে পারে না তখনও, কিন্তু বৈঠকখানা ঘরেই হোক আর ক্লাবেই হোক রোজ রিহার্সাল শুনে শুনে ওর সব মুখস্ত হয়ে যেত। অথচ কিন্তু হয়ত নিজেনিজে গান গাইছে, পরের লাইনটা ভুলে গিয়ে পাশে বসা শবুকে যদি জিজ্ঞেস করল—'শবু, পরের লাইনটা কি রে?'

শবুর ঐ এক দোষ, দিদি যদি ভুলে গেল তবে শবুও ভুলে যাবে জানা জিনিষটাও। দিদি কিন্তু কখনো বকে না ওর এই ভুলে যাওয়ার জন্য।

এর মধ্যে একবার ওরা মামাবাড়ী যাবে মার সঙ্গে। বড়কাকা নিয়ে যাবে সবাইকে। যেতে হবে অনেক দূর বাংলার এক অজ-পাড়াগাঁয়ে। দুবার ট্রেন বদল করতে হবে, আবার কতটা রাস্তা নৌকোয় নদী খাল বিল পেরিয়ে মামাবাড়ীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছবে, তবে হবে ওদের যাত্রার শেষ। পথে পড়বে

কলকাতা—সে এক বড় আশ্চর্য্য শহর, কত গাড়ী ঘোড়া, বিদ্যুতে নাকি গাড়ী চলে। দুই বোনে মিলে কি উত্তেজনাই না অনুভব করছে। ওরা যদিও শহরে থাকে তবু কলকাতা কখন দেখেনি। তার চাইতেও বড় আকর্ষণ মামা বাড়ীর গ্রাম। ওরা জন্মে থেকে গ্রাম দেখেনি। সে নাকি এক অদ্ভুত দেশ—পাকা রাস্তা নেই, গাড়ী ঘোড়া নেই, রাতে শেয়াল ডাকে বাড়ীর পাশের ঝোপ ঝাড়ে, আর সাপ খোপের ত অন্ত নেই। দু বোনের ভারি মজা লাগছে আবার ভয়ও করছে শেয়ালের কথায়। বাঘও ত থাকতে পারে—জঙ্গল যখন আছে। আর জঙ্গল মানেই বাঘ ভাল্লুক থাকে। মা কিন্তু পা বাড়িয়েই আছে।

আগ্রহে আতিশয্যে দুই বোন ঠাকুমাকে নিয়ে পড়ল—মা-ত গোছ গাছ করতে ব্যস্ত, কথা বলার অবসর নেই। ঠাকুমাকে কিঙ্কু জিজ্ঞেস করল—

'ঠাকুমা, বাবা তো যাবে না, মা কি রাস্তা চিনে যেতে পারবে?'

ঠাকুমা বললেন—'মা কি অত চেনে? হেম সঙ্গে যাচ্ছে—সে-ই সব চেনে।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'ঠাকুমা, ওখানে কি বড়কাকারও মামাবাড়ী?'

কিঙ্কু ওকে চুপ করিয়ে দিল—'দূর বোকা, বড়কাকা, বাবা, ছোটকাকা সবার মামাবাড়ী ত ঠাকুমার বাপের বাড়ী—তাই না ঠাকুমা?' কিঙ্কু বড়, তাই কিছুটা বুঝতে শিখেছে। শবুটা বড্ড বোকা মনে হয়।

কিঙ্কু আবার প্রশ্নের খেই ধরল—'আচ্ছা ঠাকুমা, বড়কাকা আমাদের মামা-বাড়ী চিনল কি করে?'

ঠাকুমা—'সে তো তোদের বাবার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল।'

কিঙ্কু—'ঠাকুমা, বাবা মার বিয়ের গল্প বল।'

ঠাকুমা—'বিয়ের আবার গল্প কি? কর্ত্তা গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন, সঙ্গে ঠাকুরমশাই। ঠিকুজি কোষ্ঠী মিল হল, বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে অবশ্য খুবই পছন্দ হয়েছিল। মেয়ে দেখে আসার পর কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেয়ে কেমন দেখতে? তখন তো অত ফটো তোলার রেওয়াজ ছিল না—আর ওদের ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে কে ফটো তুলতে যাচ্ছে। বিয়ের পরে গিরিনের বন্ধু ধীরেন তোদের বাবা-মার একটা জোড়া ফটো তুলেছিল। তো যা বলছিলাম—আমার প্রশ্ন শুনে কর্ত্তা বললেন—মেয়ে দেখতে খুব সুন্দরী, যেমন রং তেমনি তার রূপ, আর তেমনি মাথায় চুল, সুন্দর দুটি চোখ, আর নাক···। জিজ্ঞেস করলাম—নাক কেমন? উনি রহস্য করে বললেন, তা—নিঃশ্বাস নিতে পারে।'

সে যে যা—ই বলুক, মা ওদের কাছে সব থেকে সুন্দরী। রাজা রানী ওরা দেখেনি, রাজা রানীরা নাকি খুব সুন্দর হয়, তবে যার তুলনা চলে শুধু ক্লাবের পূজোর মা-দুর্গার সঙ্গেই।

ওদের স্বল্প দিনের মামাবাড়ী বেড়ানো শেষ করে ওরা মা বড়কাকার সঙ্গে আবার ফিরে এল। পথের কথা শবুর কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের কথায় শুধু মনে পড়ে, বর্ষায়-পিছল মাটির উঠোন। সেখানে শবু বারবার পা পিছলে ধুপ ধুপ করে আছাড় খেত। মামাতো ভাই বোনেরা খিলখিল করে হাসত আর বলত 'শবু আবার পড়ি গিছে।' মনে পড়ে জমিদার মামাদের বিরাট দালানবাড়ী, আর নৌকোয় করে পাশের গ্রামে মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়া।

ফিরে আসার পর ঠাকুমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—ওখানে কি কি খেতে দিত। খাবার ত কত রকম খেতে দিত হিসেব দিয়ে ওরা কুলিয়ে উঠতে পারছে না। একবার ফেনা ভাত, দুপুরে ভাত, আবার রাতেও ভাত খাওয়া।

ঠাকুমা শুধোলেন—'সকালে জল খাবার দিত না?'

দু'বোন সমস্বরে বলে উঠল—'না জলখাবার নেই, কেবল ভাত আর ভাত।'

পরে মা দুজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে বললেন—

'কেন? ওখানে সকাল বেলা রোজ ফেনাভাত খেতিস না?'

কিস্কু বলল—'বা রে, সে তো ভাত, জলখাবার কই?' ওদের কি দোষ? ওরা জলখাবার বলতে বোঝে মুড়ি, চিড়ে, বিস্কুট, পাঁউরুটি কিম্বা লুচি পরোটা। ভাত খাওয়াকে কি জলখাবার বলে নাকি? মুড়িটা অবশ্য খেতে দিত কোন কোন দিন বিকেলে। শবু কিন্তু শুধু দুধই খেয়েছে, এখনও সে ভাত খায় না!

মামাবাড়ী থেকে ফেরার কিছুদিন পরে সুবিধে মত দিন দেখে দু বোনকে মাথা নেড়া করে দিল নাপিত ডেকে। গ্রাম থেকে মাথায় উকুন নিয়ে ফিরেছে দুজনই। মাথা নেড়া করার সঙ্গে সঙ্গে শবুর দুটো কানও ফুটো করে দিল—দিদির কান আগের কোন বছরে ফুটো করা হয়েছিল। এরপর থেকে শবুও দিদির মত কানে দুল পরতে পারবে।

পাঁচ

কিস্কুর বয়স সাত বছর হয়েছে, এবার তাকে স্কুলে ভর্তি করা দরকার। শবুর বয়স সাড়ে তিন, তার স্কুলে ভর্ত্তি হতে এখনো দেরী আছে। বড়কাকার

উপর ভার পড়ল কিঙ্কুকে স্কুলে ভর্ত্তি করানোর। দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে, শবু সঙ্গ ছাড়বে না। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সমুদ্রের ধারে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বাংলা প্রাইমারী স্কুল বা পাঠশালা আছে। সেটি পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবী—সকলের 'বড়মা'। একটা ছোটখাট আশ্রমিক পরিবেশ। অনাথ কিছু আশ্রম বাসিনী মহিলা আশ্রমের কাজ ও স্কুলের শিক্ষকতা করেন। প্রয়োজনে স্থানীয় কিছু মেয়েকেও শিক্ষিকার কাজে নেওয়া হয়। শুভ দিন দেখে বড় কাকা দু বোনকে সঙ্গে নিয়ে চললেন বড়মার স্কুলে—কিঙ্কুকে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হবে, শবু সঙ্গে চলেছে বেড়াতে।

বড়মার সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন—

'গিরিনের বড় মেয়েকে ভর্ত্তি করতে এনেছ, হৈম? কি নাম ওর? কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করতে চাও?'

হৈম বললেন—'আজ্ঞে, যে শ্রেণীর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। বাড়ীতে কিছু পড়াশুনা ও করেছে। ওর নাম কিঙ্কিণী মৈত্র।

'বাঃ বেশ সুন্দর নাম' বলে বড়মা কিঙ্কুর সঙ্গে কিছু কথা বলে দু'একটা প্রশ্ন করে তার উত্তর শুনে শেষে বললেন—'বেশ। ওকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে নিলুম। তুমি সরলার কাছে নিয়ে গিয়ে ওর নাম টাম লিখিয়ে দাও।' বড়মা হেডমিস্ট্রেস সরলাকে ডেকে পাঠিয়ে কিঙ্কুকে ভর্ত্তি করে নিতে বললেন। হৈম বড়মাকে প্রণাম করে উঠতে যাচ্ছিলেন, বড়মা বললেন—

'আচ্ছা হৈম, সঙ্গে যে ফুটফুটে মেয়েটিকে এনেছ এই বুঝি গিরিনের দ্বিতীয় মেয়ে?'

হৈম বললেন 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে ওকেও কেন ভর্ত্তি করে দাওনা এখানে, দুই বোন একসঙ্গে বেশ গাড়ীতে করে স্কুলে আসবে, যাবে'—বলে স্নেহের প্রশ্রয়ে শবুকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন বড়মা। শবু বোকার মত একবার বড়মা আর একবার বড়কাকা ও দিদির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

হৈম একটু দ্বিধাগ্রস্ত—'ওকে বই দিলে শুধু পাতাই ছেঁড়ে, ওকে কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা যায়?'

পাশে দাঁড়ানো বড়দি সরলা বললেন—

'আমাদের এখানে শিশু শ্রেণীও আছে, সেখানে ওর বয়সী ছেলেমেয়েরাই

তো পড়ে।’

এর পর আর কথা চলে না, বিশেষ করে বড়মা যাকে আদর করে কাছে নিতে চাইছেন—সে স্নেহের টান দুর্নিবার। দুজনেই ভর্ত্তি হয়ে গেল। বড়-দিদির ঘরে এসে খাতায় নাম লেখান হল—কিঙ্কিণী মৈত্র, দ্বিতীয় শ্রেণী—শিবনাথ মৈত্র, শিশু শ্রেণী…

‘সে কি! ও ত মেয়ে’—বিস্মিত বড়দি বললেন।

হৈম বললেন—‘দেখুন, এ মেয়ে কতদিন স্কুলে আসে। এখন ঐ নামই থাক।’

এমনি করে হঠাৎই সবার আদরের শবু—শ্রাবণী, শিবনাথ মৈত্র নাম নিয়ে একদিন স্কুলের গণ্ডীতে ঢুকে পড়ল একমাত্র হেমলতা দেবীর স্নেহের টানে। বাড়ীতে এসে সে কথা বলতে সকলে অবাক হল। মা পদ্মিনী দেবী বললেন—

‘ঐ টুকু মেয়ে শবু, ও ত এখনো ভাত খাওয়াই শেখেনি, শুধু দুধ খায়। সে আবার স্কুলে পড়বে কি!’

ঠাকুমা আপত্তি করলেন না। বললেন—

‘আহা, যাক স্কুলে, না হলে ওর বড্ড একা লাগবে। তা ছাড়া হেমলতা দেবীর যখন এত আগ্রহ।’

সব শুনে গৃহকর্ত্তা মৈত্র মহাশয় বললেন—

‘পড়ুক স্কুলে। নাতনী এবারে সত্যি সত্যি বিদ্যেবতী—মা সরস্বতী হবে।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতৃষ্পুত্র-বধূর ইচ্ছার কাছে আর সব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেল। শবু—শ্রাবণী, শিবনাথ মৈত্র নাম নিয়ে বড়মার স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল পাকাপাকি ভাবে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে।

কিন্তু নামের আবার ও কি ছিরি হল! আসল নামটা লেখালেই ত হ’ত। বড়কাকা হৈম বললেন—

‘তোমরা দেখ, ও মেয়ে কদিন স্কুলে যায়। শ্রাবণী—শর্বাণী—শিবাণী—ভবাণী’ বলতে বলতে তিনি আড্ডায় চলে গেলেন।

বড়কাকা মাঝে মাঝে আদর করে শবুকে এমনি সব নানা নামে ডাকেন, আর তা থেকেই বানিয়েছেন—শিবনাথ।

বড়কাকা যা ভেবেছিলেন ঠিক তার উল্টোটাই হল। প্রথম দিন অর্থাৎ পরদিন স্কুলে গিয়ে শিশু শ্রেণীতে তার অনেক খেলার সাথীকে দেখতে পেয়ে শবু মনের আনন্দে তাদের সাথে মিশে গেল। ওদের মধ্যে আছে জগু, বীনা,

মীনা, রাজু, নিমু, দেবু, কেকা সবাই—এ ছাড়া আরও কত ছেলে মেয়ে। তারা কেউ ওদের বাড়ীর কাছাকাছির বন্ধু আবার কেউ কেউ একটু দূরের ঠাকুমার তাস খেলার বন্ধুদের বাড়ীর ছেলে মেয়ে। তার উপরে আছে রোজ দিদির সঙ্গে স্কুলের গাড়ীতে চেপে গল্প করতে করতে যাওয়া আর আসা।

সঙ্গে সঙ্গে শবু পড়াশুনাতেও খুব মনযোগী হয়ে পড়ল। বাড়ীতে হাতে খড়ি হবার আগেই শবুর স্কুলে হাতে খড়ি হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক হাতে খড়ির জায়গায় অভিজ্ঞতার হাতে খড়ি। ছড়া ও ছবির মাধ্যমে শুরু হল অক্ষরজ্ঞান। অ আ ক খ ১ ২ ৩ এর সঙ্গে হতে লাগল পরিচয়। বাড়ীতে দুই বোন এক সঙ্গে পড়তে বসে, দিদির পড়া শবু শুনে শুনে অনেক শিখে ফেলেছে। অজ ইট থেকে ক্রমে—অজগরটি আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, পাখীসব করে রব, সকালে উঠিয়া আমি—সব শবুর মুখস্ত হয়ে গেল, ইচ্ছে করলে পড়তেও পারে। শুধু হাতের লেখাতেই রইল একটু পিছিয়ে।

বছর ঘুরতে ওর পড়ার ঝোঁক, মনযোগ ও স্মৃতিশক্তি দেখে বড়মা গিরিন-বাবুকে ডেকে বললেন—

'গিরিন, তোমার ছোট মেয়েকে আমরা ডবল প্রমোশন দিতে চাই। তোমাদের কি মত ?'

গিরিনবাবু সবিনয়ে বললেন--'তাতে হয়ত মেয়েটা কোন কোন বিষয়ে কাঁচা থেকে যাবে, পরে অসুবিধে হতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে দিলেই হয়ত ভাল হবে।'

বড়মা বললেন—'বেশ, তাই হবে। তবে এবারে মেয়েটার আসল নাম লেখানো দরকার।'

সেই থেকে শিশু শ্রেণীর শিবনাথ হল—শ্রাবণী মৈত্র—প্রথম শ্রেণী। লেখা পড়ার বিচিত্র জগতে শবু এক ধাপ এগিয়ে গেল। দিদি কিন্তু উঠল তৃতীয় শ্রেণীতে। এক জন বড় পড়িয়ে পাশে থাকলে তাতে ছোট পাড়িয়েরই লাভ। শবুরও দিদির জ্ঞানের আলোকে এগিয়ে যেতে সুবিধে হচ্ছে।

এই সময়ে বাড়ীতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে চলেছে। বড় ছেলে গিরিনের বিয়ের অনেক বছর পরে মৈত্র পরিবারে এটা দ্বিতীয় বড় কাজ। কিন্তু ও শবু এই প্রথম নিজেদের বাড়ীতে একটা বিয়ে হতে দেখবে। এখন আর ওরা দুজন নয়, তিন জন। মাসছয়েক আগে ওদের আর একটি বোন হয়েছে, নাম রাখা হয়েছে মিতালী, সংক্ষেপে মিতু। শবু এখন পাঁচ বছরে

পড়তে চলেছে, অনেক কিছু নিজের মত করে দেখতে ও বুঝতে শিখেছে। বিয়ে হবে ছোটকাকা অবিনাশের। মেজ হেম বলেছে সে বিয়ে করবে না, যদি করতে হয় ডাক্তারী বা চাকরিতে ভালভাবে বসে তারপর। ছোট অবিনাশ বিয়ে করুক তাতে তার আপত্তি নেই।

'যত সব অনাসৃষ্টি কথা—'মৈত্র গৃহিনী বলেছিলেন। 'মেজর আগে ছোটর বিয়ে!'

মৈত্র মহাশয় বলেছেন—'তা আর কি করা যাবে, ওর যখন মত নেই। বিয়েত আর তুমি করছ না। বলত আমি না হয় আর একবার···।' এসব ঠাট্টা তামাসা মৈত্র গৃহিনীর ভাল লাগেনি, বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে তাঁর মনের দুঃখের কথা জানাতে গেলেন : কর্ত্তামাও ছেলের মতে মত দিলেন—

'যার যখন সুবিধে ও মত হবে তখনই না-হয় বিয়ে করল, এতে আপত্তির কি আছে?'

অতএব ছোটরই আগে বিয়ে দেওয়া হবে। অবিনাশ সদ্য ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে, কিন্তু এখনও বেকার। তাতে কি আছে, ইঞ্জিনীয়ার ছেলে নিশ্চয়ই চিরকাল বসে থাকবে না—তাছাড়া মাথার উপর বাপ আছে। তাই বিয়ে দেবে জানতে পেরেই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা চিঠি পত্রে ও লোক মারফৎ যোগাযোগ করতে লাগলেন—ডজন ডজন মেয়ের ফটো আসতে লাগল। এমন লোভনীয় পাত্র ছাড়া যায় না। ফটো দেখে অবিনাশ একটিকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করে সে কথা তার বৌদি পদ্মিনী দেবীকে জানাল। তাঁর মারফৎ মৈত্র গৃহিণী ও গৃহকর্তা সে কথা জানলেন। মৈত্র মহাশয় বললেন—

'গিরিনের বিয়ে আমি নিজে দেখেশুনে ঠিক করেছি। এদের বেলায় যা করার গিরিনই করুক।'

পিতার নির্দেশে গিরিন অবিনাশের বিশেষ পছন্দের পাত্রী ও বিকল্পে আর দুটি পাত্রীর ফটো ও ঠিকানা নিয়ে হাওড়া কলকাতা ঘুরে এল, সঙ্গে ঠাকুরমশাই ছিলেন। ছেলের পছন্দের মেয়েটি তাঁদেরও পছন্দ হল, দেনাপাওনাতেও আটকালো না। হাওড়ার মেয়ে দীপ্তিরানী লাহিড়ীর সঙ্গেই অবিনাশের বিয়ে ঠিক হয়েছে, অন্য ফটোগুলি সবিনয়ে ফেরৎ পাঠানো হল।

কিন্তু শবুরা এত সব কথা জানেনা, কোন ফটোও তারা দেখেনি। তারা দেখল বাবা, ঠাকুরমশাই, আর কিছু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব মিলে ছোট কাকাকে বিয়ের বর সাজিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। বাড়ীতে মা ঠাকুমা ও অন্য সব

মহিলারা মিলে নানান মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে সবাইকে রওনা করে দিলেন। তিন দিন পরে সকাল বেলা সকলে ফিরে এল—একটি টুকটুকে বউকে সঙ্গে করে। তাঁর সঙ্গে তাঁরই এক আত্মীয়া এসেছেন নতুন পরিবেশে নতুন বউকে সঙ্গ দিতে।

ঠাকুমা, মা ও অন্যান্য সধবা মহিলারা সন্ধ্যে বেলা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরণ করে নিলেন নতুন বউকে আদরে, সাড়ম্বরে। প্রথমে কর্তামা ছোট নাতবৌকে আশীর্বাদ করলেন—নতুন বউ বসে আছে শাশুড়ী ঠাকরুণ নির্ঝরিণী দেবীর কোলে। তার পরে মৈত্র মহাশয় যথারীতি আশীর্বাদ করলেন—নতুন পুত্রবধূ তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। বড়ভাই গিরিন আশীর্বাদ করার পর ডাক পড়ল হৈমর। ঠিক এই সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল। মা, ঠাকুমারাও আশীর্বাদ করলেন। এরপর বউভাত ফুলশয্যা সব কি কি অনুষ্ঠান হয়ে গেল শবুদের চোখের সামনে দেখা ছবির মত। শুধু মনে আছে বধূবরণের আসরে এক সময় ঠাকুমা দুই বোন কিস্কু ও শবুকে ডেকে বললেন—

'তোমাদের নতুন মা—ছোটকাকীমা, প্রণাম কর।'

কাকীমাকে তো আর দিনের বেলায় বাড়ীতে আনা হয়নি, সন্ধ্যের পর আনা হয়েছে। সকাল থেকে তাঁকে রাখা হয়েছিল ঠাকুর মশাইয়ের বাড়ী। দিনের মধ্যে কতবার গিয়ে যে ওরা নতুন মানুষটিকে দেখে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। কথা বার্তাও হয়েছে অল্প স্বল্প। কাকীমা কিস্কুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তুমি ত বড়, তোমার নাম কি, কোন ক্লাশে পড় ?'

কিস্কু সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিল। তারপর ছোটর দিকে তাকিয়ে কাকীমা জিজ্ঞেস করেছিলেন—

'তোমার নাম কি ?'

'শবু।'

'ভাল নাম কি ?'

'শ্রাবণী।'

'কোন ক্লাশে পড় ?'

'প্রথম শ্রেণী। তুমি ?'

শবুর বোকার মত প্রশ্ন শুনে কাকীমা একটু মুচকি হেসে ওর গালটা টিপে দিয়েছেন।

এখন সবার সামনে প্রণাম করতে বলায় ওরা লজ্জায় কেমন যেন জড়সড়

হয়ে গিয়েছিল। সবাই মিলে ঠেলে এগিয়ে দিতে দুজনে ঝুপঝুপ করে ছোট কাকীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাকীমা দু বোনকে হাত বাড়িয়ে থুতনি ছুঁয়ে চুমু খেয়েছিলেন।

দু জনেই বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ছিল যেন এক স্বপ্নের দেশের রাজকন্যাকে দেখছে। সারাদিন তো কাকীমা এমন সুন্দর করে সেজে ছিলনা। এখন কত কি দিয়ে সেজেছে, কি সুন্দর করে শাড়ী পরেছে, মাথায় শোলার মুকুট তার নীচে টায়রা, কানে সোনার দুল, গলায় লম্বা সোনার হার মাঝখানের লকেটটা চকচক করছে হ্যাজাকের আলো পড়ে, হাতে কত রকমের গয়না আর শাঁখা। চন্দন আঁকা মুখে কপালে সিঁদুরের টিপ, দু'পায়ে আলতা তাতে আবার একজোড়া রূপোর মল। পাশ থেকে ছোটকাকা বলে উঠেছিল—

'কিরে, আমাকে প্রণাম করলিনা? প্রণাম কর।' ঠিক তো, ওরা কি অত জানে? ছোটকাকার কাছে কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম চলে না।

এরপর মাস খানেক দু বোনের যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল, অষ্টমঙ্গলের ফিকণীর কটা দিন বাদ দিয়ে। অষ্টপ্রহরের মধ্যে ছ পহরই ওরা দু'টিতে কাকীমার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল। কাকীমার সব কিছুই ওদের চোখে নতুন লাগে, সুন্দর লাগে। দেখতেও খুব সুন্দর—অবশ্য মার মত অতটা নয়। কাকীমা খুব গোছানো, এতটুকু অগোছালো হতে দেন না ঘরের জিনিষ পত্র। দু'বেলা দুই ভাসুরঝিকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, সাজাচ্ছেন। শবু এখনও শুধু দুধ খায় শুনে বড়জা-কে বললেন—

'সে কি দিদি, পাঁচ বছর বয়স হল, ওকে এখনও ভাত খাওয়া ধরান নি?'

মা বললেন—'আমি তো হার মেনেছি, এখন তুই দেখ ছোট, পারিস কিনা।'

সেই থেকে ওদেরকে খাওয়ানোর ভার কাকীমা নিজে হাতে তুলে নিলেন। কত সব মজার মজার গল্প বলে ভুলিয়ে শবুকে অল্প দিনেই ভাত খাওয়া ধরিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে কিন্তু আর শবু কাকীমার নেওটা হয়ে পড়ল, ওদের যে একটা ছোট বোন আছে—মিতু—সে কথাও প্রায় ভুলে যায় অনেক সময়।

প্রাথমিক অস্বস্তির ভাব কেটে যেতে বড়কাকাও এখন বেশ স্বাভাবিক ভাবে বাড়ীতে ঘোরা ফেরা করছেন। আগের মতই হুটহাট এ ঘরে সে ঘরে ঢুকে পড়ছেন। পদ্মিনী দেবী একদিন বললেন—

'বট্‌ঠাকুরপো, বাড়ীতে এখন আপনার এক ছোট ভাদ্রবউ আছে, আপনি যখন তখন যেখানে সেখানে ঢুকে পড়বেন না, একটু সাড়া শব্দ করে আসবেন।'

পাশ থেকে দীপ্তি দেবী আড়ালে তাঁকে মৃদু চিমটি কাটলেন।

বড় কাকা চিরকালই একটু খেয়াল শূন্য, আপন ভোলা মানুষ। এরপর থেকে তিনি চলতে ফিরতে ঘন ঘন এমন গলা খাঁকারি দিতে লাগলেন যে দু দিনেই বাড়ীর লোক একেবারে অতিষ্ঠ।

কিন্তু আর শবু আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছে গরমের ছুটির পর।

ছয়

মাঝখানে পুজো গিয়ে বড়দিনের ছুটির আগে বড়মার স্কুলে খেলা ধুলার প্রতিযোগীতা হচ্ছে। বড়মার ব্যবস্থায় কোন ভেদাভেদ নেই, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবাই পুরস্কার পায়। শুধু শ্রেণী ভেদে পুরস্কারের রকমফের হয়। লজেন্স, চকোলেট থেকে আরম্ভ করে পেন্সিল রুমাল অনেক কিছুই থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য।

শবুদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্য ঠিক হয়েছে একটা লম্বা শক্ত সুতোর মাঝে মাঝে একটা করে কমলালেবুর কোয়া সরু সুতোয় ঝুলিয়ে দু'পাশ থেকে দুজনে মূল সুতোটি শিশুদের মাথার সমান উঁচুতে অল্প অল্প নাচাতে থাকবে আর ছেলে মেয়েরা পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় লাফিয়ে মুখ দিয়ে যে কোন একটি কোয়া ছিঁড়ে নিয়ে কে আগে নিজেদের জায়গায় ছুটে আসতে পারে। খেলা শুরু হয়েছে, সবার সঙ্গে শবুও লাফিয়ে চলেছে কিন্তু কমলার কোয়াটা কিছুতেই মুখে ধরতে পারছে না, কেবলই নড়ছে।

এদিকে আর সব ছেলে মেয়েরা একে একে কমলা মুখে করে ফিরে গেছে, সে তবুও একমনে কমলা ধরতে ব্যস্ত। কে যেন দয়াপরবশ হয়ে পাশে গিয়ে একটি কমলার কোয়া হাত দিয়ে ওর মুখে ধরিয়ে দিল। অমনি সেটা মুখে করে শবু এক ছুটে এসে ওদের ক্লাসের দলে গিয়ে ভিড়লো। ঐ টুকু ফুটফুটে সুন্দর মেয়ের এ ধরনের ধৈর্য্য দেখে ও অযাচিত আদরের সাহায্যে তার সাফল্যে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী করুণাঘন আনন্দে হাততালি দিয়ে শবুকে সম্বর্ধনা জানাল। সবার সঙ্গে শবুও একটা পেন্সিল উপহার নিয়ে দিদির সঙ্গে বাড়ী ফিরে চলল। পথে যেতে দিদি বলল—

'তুই বোকার মত লেবু খাবার জন্য অতক্ষণ ধরে লাফাচ্ছিলি কেন?'

শবু বলল—'বা রে। আমি মুখে করে এনেছি, খাইনি তো। লেবু না

আনলে প্রাইজ দেবে কেন ?'

শবুর বোকামীতে কিন্তু নিজেই লজ্জা পেল।

লেবুর খেলায় ফেল হলেও বাৎসরিক পরীক্ষায় শবু ভালভাবেই পাশ করেছে, এবারে সে ক্লাস টুতে উঠল।

সরস্বতী পুজোর পর বড়মার স্কুলে গানের পরীক্ষা হবে—যার ইচ্ছে গানের প্রতিযোগীতায় নাম লেখাতে পারে। শবু নাম দিয়ে এসেছে। দিদি শবুকে বাড়ীতে এসে বলল—

'শবু, তুই গানের পরীক্ষা দিস না, সবাই তো দেয়না।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'তুই দিবি না, দিদি ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমিও দেবো' শবু বলল। দিদি আর কিছু বলল না।

বড়কাকা কিন্তুকে যত্ন করে গানের তালিম দিয়ে দিলেন। শবুও বাদ পড়ল না তার নিজের আগ্রহে। পরীক্ষার দিন কয়েকজনের গানের পর শবুর ডাক পড়ল। গানের দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন—'কোন গানটা গাইবে ?'

শবু—'মনুয়া রাম নাম···।'

দিদিমণি হারমোনিয়ামে সুর তুললেন, শবুও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল। দুটি লাইন গাইল কি না গাইল বিচারক বললেন—'থাক থাক, বেশ হয়েছে।' শবু এসে আবার নিজের জায়গায় বসল।

দিদি যখন গাইল—সবটাই গাইল। সবার সঙ্গে শবুও পুরস্কার পেল একটা লাইন টানার স্কেল—বড়মার ব্যবস্থায় সবাই প্রাইজ পায়। দিদি পেয়েছে এক জোড়া ফুলদানী। দিদির গানের সবাই প্রশংসা করছিল—দিদি নাকি সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। সবাই বলাবলি করছিল 'হৈমর ভাই-ঝি ত, হবে না ?' গর্বে শবুর মন ভরে ওঠে। এবার গ্রীষ্মের ছুটির আগে খেলাধুলায় সুচে সুতো পরানোর প্রতিযোগীতায় কিন্তু শবু ফার্স্ট হল—সবার আগে সুচে সুতো পরিয়ে ফিরে আসাতে।

অনেক ব্যাপারে পিছিয়ে থাকলেও একটা ব্যাপারে শবুর কাছে সবাই হার মানে। সেটা ওর সুন্দর আদুরে চেহারা। স্কুলের প্রার্থনার সময় হোক, ড্রিলের মাঠে হোক—মাথায় একেবারে ছোট বলে ওকে দাঁড়াতে হয় সবার সামনে, আর তখনই পড়ে যায় হুড়োহুড়ি শবুর পাশে বা কাছে দাঁড়াবার জন্য। ছেলে মেয়ে সবাই চায় ওর কাছে দাঁড়াতে। শবুর নিজের ক্লাসেও সেই একই অবস্থা। শবুর কিন্তু কারো প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ নেই। ওর কাছে

সবাই সমান। আর পড়াশুনাতেও সে বেশ ভাল।

বড়মার স্কুলে হঠাৎ একদিন টিফিনের সময় একটি কাণ্ড ঘটে গেল। সবাই খেলতে খেলতে স্কুলের বাইরে কয়েকজন গিয়ে একটা ছোট ঝোপঝাড়ে গাছের পাতা ছেঁড়া খেলা খেলছে। একটি মেয়ে কোন একটা গাছের পাকা ফল তুলে ছাড়িয়ে খেয়ে বলে উঠল 'দেখ দেখ, ঠিক বাদামের মত খেতে।' সঙ্গের মেয়েরা আর ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, যত পারল ফল তুলে মনের আনন্দে খেতে লাগল। কিন্তু শবুও দু চারটা খেল। বাড়ীতে ফিরে সন্ধ্যের সময় কিন্তু শবুর সে কি পেট ব্যথা আর বমি।

বাবার কাছে খবর গেল। তিনি এসে বললেন—'ওদের স্কুলের আজ অনেকেরই এই অবস্থা, একজনকে ত হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে, সে বোধ হয় বিষফল সবার চাইতে বেশী খেয়েছে।' বাবা ওষুধ দিলেন।

পরদিন স্কুলে ওরা শুনল, যে ফল তুলছিল আর বারবার বলছিল—'আমিই আগে দেখেছি' সেই ঝিনিকেই হাসপাতালে যেতে হয়েছে। যা হোক, সব অন্নের উপর দিয়ে গেল, ঝিনিও দুদিন পরে স্কুলে এল।

স্কুলের বন্ধুদের মত পাড়ায়ও শবুর খেলার সাথী হয়েছে এখন ঠাকুর মশায়ের নাতি জগু। স্কুল থেকে এসে খেলার সময় সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়। বাড়ীর পাশে ছোট বালিয়াড়ি বা বালির টিবিটাই ওদের বেশী পছন্দ—কোন কোন দিন বা ঠাকুরমশায়ের বাড়ীর বাগানটায় গিয়ে জমা হয় সকলে। সবাই এক সঙ্গে মিশে খেলা করে,—খেলাই বা কত রকমের। কুমীর কুমীর, লুকোচুরি, একাদোক্কা, উপেনটি বায়স্কোপ, স্কিপিং, কিম্বা শুধুই ছুটোছুটি। বালির ঘর তৈরী, গাছের ডালপালা এনে বাগান সাজানো। শবু সবার ছোট বলে সবাই ওকে যেমন ভালবাসে তেমনি আবার কেউ কেউ ওকে নিয়ে মজা করে—বলে 'এই শবু—শাবু খাবি?' শবু রাগেনা।

কখন কখন আবার বর-বৌ খেলা হয়। জগু হয় বর আর শবু হয় বৌ। কিছুক্ষণ নির্বিবাদে ওদের ঘরকন্না চলে। এক সময় শবু জগুকে বলে—

'যাও, এবারে গিয়ে দোকানে বস।'

জগু একটা কাপড় বা ন্যাকড়া পেতে বসে পড়ে, সামনে সাজিয়ে নেয় খেলনার কোশাকুশি ফুল বেলপাতা—পূজো পূজো খেলতে শুরু করে।

শবু রেগে যায়, শিশি বোতল সাজিয়ে জগুকে ডাক্তার সাজতে বলে। জগু কিছুতেই ডাক্তার হবে না, সে শুধু করতে চায় পুরুতগিরি।

এ নিয়ে প্রায়ই ওদের খেলা ভেঙে যায়। ওদের আর কি দোষ? শবু ছোট বেলা থেকেই দেখছে বাবা ডাক্তারী করে, হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী আছে, সেখানে আছে কত ওষুধের শিশি বোতল আর কত রোগী এসে ওষুধ নিয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরমশায়ের নাতি জগু তার বাপ ঠাকুর্দাকে শুধু পূজো করতেই দেখে, আর দেখে ফলমূল চালকলা গামছায় বেঁধে আনতে। তাই কিছুতেই দুজনের মতের মিল হয়না—খেলা ভেঙ্গে যায়। আবার পরক্ষণেই সকলে মিলে অন্য খেলায় মেতে ওঠে—দিদি, শবু, জগু, রীনা, রাজু, নিমু, দেবু, কেকা—সবাই।

অন্যান্য বারের মত এবারও বড়মার আশ্রমিক স্কুলে হবে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান। দিদি ভাল গান গায়, সব অনুষ্ঠানে থাকে তার গায়িকার ভূমিকা, শবু ভিড়েছে নাচের দলে। ওর সুন্দর চেহারা ও মুখশ্রীর জন্য সবাই শবুকে নাচে উৎসাহ দেয়। ইতিমধ্যেই 'চাঁদ ও চামেলী' গীতিনাট্যে চামেলী ও 'লক্ষীর পরীক্ষা'তে লক্ষীর ভূমিকায় নাচ দেখিয়ে সবার প্রশংসা পেয়েছে। আরও কত রকমের নাচ হয়—মোমের পুতুল, রুমঝুম ঝুমঝুম, খেলিছে জল দেবী, দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে। এবারে হবে কৃষ্ণ সুদামা গীতি নাট্য। শবুকে দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণের নাচের ভূমিকা।

প্রায় একমাস ধরে চলল নাচ গানের রিহার্সাল। আজ হবে আসল অনুষ্ঠান। স্কুলেরই আঙ্গিনায় শামিয়ানা খাটিয়ে ষ্টেজ ও দর্শক শ্রোতাদের আসন সাজানো হয়েছে। ও পাড়া থেকে বিদিশাদি ও বিপাশাদি এসেছে মেয়েদের সাজঘরের ভার নিয়ে। সাজঘরে জোরকদমে মাজা ঘষা চলছে। বড়মার নির্দেশ, সাজ পোষাকে কোন বাহুল্য থাকবে না—তবে চরিত্রানুগ হতে হবে। বিদিশাদি পড়েছে মহাবিপদে—কৌটোর প্রায় সব রং লাগিয়েও শবুর মুখ গা হাত পা যথেষ্ট নীলাভ করা যাচ্ছে না। রেগে জিজ্ঞেস করল—

'এই শবু, তোকে কৃষ্ণের পার্ট কে দিয়েছে রে?'

শবু বলল,—'নাচের দিদি।'

বিদিশাদি বলল—'ডাক তোর নাচের দিদিকে, সেই তোকে কেষ্ট ঠাকুর সাজাক, আমি আর পারছিনা।'

কৃষ্ণের গায়ের রংটাই যদি ঠিক না হয় তবে ত আসল বইটাই মাটি। শেষে নাচের দিদি ও বিদিশাদির মিলিত চেষ্টায় অনেক খেটে খুটে শবুর ফর্সা রংকে চন্দনসই কৃষ্ণের মত করা হল। আসরে বসে নাচ দেখতে দেখতে

গায়ের রং দেখে মা কাকীমা ঠাকুমারা শবুকে প্রায় চিনতেই পারছেন না—শুধু চেনা যাচ্ছে ওর টানাটানা চোখদুটি আর প্রায় তুলি দিয়ে আঁকার মত ধনুকের মত ভুরু দুটি দেখে। নাচগান বেশ ভালই জমল সে রাতে—দিদি গাইল কৃষ্ণের গানগুলি। পরদিন সকালে একপ্রস্থ সাবান খরচ করে তবে ছোটকাকীমা শবুকে কৃষ্ণের কলঙ্ক মুক্ত করলেন।

সাত

মৈত্র মহাশয়ের এখন ভরা সংসার। স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই ছেলের বউ, তিন নাতনী, ছোট বৌমারও সন্তান হবে ক'মাস পরে, আর সবার উপরে আছেন কর্ত্তামা—মৈত্র মহাশয়ের মাতা ঠাকুরানী। মেজ ছেলে হৈম সময়মত বিয়ে না করাতে সবার মনটা একটু খুঁত খুঁত করে।

এদিকে মন্দির কেন্দ্রিক সমুদ্রতীরের এই শহরের আকর্ষণে সব সময়ই দূর দুরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজন ও দূরসম্পর্কীয়রা এমন কি গ্রাম সুবাদে পরিচিত পরিবারের লোকেরা পর্য্যন্ত এসে ভিড় করে বাড়ী ভরে রাখে। অনেকেই একে একে চলে যায় আবার কেউ কেউ থেকেও যায়। এমনই কিছু মাসী পিসী কাকা মামা দাদা নিয়ে সে এক বৃহৎ ব্যাপার। দুবেলা পাতা পড়ে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জনের। এ ছাড়া ঠাকুর চাকর ঝি আর্দালী ত আছেই। ঢেঁকি ঘরে ঢেঁকিতে পাড় পড়ে, গাই বাছুরের সেবা যত্ন চলে—দুধও হয় অনেক। বাড়ীতে পালা পার্বণ চলে যথারীতি।

স্থানীয় ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন সবাই মৈত্র মহাশয়ের বন্ধু স্থানীয়—সবারই আনাগোনা আছে এ বাড়ীতে—তাদের আপ্যায়ন করা হয় সাবেকী নিয়মে। কোথাও সাহেবীয়ানা নেই। একটু সাহেবীয়ানা বা বাবুগিরি আছে সদ্য ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা অবিনাশের। সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে একটা মোটর সাইকেল কিনেছে, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে যায় গায়ে কোট প্যান্ট চাপয়ে।

কর্ত্তামা ও আর দু চারজন আশ্রিত বিধবা যাঁরা তাঁরা অধিকাংশ দিন মন্দির থেকে প্রসাদ এনে একবেলা খান, মাথা পিছু মাসে খরচ পড়ে মাত্র দু টাকা। না হলে বাড়িতে আলাদা হবিষ্যি রান্নার ব্যবস্থাও আছে।

এত বয়সেও কর্ত্তামা কিন্তু বেশ সচল। তিনি তাঁর আলাদা কুঠুরীতে বসে

দিন রাত খুটখাট কি সব কাজ করে চলেন। বাড়ীতে কোন একটা জিনিষ পড়ে থাকতে দেখলে সেটা কুড়িয়ে ঝেড়ে মুছে যত্ন করে তুলে রাখেন। এই নিয়ে হৈম সব সময় কর্তামার পেছনে লাগে, বলে—

'ও কর্তামা, ওটা দিয়া কি হবেনে?'

কর্তামা রাগেন না, বলেন—'আমার মুণ্ডু হবেনে। দরকারে কাজে লাগবেনে।'

পরে কোনদিন যখন হৈম এসে বলে—'কর্তামা, একটা পেরেক দিতি পার?'

একটা পেরেক বের করে দিয়ে কর্তামা বলেন—

'কেন, এখন লাগে কেন?

কোন দিন রাতে শোবার আগে হৈম এসে বলে—'কর্তামা একটুকরা দড়ি দিতি পার? মশারীর দড়িটা ছিঁড়ি গিছে টাঙাতি সময়।'

দড়ি বের করে নাতির দিকে ছুড়ে দিয়ে কর্তামা বলেন—

'কেন, এখন লাগতেছে কেন?'

নাতি আর কর্তামা দুজনেই তখন কথা বলেন দেশী ভাষায়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মেয়ে মহল হয়ত বসে গেলেন কোন মুখ-রোচক খাবার তৈরী করতে। মাল মশলা ডাঁই করে সাজিয়ে উনুন ধরিয়ে চাল বেঁটে, ময়দা মেখে, নারকেল কুরে, দুধ ঘি চিনির ছড়াছড়ি করে সে এক এলাহি ব্যাপার। অধিকাংশ দিনই মৈত্র গৃহিণী নির্ঝরিণী দেবী নিজে হাত লাগিয়ে এসব কাজ করেন—অন্যান্য মেয়ে-বৌদের সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে। অর্ধেক কাজ না হতেই বিকেলের তাসের আসরের সঙ্গিনীরা এসে ডাক দেন। মৈত্র গৃহিণী একটুও দেরী না করে হাত পা ধুয়ে শাড়ী পাল্টে রওনা হয়ে পড়েন। যথারীতি হৈম খাবার তৈরীর আশে পাশে ঘুর ঘুর করে ভাল মন্দ খাবারের আশায়। কিন্তু শবুও ততক্ষণে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। যাবার সময় নির্ঝরিণী দেবী হৈমকে বলে যান—

'কর্তামাকে বল, ওদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।'

হৈম গিয়ে ডাকে—'কত্তামা।'

ব্যাপারটা কর্তামার জানাই আছে, এখন তাঁকেই সব দেখতে হবে। তাই ডাক শুনতে পেয়েই বলে ওঠেন—

'কেন, এখন লাগে কেন্?'

বলতে বলতে কর্তামা এসে কাজে হাত লাগান। নাতবৌদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলেন—

'বাজল শ্যামের বাঁশী, চলল রাধা যমুনায়।' মা কাকীমারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে থাকেন।

কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—'শ্যাম কে কত্তামা?'

কর্ত্তামা বলেন—'তাস'—আর মিটিমিটি হাসেন।

এবারে শবু বলে ফেলে—'শ্যাম মানে ত কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ত ভগবান। তাস কি ভগবান?' উপস্থিত মেয়ে মহল তার কথায় খিলখিল করে হেসে ওঠে।

শবু বুঝতে পারে না এতে এত হাসির কি হল। সে ত এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে, স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। এই ত সেদিন গায়ে এত রং মেখে সে নিজে কৃষ্ণ সেজেছিল—নাটকের অন্যান্য চরিত্রেরা তাকে কতবার 'শ্যাম, শ্যাম' বলে ডেকেছে। সাজ ঘরের বড আয়নায় কৃষ্ণের সাজে সে নিজেকে দেখেছিল। তাসের সাহেব বিবি গোলামের মত দেখতে লাগেনি ত মোটেই।

কর্ত্তামা বেশ বাস্তব বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা। এখন সংসারের সাতে পাঁচে থাকেন না। ছেলের বৌয়ের হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে পূজো আর্চা, মন্দিরে ঠাকুর দর্শন এই সব নিয়ে থাকেন। নাতিরা বড় হয়েছে, দু-দুটো নাতবৌ ঘরে এসেছে, এসেছে কোল নাতনীরা। দুই কোল নাতনী কিন্তু আর শবুকে আদর করে ঘরে লুকোনো মন্দিরের গজা নাড়ুবড়ি পেঁড়া খেতে দেন। আর এই সময় মাঝেমাঝে কিছু অতীত রোমন্থন করেন।

সেই সে কোন কালে কত যুগ আগে তিনবছরের শিশু মহিমকে কোলে করে বিধবা হয়েছিলেন তিনি। একমাত্র শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে স্বামীর অনুগামিনী হতে পারেন নি। অসহায় নিঃসম্বল বিধবার শ্বশুরকুল পিতৃকুল কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। কোন উপায় না দেখে শুরু করলেন পরের ঘরের রাঁধুনী বৃত্তি। থাকেন স্বামী—শ্বশুরের জীর্ণ ভিটেয়—সামনে একমাত্র লক্ষ্য শিশু মহিমকে মানুষ করে তুলতে হবে—চলল তারই কঠোর সাধনা। তিনি নিজেও কিছু লেখাপড়া জানতেন, মহিমও লেখাপডায় বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগল।

গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে মহিম পড়তে লাগল পাশের গ্রামের হাইস্কুলে। মহিম অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও মেধাবী ছাত্র। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় খুব ভাল ভাবে পাশ দিল। এর পর কি করা যায়? মহিম হতে চায় ইঞ্জিনীয়ার বা অন্ততঃ পক্ষে ওভারসীয়ার, কিন্তু কোনটারই সঙ্গতি নেই। বিধবা মা

যেন আরও অকূল পাথারে পড়লেন।

এমন সময় পাঁচ মাইল দূর গাঁয়ের সম্পন্ন গৃহস্থ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে প্রস্তাব এল, মহিমকে তিনি ওভারসীয়ারী পড়াবেন যদি তাকে পান ঘর-জামাইরূপে। চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা নিরু অর্থাৎ নির্ঝরিণীর জন্য তিনি এইরকম একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ছেলের খোঁজ করছিলেন। ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল খুঁজে পাওয়া গেল। বিধবা যেন অকূল সমুদ্রে কূল দেখতে পেলেন। শুভ দিন ক্ষণ দেখে ষোল বছরের মহিম ও তের বছরের নিরুর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মহিম চলে গেল শহরে ওভারসীয়ারী পড়তে। মহিমের বিধবা মা রয়ে গেলেন চৌধুরী মহাশয়ের সংসারে সম্মানিত অতিথি-রূপে—মহিম ছুটিছাটায় গ্রামে আসা যাওয়া করত।

ছাত্রাবস্থাতেই মহিমের বয়স যখন আঠারো উনিশ তখন এল প্রথম সন্তান গিরিন। তারপর তিন ও দু বছরের মাথায় পরপর ভূমিষ্ঠ হল হৈম ও অবিনাশ। ততদিনে মহিম ওভারসীয়ারী পাশ করেছে, টুকটাক কিছু কাজ কর্মও করছে। কিন্তু সংসার বড় হয়ে গেছে, যে রোজগার হয় তাতে কিছুই হয় না—চিরকাল শ্বশুরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা ভালও দেখায় না। মহিম বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে—শেষে সরকারী ওভারসীয়ার হয়ে চলে এল এই শহরে—সমুদ্র তীরের এই মন্দির শহরে।

বিধবা মা ও স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে রয়ে গেলেন গ্রামে। তিন ভাই গ্রাম্য পরিবেশে দাদু-দিদিমার অতি আদরে বড় হতে থাকে। শুধু বড়ই হয়, কিন্তু গ্রাম্যতা তাদের ঘিরে থাকে। গ্রামে নেই কোন স্কুল, নেই কোন পাঠশালা। পাঁচছয় বছরের ছেলেরা উদোম ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, শহর থেকে আত্মীয় স্বজনরা এসে দেখে অবাক মানে—ওমা, এত বড় বড় ছেলেরা প্যাণ্ট পরে না! গ্রামে প্যান্টের চলন নেই। কর্তামা অনেক চেষ্টায় নাতিদের কাপড় পরা শেখালেন। আর শিখেছে পাকা পাকা কথা। নদীর ঘাটে পাতা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারে, অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের মা। বড় ছেলে মাকে বলে—

'ছেলে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, ছেলে জলে পড়ে গেলে ছেলে পাবি কনে?'

হয়ত সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে। ছোট দুজনকে উঠোনে ঘোরা ফেরা করতে দেখে কর্তামা জিজ্ঞেস করেন বড় জনের কথা—

'সে গেল কনে, তাকে যে দেখছিনা?'

মেজো জন ফস করে উত্তর দেয়—'সে কি তোর ভাতার? নাম বলতে পারিস না?'

এমনি সব পাকা পাকা কথা। কর্তামার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। একমাত্র ছেলে মহিমকে তিনি এত কষ্টে পরের বাড়ী রাঁধুনীগিরি করে মানুষ করেছেন—আর চোখের সামনে নাতিগুলো অমানুষ হয়ে যাবে? চৌধুরী মশাইকে বললেন—

'বেয়াই মশাই, নাতিগুলো আকাট মূখ্যু হয়ে রইল, দিনে দিনে অমানুষ হয়ে উঠছে। আপনি ব্যবস্থা করুন আমি বৌমা আর নাতিদের ছেলের কাছে নিয়ে যাই।'

কর্তামা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মহিলা। ছেলেকে ঘরজামাই হতে দিয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান কখনো নষ্ট হতে দেন নি। চৌধুরী মশাইকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হতে হল।

তারপরে হঠাৎ এক অবাক করা সকালে নিস্তারিণীদেবী ছেলের বৌকে সঙ্গে করে নাতিদের হাত ধরে এই শহরে এসে পৌঁছলেন। মহিম পড়ল মহা অসুবিধায়—এতটুকু ছোট বাসায় বলা নেই কওয়া নেই সবাই এসে হাজির হল! ভেবেছিল আর দুটি বছর সময় পেলে একটা ভদ্রাসন তৈরী করে সবাইকে নিয়ে আসবে। আড়ালে সেই কথা বলে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলল—

'আর দুটো বছর সবুর সইল না?'

স্ত্রী নিরু জবাব দিল—'আমাকে দুষছো কেন? মা-ই তো নিয়ে এলেন আমাদেরকে, তাঁকে বলো গিয়ে।'

সর্বনাশ! মাকে বলবে একথা এতবড় স্পর্দ্ধা মহিমের! আর কোন কথা না বলে মহিম কাজ শুরু করে দিল—সেও কাজের মানুষ। ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করেই লেগে গেল বাড়ী তৈরী করতে। মাত্র এক বছরের মধ্যে আলা-উদ্দিনের দৈত্যের সৃষ্টির মত গড়ে উঠল এই বিরাট ভদ্রাসন। তাড়াতাড়িতে ভাল জমি পাওয়া গেলনা, তাই সরকারী খাসমহলের জমি লীজ নিয়ে তার উপরে মাথা তুলল এই অট্টালিকা।

একটা সুফল কিন্তু সত্য সত্যই পাওয়া গেল—নিরুর (নির্ঝরিণী) ছিল আজন্ম চোখের ব্যারাম। এখানে সমুদ্রের জল হাওয়ায় কি ছিল কে জানে এক বছরের মধ্যে তার চোখের অসুখ ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার।

এ সব কথা কিন্তু শবু কর্তামার মুখে কতবার শুনেছে আর কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে সেই কোন সুদূর অতীতে—যেখানে কর্তামা পরের বাড়ী রান্না

করে, ঠাকুমা চোখের অসুখে দিনরাত চোখ কচলায় আর চোখ দিয়ে জল পড়ে, বাবা কাকারা গ্রামের মাঠে ঘাটে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বঁড়শিতে মাছ ধরার চেষ্টা করে। রূপকথার গল্প ওরা বেশী শোনেনি,—মৈত্র পরিবারের অতীত ইতিহাস ওদের মনে রূপকথা হয়ে ধরা দেয়।

এ সব কথায় ওদের ঠাকুমা বিশেষ কান দেন না। শুধু শাশুড়ীর আড়ালে বলেন—

'আমাদের গ্রামে পড়াশুনার চল থাকবে না কেন? ছেলেদের বাপ তো গ্রামে থাকতো না, তাই ওরা ঐ রকম হয়ে গেছলো। এখানে এসে ওরা কেমন টপাটপ স্কুলের পড়া শেষ করে বড় বড় কলেজে পড়ল।'

তা ঠিক। ঠাকুমা নিজেই বেশ পড়তে লিখতে পারেন—তবে রামায়ণ মহাভারতের চাইতে তিনি বঙ্কিমবাবু রবিবাবু আর শরৎবাবুর বই পড়তে বেশী ভালবাসেন। বাবা কাকারা ত কত মোটামোটা বাংলা ইংরাজী বই পড়েছেন—এখনও বৈঠকখানা ঘরের কাঁচের আলমারীতে কত বই সাজানো আছে।

আট

শহরে খবর রটে গেছে রবীন্দ্রনাথ আসছেন সমুদ্র তীরের এই শহরে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে। তিনি এসে উঠবেন সার্কিট হাউসে। শহর সুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ল বিশ্বকবির দর্শন পাবার আশায়। বাড়ীর বড়রা সময় সুযোগমত গিয়ে কবির দর্শন লাভ করে এলেন। বড়মা এখন সব সময় ঠাকুর কবির কাছে কাছে রয়েছেন। বড়মা ঠিক করলেন কবিগুরুকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানাবেন তাঁর স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রী ও আশ্রম বালিকাদের দিয়ে। ছোটখাট একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল 'ভাদুরী লজের' আঙিনায়। সুন্দর চেহারার কয়েকটি মেয়েকে দিয়ে কবির গলায় মালা পরানো হবে—সে দলে শবুই প্রথম, ওদের মধ্যে সবার ছোট বলে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শবু এগিয়ে গিয়ে যেই ফুলের মালাখানি কবির গলায় পরাতে গেল অমনি কবি তার হাত থেকে মালাখানি নিয়ে তারই গলায় পরিয়ে দিলেন। শেখানোমত ঝুপ করে কবির পায়ে প্রণাম করে শবু নিজের জায়গায় ফিরে এল। পরে অন্য সকলে কবিকে মালা পরাল। এরপর কিছু গানের

পর অনুষ্ঠান শেষ হল। শবু গলায় মালাটি ঝুলিয়ে দিদি কিঙ্কুর সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল।

বড় কাকা দেখে শুনে বললেন—'এ মালা মহামূল্যবান, যত্ন করে রাখতে হবে।'

বৈঠকখানা ঘরের কাঁচের আলমারীতে মালাটি যত্ন করে ঝুলিয়ে রাখা হল।

মামাবাড়ী থেকে দিদিমার চিঠি এসেছে। লিখেছেন, অনেকদিন ছোট মেয়েকে দেখেননি, দেখতে ইচ্ছে করে। কিছুদিনের মধ্যে ছোটমামা এসে উপস্থিত হলেন বোনকে নিয়ে যাবার জন্য। শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি।

ছোটমামা ও বড়কাকা এক বয়সী, দুজনই খুব রসিক। কিন্তু চেহারায় স্বভাবে দুজনে একেবারে উল্টোধরনের। বড়কাকা যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি কালো, লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল, রীতিমত পাশ করা ডাক্তার, ভাল গাইয়ে, পোষাক পরিচ্ছদে একেবারেই উদাসীন আর ভোজনে পটু। ছোটমামা অনেকটা বেঁটে-খাটো, ফর্সা গায়ের রং জমিদারের ছোট পুত্তুর তাই লেখাপড়া স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই শেষ হয়ে গেছে (বড় মামা অবশ্য বি এ পাশ), পোষাক আষাকে খুব শৌখিন—ধুতির কোঁচাটি সব সময় হাতের মুঠোতে ধরা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, খাওয়া দাওয়ায় পরিমিত রুচি। রসিকতায় কিন্তু দুজনেই সমান আর তাই দুই বৈপরীত্যের প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।

ছোটমামা আসাতে দুই বন্ধুতে মিলে সারাদিন হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ান, গল্পে আড্ডায় মজলিশে সারা বাড়ী গমগম করতে লাগল। মৈত্র মহাশয় সরকারী সফরে ক'দিনের জন্য বাইরে গেছেন—যাবার আগে বড় পুত্রবধূকে বাপের বাড়ী যাবার অনুমতি দিয়ে গেছেন।

একরাতে বাবা দুই কাকা ছোটমামা সবাই এক সারিতে খেতে বসেছেন। কিঙ্কু শবুরা একটু দূরে আলাদা খেতে বসেছে। মিতু তখনও কোলে। ঠাকুর রান্নাঘর থেকে যোগান দিচ্ছে, মা কাকীমা পরিবেশন করছেন, ঠাকুমা কাছেই একটা পিঁড়িতে বসে সব দেখাশোনা করছেন। খেতে খেতে হঠাৎ বড়কাকা বলে উঠলেন—

'সেদিন দেখলাম, বৌদির এক বোনপো এখানকার সব থেকে বড় হোটেলে উঠেছিল। তার ঠাটবাট দেখে বুঝলাম আমরা তাদের কড়ে আঙ্গুলেরও যুগ্যি নই। আচ্ছা দাদা, এরা যে বাড়ীর জামাই বা ভাগ্নে তুমি সে বাড়ীর জামাই হলে কি করে?' বলেই বড়কাকার সে কি প্রাণখোলা

ঘর কাঁপানো হাসি।

রায় মশাই (ছোটমামা) লজ্জায় অধোবদন হয়ে বেশী করে খাবারের দিকে মনযোগ দিলেন। আর সকলের দৃষ্টি এখন গিরিনবাবুর উপর। মা পদ্মিনী দেবীর বুক দুরু দুরু করে ওঠে অজানা জবাবের আশঙ্কায়।

গিরিনবাবু এত টুকু চিন্তা না করে হেসে জবাব দিলেন—

'উত্তরটা খুবই সহজ। দিদিদের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের পিতৃদেব অর্থাৎ আমার শ্বশুর মশাই আর তোমার বৌদির বিয়ে দেন শ্বশুর মশাইয়ের অবর্ত্তমানে তাঁর ছেলেরা।'

এবার রায়মশাইয়ের হাসিতে সারা বাড়ী কেঁপে উঠল—প্রকৃত রসিক ব্যক্তি তিনি, মৃদু খোঁচাটা গায়েই মাখলেন না। পদ্মিনী দেবীর মন থেকে কালো দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল—ঠাকুমা চোখ দুটো পিটপিট করে মৃদু হাসতে লাগলেন। সকলে অনাবিল আনন্দে খাওয়া সেরে উঠে পড়লেন। আপাতগম্ভীর গিরিনবাবুর মনেও বয়ে চলে অবিরাম রসের ফল্গুধারা।

বড়কাকা সকালে সাধারণত একটু বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। গ্রামের মানুষ ছোটমামা খুব ভোরে উঠে কিঙ্কু শবুকে নিয়ে সোজা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যান। হাঁটতে হাঁটতে সবাই চলে পশ্চিমের দিকে—কিঙ্কু শবু ভাবে, মামা বুঝি বড়মার স্কুলের দিকে যাচ্ছে। ওরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করতে করতে চলেছে। কিন্তু না। পথেই সমুদ্রতীরের শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছেন ছোটমামা। শ্মশানে যেতে ওদের ভয় করে, দূরে দাঁড়িয়ে দেখে—ছোটমামা এক জায়গায় বালির উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে এসে বোনঝিদের নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। পরপর দুদিন এরকম ঘটল। শেষটায় কৌতুহল দমন করতে না পেরে কিঙ্কু মাকে জিজ্ঞেস করল—

'মা, ছোটমামা রোজ সকালে শ্মশানে গিয়ে কাঁদে কেন?'

মার চোখ দুটো বেদনায় ছলছল করে ওঠে। মনে পড়ে যায়, সবে তিনি এই বাড়ীতে বউ হয়ে এসেছেন, বছরও ঘোরেনি। ছোট বৌদি অপরূপ সুন্দরী, দাদা তাকে প্রাণের চাইতে ভালবাসেন। গ্রামেই ছেলে হতে গিয়ে হল জীবন সংশয়। অনেক চেষ্টায় বৌদি বেঁচে গেলেন, কিন্তু সন্তানকে বাঁচানো গেল না। শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল বৌদির। দাদা তাকে নিয়ে এলেন সমুদ্রের ধারে এই শহরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আশায়। এখানে

আসার পর মাত্র একটি মাস কাটিয়ে ছোটবৌদি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দাদার সেদিন সে কি কান্না! ঐ শ্মশানেই বৌদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এয়োরা দিয়েছিল সধবার সিঁথিতে সিঁদুর। দাদা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে হৈমর কাঁধে ভর দিয়ে ছোট ভগ্নীপতির সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেলেন পারলৌকিক ক্রিয়া সারতে। সংসার ধর্মের প্রয়োজনে দাদাকে আবার বিয়ে করতে হয়েছে, কিন্তু প্রথমার স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেন নি। হৈমই ছিলেন সেদিন তাঁর সমবেদনায় অকৃত্রিম। তাতেই দুই কুটুম্বের এত নিবিড় বন্ধুত্ব। বাইরে তাদের যত রসিকতা প্রগলভতা সবই সেই অন্তঃসলিলা বেদনাধারাকে চাপা দেবার চেষ্টায়।

কদিন পরে কিন্তু শবুরা মামাবাড়ী রওনা হল। মিতু চলল মায়ের কোলে। ঠিক হল ছোটমামা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মাসখানেক পরে কলকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবেন, বাবা গিয়ে কলকাতা থেকে সবাইকে নিয়ে আসবেন।

এবার গ্রামে গিয়ে ওরা কত্তামার বর্ণনার গ্রামকে মেলাতে চেষ্টা করছে। নৌকো নদী ছেড়ে বিলের মধ্যে পড়ল, আবার বিল থেকে একটা খালের মধ্য দিয়ে মামাবাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আষাঢ়মাস বর্ষাকাল, চারদিকে জল আর জল। কাছেই কোথাও চলন বিল আছে। বর্ষাকালে তার এমন বিশাল চেহারা হয় যে তার ওকূল দেখা যায় না, ঠিক যেন ওদের পরিচিত সেই সমুদ্রের মত। বিলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখেছে কত শালুক পদ্মের ছড়াছড়ি। পদ্মফুল কি সুন্দর দেখতে। মাকেও দেখতে পদ্মের মত সুন্দর, তাই বুঝি মার নাম পদ্মিনী!

মামাবাড়ীতে গিয়ে ওরা গ্রামের চেহারা আরও স্পষ্ট দেখতে পেল। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, দূরে দূরে সব ছোট ছোট চালাঘর। চারপাশে ওদেরই বয়েসী ছেলে মেয়েরা উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে কিন্তু শবুরাই বিশেষ দ্রষ্টব্য—কি সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরে ওরা, মাথায় ববছাঁট চুল লাল রিবন দিয়ে বাঁধা, তাতে আবার ক্লিপ আঁটা থাকে। সকলেই ওদের একটু কাছে ঘেঁষতে চায়, ওদের সঙ্গে খেলতে পেলে কৃতার্থ বোধ করে। কিন্তু, শবুরা কারও সঙ্গে মারামারি করে না। গ্রামের ছেলেরাই নিজেদের মধ্যে নকল মারামারি করে শক্তি দেখায়। এদের গায়ে খুব জোর মনে হয়। ছোটমামার বড় ছেলে অজয় একাই সবাইকে হারিয়ে দেয়। বড়মামার বড় ছেলে শুভদা-দাদা সবার বড়। সে কিন্তু বেশ একটু গাম্ভীর্য নিয়ে থাকে ভাবী

জমিদারের মত। চেহারাটাও ঠিক রাজপুত্রের মত দেখতে।

মামারা জমিদার, বেশ বড়লোক। মামীদের গায়ের গয়না দেখে ওদের শিহরণ লাগে—কত গয়না! খাওয়া দাওয়ার খুব ঘটাপটা। বড়মামা সেরেস্তায় বসে নায়েবমশাই সরকার মশাইদের সঙ্গে জমিদারীর কাজ কর্ম দেখেন। লোক লস্কর দাসদাসীতে মিলে সারাটা বাড়ী গিজগিজ করছে। দিদিমা ওদের খুব আদর করেন, মামীরা করেন যত্ন। লোকে বলতেই বলে—মামাবাড়ীর আদর। খেতে বসে মামীরা ওদের পাতে দুটো করে বড় বড় মাছ দেন। তাই দেখে অন্য মামাতো ভাই বোনেরা যেই মুখ গোমড়া করে অমনি এক মামী এসে তাদের পিঠে দুম দুম করে কিল বসায়। গাঁয়ের লোকেরা কথায় কথায় খুব মারে। কিন্তু শবুদের ভাল লাগে না। শহরে কেউ ওদের মারে না।

সন্ধ্যে লাগতেই ছোটদেরকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রাতে শুতে এসে মা যখন ওদের হিসি করাতে নিয়ে যায়, তখন কত রাত কে জানে, ওরা দেখতে পায় ভিতরের বারান্দায় বড় আলো জেলে দিদিমা বড়মামা ছোটমামা আর সরকার মশাই লাল খেরোখাতায় সারাদিনের খরচপত্রের হিসেব নিকেশ করছেন। কোন কোন দিন এক পয়সার হিসেব খুঁজে বের করতে অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যায়। দূরে উঠোনের এক কোণে বল্লমটা পাশে রেখে উবু হয়ে বসে থাকে নিবারণ—লাঠিয়ালদের সর্দার, সে সারারাত বাড়ী পাহারা দেয়।

একবার মার সঙ্গে পাশের গ্রামে বড়মাসীর বাড়ীও ঘুরে এল। মামাবাড়ী বেড়ানো শেষ করে এবার কিন্তু শবুরা ফিরে চলেছে। বাবা কলকাতায় এসে সবাইকে নিয়ে হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলেন ইণ্টার ক্লাশে। মাঝ পথে এক স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়তে দুপুর রাতে দুটো লোক চলন্ত গাড়ীতে সেই কামরায় উঠতে চাইছিল। চেহারা দেখে বাবা-মার সন্দেহ হল—ওরা নিশ্চয়ই ডাকাত। বাবা শক্ত করে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রইলেন একা, কারণ কামরায় ওরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরের স্টেশনে গাড়ী থামতে লোক দুটো সরে পড়ল। বাবা স্টেশনে নেমে গিয়ে গার্ড সাহেবকে বলে এলেন—পথে আর কোন বিপদ হল না। বাবার গায়ে খুব জোর। ভাগ্যিস ডাকাত দুটো ঢুকতে পারে নি, না হলে যে কি হত ভেবে কিন্তু শবুর ভয় করছিল। মামাতো ভাই অজয়ের গায়ে অনেক জোর—কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে না।

নয়

বর্ষা এসেছে। সারা দেশ জুড়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। নদীতে নদীতে ভীষণ বন্যা দেখা দিয়েছে। বর্ষার দাপটে শহরের পথঘাট প্রায় জনহীন, জনজীবন বিপর্যস্ত। প্রায়ই বড়মার স্কুলে 'রেনি-ডে' বলে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শবুরা দেখে এল বর্ষায় নদী খাল বিল ডুবো গ্রাম এই কদিন আগেই। এখন শহরেও সবাইকে পচিয়ে মারছে। স্কুলের গাড়ী বেশীর ভাগ দিন পথে বের হচ্ছে না, যদিও বা বের হয় পথ এত খারাপ যে মাঝে মাঝেই বিকল হয়ে পড়ে পথের মাঝে। তখন গাড়ীর যাত্রী ছেলে-মেয়েরা আর পথ চলতি মানুষের চেষ্টায় অনেক ঠেলাঠেলি করে গাড়ী স্টার্ট নেয়। কিন্তু শবুদের গাড়ী ঠেলতে বেশ মজা লাগে- যদিও তাদের গায়ে জোরই বা কতটুক। তবু সবাই মিলে কচি কচি গলায় 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' আওয়াজ তুলে ঠেলাঠেলি করতে বেশ একটা খেলা খেলা আমেজ লাগে। গাড়ী চালায় ওদেরই স্কুলের এক ছাত্রী ফ্যান্সীর বাবা।

মৈত্র মহাশয়ের শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। বয়সও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ভাবছিলেন—অনেক বছর একটানা কাজ করা হল, এখন একবার একসঙ্গে তিন চার মাস ছুটি নিয়ে শরীরটাকে একটু ঠিক করে নিতে হবে। উপর মহলে সে কথা জানিয়েও রেখেছেন। এখন শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। আজকাল বাইরের সফরে বেশী যান না। হাঁটুতে বাতের ব্যথার জন্য চলা ফেরায় কষ্ট পাচ্ছেন। আবার এই একটানা বর্ষায় সেই ব্যথাটা বেশ বেড়ে গেছে।

এমন সময় উপর থেকে খবর এল, ক'দিনের বর্ষায় ভুবনেশ্বরের আশপাশ এলাকায় ভীষণ ক্ষতি হয়েছে, রাস্তার পুল ভেঙে গিয়ে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নদী কূল ছাপিয়ে কোথাও কোথাও বাঁধ ভেঙে বা রাস্তা উপচে গ্রাম গঞ্জ সব ভাসিয়ে দিচ্ছে। এখনই সরেজমিনে গিয়ে সব ব্যবস্থা নিতে হবে। একেবারে জরুরী তলব—হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন—যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিপর্য্যস্ত। কাল বিলম্ব না করে রওনা হতে হবে।

কথাটা শুনেই মৈত্র গৃহিণী রেগে গেলেন, দেখছে মানুষটার শরীর ভাল নেই, চলতে গেলে ছড়ির উপর ভর দিয়ে চলতে হয়—তাকেই এই বর্ষা বাদলের

মধ্যে ছুটতে হবে, আর কি লোক নেই? স্বামীকে অনুনয় করে বললেন—

'তোমার গিয়ে দরকার নেই, তুমি বরং ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দাও, ডাক্তারী সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দাও।'

কর্তা বললেন—'তা কি হয়? এ হল জরুরী ডাক, ছুটি চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে নিশ্চয়ই। আর আমি ছাড়া এ সব কাজ এখানে কে বুঝবে? সরকারী চাকরি।'

কর্ত্রী বললেন—'ছেড়ে দাও অমন চাকরি—চাকরি বড় না মানুষের প্রাণটা বড়?'

কিন্তু মৈত্র মহাশয় নিরুপায়। বললেন—

'এই বাজারে চাকরি ছাড়লে এতগুলো পোষ্য নিয়ে যে না খেয়ে মরতে হবে। যা দিন কাল পড়েছে জিনিষ পত্রের দাম সব দেড়গুণ দুগুণ হয়ে গেছে। ইউরোপে জার্মানী আর ইতালী ইংরেজ ফরাসী ও রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, আমাদের ইংরেজ সরকার যুদ্ধের জন্য কেবল নোট ছাপাচ্ছে আর জিনিষের দাম বাড়ছে। ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখেও দিনরাত শুধু গান বাজনা আর আড্ডা নিয়ে আছে। গিরিন অবশ্য হোমিওপ্যাথি করছে সঙ্গে এটা-ওটাও করছে তাতে আর ক'পয়সা আসে?'

যাত্রার সময় যত এগিয়ে আসছে মৈত্র মহাশয়ের মন তত ভারি হয়ে উঠছে। কর্তামার ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকলেন মা'।

কর্তামা নিস্তারিণী দেবী ডাক শুনে এগিয়ে এলেন, বললেন—'কি রে, মহিম? কিছু বলবি?'

মহিম বলল—'মা, ক'দিনের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে—তোমরা সব সাবধানে থেকো।'

মা বললেন—'আমাদের জন্য ভাবিস না, আমরা তো বাড়ীতেই রইলাম। এই দুর্যোগের মধ্যে বের হচ্ছিস, সাবধানে চলাফেরা করিস।'

শোবার ঘরে ফিরে এসে মৈত্র মহাশয় ছেলেদের সব দরকারী নির্দেশ দিলেন। বড়ছেলে গিরিনকে বললেন—

'আমি না ফেরা পর্য্যন্ত সব দেখে শুনে রেখো। গোয়াল ঘরটা মেরামত করা দরকার এখনই—না হলে এই বর্ষায় অবলা গরুবাছুরগুলো কষ্ট পাবে। লোক লাগিয়ে মেরামত করাবে, তোমাদের মার কাছে টাকা রইল।'

গৃহিণীকে বললেন—'ছোট বৌমা সন্তান-সম্ভবা, তার ঠিকমত দেখা-শোনা হওয়া দরকার—বিশ্রাম দরকার।'

বড় পুত্রবধুকে বললেন—'সবাই সাবধানে থাকবে। মেয়েদের যেন কোন অযত্ন কোরোনা। আমাদের বংশে তিন পুরুষে কোন মেয়ে ছিলনা। এরা সব আমার ঘরের লক্ষ্মী।'

বলে এক এক করে তিন নাতনীর মাথায় আদর করে হাত বুলোলেন, শবুকেই বোধ হয় একটু বেশী আদর করলেন আর কিস্কুর দিকে চেয়ে বললেন—

'ফিরে এসে এবারে তোকে একটা বিয়ে দিতে হবে।'

কিস্কু বলল—'ধেৎ।'

মৈত্র গৃহিণী শুধু বললেন—'ভালয় ভালয় ফিরে এসো।' গলাটা তাঁর ধরে এল—বারবার দুর্গানাম স্মরণ করতে লাগলেন।

মহিম মৈত্র মহাশয় কর্ত্তব্যের ডাকে সফরে বেরিয়ে পডলেন—সঙ্গে আর্দালী আর মাথায় দুর্যোগ নিয়ে। ভরা শ্রাবণ মাস।

সেই দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বন্যার ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে ট্রেনে করে মৈত্র মহাশয় তাঁর গন্তব্যস্থল ভুবনেশ্বরে পৌঁছলেন। তারপরে সড়ক পথে বেরিয়ে পড়লেন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে। পথে চলতে দেখলেন প্রধান সড়কের ৩নং ও ৭নং কালভার্ট বন্যার তোড়ে প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, গাড়ী চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোক লস্কর মাল মশলা আনিয়ে পুল মেরামতের কাজে লাগিয়ে দিলেন। দুদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় সে দুটোর মেরামত হল। বন্যায় লোকদের পানীয় জলের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, পুকুর কুয়ো সব জলে জলাকার। চার-পাঁচটা টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করলেন।

এমন সময় খবর এল গঙ্গুয়া নদী প্রায় মাইল তিনেক দূরে বাঁধ ভেঙে আশপাশের গ্রামগুলো ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। লোকজন সব হাঁটা পথে রওনা করে দিয়ে মৈত্র মহাশয় একটি ভাড়া করা নৌকোয় গঙ্গুয়ার স্রোতে ভেসে চললেন। সঙ্গে আছে আর্দালী, অফিস পিওন আর নৌকোর তিন দাঁড়ী মাঝি। তখন সবে সকাল হয়েছে, আকাশ মেঘে ঢাকা।

প্রবল বন্যার বেগে নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ী নদী, ছোট নদী। অন্যসময় দেখা যায় শুধু বালির চর—জলের একটি ধারাও বয় কিনা সন্দেহ। নদী চওড়ায় একটা বড় খালের চাইতে খুব বেশী নয়। এখন ক্রমাগত বর্ষণে পাহাড়ের দিক থেকে ঢল নেমেছে। নদী দু'কুল ছাপিয়ে গাছপালা উপড়ে শস্য ক্ষেত ভাসিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে। বাঁকের মুখে বা যেখানে বাধা পাচ্ছে সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট বিরাট ঘূর্ণির। মহিমবাবু

মাঝিদের সতর্কভাবে নৌকো চালাতে বলে ছইয়ের নীচে গিয়ে গাটা একটু এলিয়ে দিলেন।

গত কয়েকদিনের দুর্দান্ত পরিশ্রমে ঘুম এসে যাচ্ছে। ভাবছেন—স্ত্রী নিরু ঠিকই বলেছে, এই শরীরে এত ঝকমারি আর পোষায় না। এবারে ফিরে গিয়েই চাকরি থেকে অবসর নেবেন। মনে পড়ে গেল বিরাট সংসারের দায়িত্বের কথা, জিনিষ পত্রের দরদামের কথা—বাজারে যেন আগুন লেগেছে। যা হয় হবে। স্বাধীন ভাবে কন্ট্রাক্টরী করবেন। বন্ধু রাখহরি ঠিকেদারী করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে—বরং যুদ্ধের বাজারে আরো ফুলেফেঁপে উঠছে। সে তুলনায় উকিল ডাক্তার এমনকি স্থানীয় জমিদার বাঁড়ুজ্যে বাবুরাই খরচের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। ছোট ছেলে অবিনাশকে ইঞ্জিনীয়ার করে এনেছেন—তাকেও কন্ট্রাক্টরীতে লাগিয়ে দেবেন, সে করবে বাইরের কাজ আর তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। এ সব কাজে অভিজ্ঞতা চাই। এত বড় সংসার চালাতে হবে। একে একে মা, স্ত্রী, পুত্র পুত্রবধূদের ও নাতনীগুলোর মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠল—তাদের সবাইকে নিয়েই তাঁর সংসার।

একি! নৌকোটা এত জোরে দুলে উঠল কেন! বাইরে দাঁড়ী মাঝিদের সামাল সামাল রব উঠল। আর্দালী ও পিওন এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—

'ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, শিগগীর বেরিয়ে আসুন, নৌকো একটা ডুবন্ত বটগাছে ধাক্কা খেয়েছে।'

মৈত্র মহাশায় গ্রামের মানুষ, সাঁতার ভালই জানেন। দ্রুত ছইয়ের নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু অশক্ত ও শ্রান্ত দেহে ততটা দ্রুত বের হতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে নৌকো সামনের এক বিশাল ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে একটা পাক খেয়ে সোজা উল্টে গেল। নৌকোর অন্যসব যাত্রীরা ছিটকে কেউ নদীর জলে পড়ল, কেউ বা হাতের কাছে বটগাছের ডাল পেয়ে সেটা ধরে ঝুলতে লাগল। মৈত্র মহাশয় হঠাৎ জলবেষ্টিত হয়ে 'হা-ভগবান' বলে ছইয়ের তলা থেকে বের হবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো নৌকোর খোলে আটকে অতলে তলিয়ে গেলেন।

বহুদিনের সঙ্গী আর্দালী প্রাণপণে একটা ডুবন্ত গাছের ডাল ধরে দুরন্ত স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চীৎকার করে ডাকতে লাগল 'ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, আপনি কোথায়', 'বুড়োকর্তা আপনি কোথায়'—কোন সাড়া মিলল না। তিন দাঁড়ীমাঝি ও পিওন কোনক্রমে সাঁতরে পাড়ে উঠেছে। নৌকো উল্টে যাবার আগের মুহূর্তেও আর্দালী তার মনিবকে ছই এর নীচ থেকে বের

করতে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি, অন্যরা সব নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যগ্র ছিল।

দূরে নৌকোর কিছু পাটাতন আর কয়েকটা লগি বইঠা ভেসে যেতে দেখে আর্দালী নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সে দিকে সাঁতরে চলল। দেখতে পেল কর্তার হাতের ছড়িটি অন্য কাঠ কুটোর সঙ্গে ভেসে চলেছে—কিন্তু তার মালিকের কোন চিহ্ন নেই। ছড়িটাকে ধরে নিয়ে অনেক কষ্টে প্রায় আধ-মাইল ভাটিতে সে তীরে উঠল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ও বারবার 'বুড়ো কর্তা' বলে ডেকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভুবনেশ্বরের অফিসের দিকে হাঁটা পথে ছুটে চলল। অফিসে পৌঁছে সে কেঁদে পড়ল—

'সর্বনাশ হেই গলা। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব পানিরে ডুবি গলে।'

দশ

কথায় বলে, দুঃসংবাদ বাতাসে ভর করে চলে প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে। এদিকে মৈত্র মহাশয়ের ভদ্রাসনে রোজকার মত সেদিনও সকাল থেকে কর্ম ব্যস্ততা। গিরিন লোকজন লাগিয়ে গোয়ালঘর মেরামতে লেগে গেছে—পিতৃ-আদেশ। মা নির্ঝরিণী দেবী বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—

'হ্যাঁরে, তোদের বাবা কবে ফিরবেন কিছু বলেছিলেন কি ?'

গিরিন বলল—'সঠিক করেতো কিছু বলে যান নি, মা।'

মা আনমনা হয়ে অন্য কাজে চলে গেলেন। স্কুলের গাড়ী আসেনি, তাই কিঙ্কু শবুরা কেউ স্কুলে যায় নি। দু'বোনে মিতুকে নিয়ে আছে, মা কাকীমারা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত। হেম অবিনাশ অলসভাবে বৈঠকখানায় সময় কাটাচ্ছে। আজ একাদশী। কর্তামা তাঁর শোবার ঘরে পুজো আর্চায় রত। বেলা সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মৈত্র মহাশয়ের বন্ধু রাখহরিবাবু এসে ডাকলেন—'গিরিন আছ নাকি ?'

গিরিন এগিয়ে গেল। রাখহরি বাবু জিজ্ঞেস করলেন--'বাবার খবর কি ? কবে ফিরবেন ?'

'ঠিক করে কিছু বলে যান নি, আপনি বসুন।'

'না থাক, এখন যাই, আবার পরে আসবো' বলে তিনি চলে গেলেন।

গিরিন আবার ঘর মেরামতের কাজ দেখাশোনা করতে লাগল।

একটু পরেই এলেন উকিলের পোষাক পরা হিতেনবাবু, জিজ্ঞেস করলেন গিরিনকে—

'মহিম কবে আসবে?'

'সঠিক কিছু বলে যান নি'।…

'পরে আসবো' বলে হিতেনবাবু চলে গেলেন।

জমিদার বাঁড়ুজ্যে মশাই লোক পাঠালেন, মহিম কবে ফিরবে জানতে চেয়ে। পরে পরে শহরের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকেও লোক এসে এসে খোঁজ করে গেল, মৈত্র মহাশয় ফিরেছেন কিনা। বাড়ীতে দুশ্চিন্তার কালোমেঘ সবার অলক্ষ্যে জমা হতে লাগল। সবাই এসে কেন একই কথা জিজ্ঞেস করে? আবার 'পরে আসব' বলে অন্যমনস্ক ভাবে চলে যায়? মা নির্ঝরিণী দেবী বললেন—

'গিরিন, আমার কিছু ভাল বোধ হচ্ছে না। সবাই কেন এক কথা জিজ্ঞেস করে? তোরা একটু খোঁজ খবর করবি?'

হেম অবিনাশও বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কিছু বন্ধু বান্ধব, যারা এতক্ষণ এসে প্রায় চুপচাপই বসেছিল, তারাও বাড়ীর ভিতরে এসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কিন্তু শবু মিতুরা খেলা করতে ভুলে গেছে -অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মা কাকীমা দরজার চৌকাঠে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শঙ্কা ভরা চোখে সবাইকে দেখছে।

এমন সময় ভর দুপুরে. মৈত্র মহাশয়ের আর্দালী উদ্‌ভ্রান্তের মত টলতে টলতে বাড়ীর ভিতর পৌঁছে 'বুড়ো কর্ত্তা,' বলে চীৎকার করে উঠোনে আছড়ে পড়ল--হাতে তার ধরা মৈত্র মহাশয়ের ছড়িখানি। নির্ঝরিণী দেবী দু-চোখে অন্ধকার দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন—তিন ছেলে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা কাকীমা ডুকরে কেঁদে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিলেন —আর মাদের কাঁদতে দেখে কিন্তু শবু মিতু সমস্বরে কেঁদে ফেলল। পরক্ষণেই সবাই যেন হঠাৎ বজ্রাঘাতে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।··

পরিচর্যা করে মৈত্র গৃহিণীকে কিছুটা সুস্থ করা হল। সবাই মিলে আর্দালীর কাছ থেকে সব শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল—আর্দালী চোখের জলে আগা গোড়া সব ঘটনা বর্ণনা করল। সঙ্গে এ কথাও বলল যে, সে যখন বুড়ো কর্ত্তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন নৌকোটা ঘূর্ণির মুখে পড়েছে দেখে অন্য চারজন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে একপাশে গিয়ে গাছের ডাল

ধরার চেষ্টা করাতেই নৌকো উল্টে গেল, না হলে এ সর্বনাশ হয়ত হত না। কিছুটা দৈব কিছুটা মানুষের অসাবধানতার জন্যই এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

বাড়ীতে উঠল প্রচণ্ড কান্নার রোল। এর মধ্যে সবার মনে পড়ে বিধবা কর্ত্তামার কথা। হেম অবিনাশ ছুটে গেল তাঁর ঘরের দরজায়। দেখে কর্ত্তামা হাত দুটো বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বুজে স্থিরভাবে গৃহদেবতার পটের সামনে বসে আছেন সমাধিস্থের মত। 'কর্ত্তামা' বলে ডাকতে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন—দুচোখের কোল বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। তিনি সবই শুনেছেন—সবই বুঝেছেন। ছোট নাতবৌ ও আশ্রিত কুটুম্ব মহিলারা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কর্ত্তামাকে আগলে রইল। এদিকে বড়বৌ শাশুড়ী ঠাকরুণকে সামলাতে ব্যস্ত, দুজনেই কেঁদে আকুল—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। শহরের বহু কর্ত্রী গৃহিণীরা এসে গেছেন। সকলে মিলে শোক বিহ্বল পরিবারকে সামলাতে ব্যস্ত। কেঁদে চলেছে কিষ্টু শবু। মেয়ে-মহলের কান্না থেকে থেকে উচ্চরবে উঠছে আবার একটু পরে করুণ বিলাপের সুরে নেমে আসছে।

ওদিকে বৈঠকখানা ঘর, বাইরের বারান্দা ও সামনের খোলা জায়গা লোকে লোকারণ্য। যারা আগে একবার করে এসেছিলেন সেই রাখহরিবাবু, হিতেনবাবু,—যারা লোক পাঠিয়ে খবর জানতে চেয়েছিলেন সেই জমিদার বাঁড়ুজ্যে মশাই, ঠাকুরমশাই, এছাড়া মৈত্র মহাশয়ের অন্য বন্ধু বান্ধব, পরিচিত অর্ধ পরিচিত সকলে এসেছেন। গিরিন হেম অবিনাশের বন্ধুমহলের কেউ বাদ নেই—তারাও এসেছে। এসেছেন স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, সিভিল সার্জন সাহেব ও মহিমবাবুর স্থানীয় অফিস কর্মীরা। চারদিকে নানা আলোচনার গুঞ্জন। আসলে সকাল সাড়ে দশটার ট্রেনেই লোকমুখে খবরটা শহরে জানাজানি হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ আর স্বমুখে সেটা এই হতভাগ্য পরিবারকে জানাতে পারেন নি—দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরা—কেউত নিজে চোখে কিছু দেখেন নি, শোনা কথার উপর নির্ভর করে এতবড় দুঃসংবাদ কি করে দেওয়া যায়? কিন্তু খবরটা দাবানলের মত সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু এই হতভাগ্য পরিবারের কারও কানে সে সংবাদ পৌছান হয়নি। আর্দালী শহরে পৌছে প্রথমে অফিসে গিয়ে খবর দেয়। সেখানেও কেউ এ দুঃসংবাদ বহনের দায়িত্ব নিতে রাজী হলনা। শেষে আর্দালীকেই ভগ্নদূতের ভূমিকা নিতে হল।

হিতেনবাবু বললেন—

'দুঃখের কথা, শোকের কথা পরে হবে। এখনই কিছু লোক নিয়ে

ছেলেদের কেউ ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হোক—এখনও মহিমের দেহ পাওয়া যায় নি।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, সিভিল সার্জন সাহেব ও জমিদার বাঁড়ুজ্যে মশাই সে কথা অনুমোদন করলেন। ঠিক হল গিরিন তার দুই বন্ধু আর মৈত্র মহাশয়ের আর্দালী একাজে যাবে। অভুক্ত গিরিন মা কর্তামাকে বলে সঙ্গীদের নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল।

বাড়ীর রান্না খাবার সব নষ্ট করে ফেলা হল। ঠাকুর মশাইয়ের স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ীতে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। একে একে মৈত্র পরিবারের শুভানুধ্যায়ীরা বেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বিদায় নিলেন। কেবল হৈম অবিনাশের দু'চারজন বন্ধু আর হিতেনবাবু ও রাখহরিবাবুর স্ত্রীরা রয়ে গেলেন দেখা শোনা করার জন্য।

কর্তামা একসময় পূজার আসন ছেড়ে উঠে শয্যা নিলেন। মৈত্র গৃহিণীর অবস্থা অবর্ণনীয়, কেবলই কেঁদে চলেছেন। দুই পুত্রবধূ চোখের জল ফেলছেন আর অন্য মহিলাদের সাহায্যে মা কর্তামার পরিচর্যা করছেন। হঠাৎ ঝড়ে বিধ্বস্ত মৈত্র বাড়ীতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

গিরিনবাবু ও সঙ্গীরা সন্ধ্যের মুখে ভুবনেশ্বরে পৌঁছে প্রথমেই থানায় ও স্থানীয় অফিসে খোঁজ করলেন কোন খবরের আশায়। না, এখন পর্যান্ত কোন খবর নেই। রাতটা ওখানেই নিশ্চেষ্ট কাটাতে হল। পরদিন খুব ভোরে একটা নৌকো ভাড়া করে সবাই আবার ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হল। জলে ডুবুরী নামান হল, কিছুই পাওয়া গেল না—এমন কি ডুবে যাওয়া নৌকোটারও কোন হদিশ পাওয়া গেল না। দুরন্ত স্রোতে এই বিশাল জলরাশির মধ্যে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে কে জানে। নৌকো ভেসে চলল ভাটির টানে। আশেপাশের গ্রাম গঞ্জে চলতে লাগল খবর নেওয়া।

পরের রাতটা একটা গ্রামের ধারে কাটিয়ে আবার ভোরের আলো দেখা দিতেই যাত্রা শুরু হল। চলতে চলতে দুপুরের কাছাকাছি খবর পাওয়া গেল মাইল দুই আরও ভাটিতে একটি ভাসমান দেহ পাওয়া গেছে। জায়গাটা চিল্কা থেকে বেশী দূরে নয়। গঙ্গুয়া নদী আর একটা নদীর সঙ্গে মিশে চিল্কাতে পড়েছে· জায়গাটা সেই মোহানার কাছাকাছি। শেষে পাওয়া গেল দেহ—চেনার কোন উপায় ছিল না। শুধু গায়ের গলাবন্ধ কোট ও তার পকেটে মহিমবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী তামার দাঁত খোঁচানোর কাঠি এবং বিশেষভাবে

ফুটো করা একটা তামার পয়সাসহ একটি চাবির গোছা দেখে সনাক্ত করা গেল।

সরকারী নিয়ম কানুন পালনের পর নিকটস্থ শ্মশানে মৈত্র মহাশয়ের দেহাবশেষের সৎকার করা হল—জ্যেষ্ঠপুত্র মিহির মুখাগ্নি করল। পরবর্তী ট্রেন ধরে সকলে ঘরে এল তৃতীয় দিন সকালে।

এবারে আর কোন সংশয় নেই, নেই কণামাত্র কোন আশা। সবশেষ হয়ে গেছে। নির্ঝরিণী দেবী ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, বারবার মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাচ্ছেন। যখন জ্ঞান ফিরছে তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিলাপ করছেন—

'ক'জন মানুষ স্বার্থপরের মত নিজেরা বাঁচতে গিয়ে নৌকোটা উল্টে দিল গো!...বুড়ো মানুষটাকে ছইয়ের তলা থেকে বের হবারও সুযোগ দিল না গো! ওরা নাকি মাঝি কাণ্ডারী—তবে যাত্রীর কথা না ভেবে আগে নিজেরা বাঁচার জন্য নৌকো থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? · মানুষটা যে ভাল সাঁতার জানত গো! আহা গো, হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে কত কষ্ট পেয়ে তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গেল গো। হা ভগবান!...বলেছিল এবার ফিরে এসে লম্বা ছুটি নেবে—একেবারেই ছুটি হয়ে গেল। ...'

বিলাপের কথাগুলির সত্যতা ও গভীর বেদনা উপস্থিত সকলের মর্ম স্পর্শ করে। কাঁদছে পুত্রবধূরা, কাঁদছে নাতনীরা, কাঁদছে আশ্রিত স্বজন, দাসদাসী, প্রতিবেশিনীরা। ছেলেদের চোখও অশ্রু সজল। আর কর্তামা! এই বৃদ্ধ বয়েসে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন তিনি। কথায় বলে—অল্প শোকে কাতর. অধিক শোকে পাথর। কর্তামার এখন সেই অবস্থা। থেকে থেকে শুধু শোকবিহ্বল কণ্ঠে বলছেন—

'হরি করুণাময়, আমার ছেলে তোমার চরণে কি অপরাধ করেছিল?'

রবীন্দ্রনাথের 'মৈত্র মহাশয়' নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পেরে নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছায় শান্ত-হয়ে-আসা জলরাশিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, আর মহিম মৈত্র মহাশয় আপন দায়িত্ব. সরকারী কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কয়েকজন স্বার্থপরের অবিমৃষ্যকারীতার বলি হলেন অকালে।

যথাসময়ে মৈত্র মহাশয়ের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমাধা হল। একে একে আত্মীয় স্বজন যারা দূর দূর থেকে এসেছিলেন সকলে বিদায় নিলেন। বাড়ীটা হয়ে উঠল যেন শূন্যপুরী। বড় একটা সংসার শুধু একজন লোকের অভাবে

কি ভাবে খরস্রোতে ভেসে চলা হালভাঙ্গা নৌকোর চেহারা নিতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ হল আজকের এই হতভাগ্য পরিবারটি। আক্ষরিক অর্থেই মৈত্রমহাশয়ের নৌকাডুবি গোটা সংসারকে অথৈ জলে ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে।

কিন্থু শবু কিছুটা বুঝতে শিখেছে—ওরা বোঝে ওদের স্নেহময় দাদু আর কখনও ফিরে আসবে না। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না কি থেকে কি হল। সমুদ্রে জেলেরা নৌকো নিয়ে যায়—তাদের নৌকো বারবার উল্টোয় ডোবে কিন্তু তারা কেউ ডুবে যায় না। তবে এবারে মামাবাড়ী যেতে আসতে অত জলের মধ্যে নৌকোয় বসে বসে ওদের রীতিমত ভয় করত। মাত্র পাঁচ ছ'বছরের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নিয়ে শবুর কেবলই চোখের সামনে ভাসে দাদুর স্নেহমাখা মুখখানি, তাতে একজোড়া পুরুষ্ট কাঁচা পাকা গোঁফ দুধের বাটিতে চুমুক দিলে তার সবটাই সাদা হয়ে যেত, বাইরের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে বসে পা দুটো অল্প অল্প দোলাতেন, আর কিন্থু ও শবুকে গামছা পরিয়ে দেওয়া। এখন ওদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুলেও যায় না কত-দিন। মিতুটা অবুঝ তাই মাঝে মাঝে জানতে চায় তার আধোআধো ভাষায়—

'দাদু কই, দাদু কই ?'

মা, কাকীমা সংসারের কাজ করে চলেন যান্ত্রিক নিয়মে—যেন প্রাণহীন পুতুল সব। ঠাকুমা যেন সাক্ষাৎ শোকের প্রতিমূর্ত্তি। চওড়া চওড়া পাড়-ওয়ালা শাড়ীর বদলে তাঁর অঙ্গে উঠেছে এখন সাদা থান, অঙ্গে নাই কোন অলংকার আভরণ। মাথার অত সুন্দর চুলগুলো সব ছোট করে ছাঁটা। তাসের আড্ডায় যাওয়া সে কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন পুত্রবধূরা খাওয়ালে খান, বসালে বসেন, শোয়ালে শুয়ে থাকেন। সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীরা এসে নানান কথায় তাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেন।

কর্ত্তামা বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম মিটে যাবার পর সেই যে শয্যা নিয়েছেন আর বড় একটা ওঠেন না। মন্দিরের প্রসাদে দিনান্তে একবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আবার শয্যা গ্রহণ করেন।

বর্ষাকাল, রোজই শ্রাবণের ধারায় ধরণীর বুক সিক্ত হয়। যে মানুষ নিজের মেধা, কর্মে ও পরিশ্রমে তিলতিল করে এতবড় একটা সংসার গড়ে তুলেছিলেন সকলের আপন সেই মহিম কান্তি মৈত্র মহাশয় চলে যাওয়াতে পরিবারের সকলে ভাসে শোকের সাগরে, নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার—একটা যুগ যেন শেষ হয়ে গেল।

এগারো

সত্যিই সেটা ছিল একটা যুগ সন্ধিক্ষণ। অনেকদিন পরে আজই প্রথম কিঙ্কু ও শবু স্কুলে এসেছে। হঠাৎই সেদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেল অসময়ে। কলকাতা থেকে খবর এসেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহ রেখেছেন। একটা শোক-বিহ্বল অশ্রু-সজল ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। কিঙ্কু শবুরা শুনলো তাদের কাছ-থেকে দেখা দাড়ি-ওয়ালা সেই বিশাল মানুষটি, পড়ার বইয়ের কবিতা—বড় হয়ে হব আমি খেয়া ঘাটের মাঝি-র কবি রবিঠাকুর শেষবারের মত খেয়া পাড়ি দিয়েছেন। বাড়ীতে কাঁচের আলমারিতে রাখা শুকিয়ে যাওয়া রবীন্দ্র-স্পর্শধন্য মালাটিকে কিঙ্কু ও শবু ঘরে ফিরে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

শুধু যুগ সন্ধিক্ষণ নয়—যুদ্ধ সন্ধিক্ষণও বটে। ওদিকে জার্মানীর হিটলার আর ইতালীর মুসোলিনি তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে তুলেছে সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়া আর ফ্রান্স-ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে। এদিকে হিটলার মুসোলিনির দোসর জাপানের তোজো লড়ে চলেছে চীনসহ সারা পূর্ব এশিয়ায়। কোথায় যুদ্ধ কেন যুদ্ধ তা দেখা যায় না, বোঝা যায় না। যখন দেখা যায় বাজারে সব জিনিষ দিন-দিন অগ্নিমূল্য হয়ে উঠছে তখন বোঝা যায় যুদ্ধ লেগেছে কোথাও। ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্রের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ হাঁকছে। এ বাজারে একমাত্র ব্যবসায়ী আর ঠিকেদারেরা ছাড়া বাকি সব বাঁধা-আয় আর স্বল্প-আয়ের লোকেরা সংসার চালাতে একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

সেই যুদ্ধের আগুনের আঁচ আর সব সংসারের মত হতভাগ্য এই মৈত্র পরিবারেও লাগে। একটু বেশী করেই লেগেছে। একটি মাত্র মানুষ মৈত্র-মহাশয়ের আয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল এই পরিবারের আয়ের উৎস একেবারেই শুকিয়ে গেছে। একমাত্র গিরিনবাবুর হোমিওপ্যাথির সামান্য কটি পয়সার উপর ভরসা করে এত বড় সংসার চলেনা। গিরিনবাবু গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর কাজের ও আয়ের পরিধি বাড়াতে লেগেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

হৈম আর অবিনাশও আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারলেন না। ডাক্তার হৈমবাবু স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি নিয়ে দেবগিরি চলে গেলেন—একা মানুষ। কিন্তু শবুরা বড় কাকা চলে যাওয়াতে খুব কাঁদল—জ্ঞান হয়ে থেকে কাউকে ত কোনদিন দূরে চলে যেতে দেখেনি। অবিনাশ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে টুকটাক ঠিকেদারীর কাজ জোটাতে লাগলেন—কিন্তু বিশেষ সুবিধে হয় না। এ সব জিনিষের ঘোরপ্যাঁচ জানতে হয়—বাবা বেঁচে থাকলে…।

বৈঠকখানা ঘরের সে গান বাজনার আসর আর আড্ডা সবার অজান্তেই উঠে গেল। আশ্রিতেরা যে যার সুযোগ সুবিধে মত অন্যত্র চলে যেতে লাগল। বাড়ীর কাজের লোকজন কমে রইল শুধু রান্নার ঠাকুর, বাইরের

কাজে রামু আর অন্দর মহলে ঝি অন্নদা পিসি। ঠাকুরের মাইনে মাসে তিন টাকা, অন্নদা পিসি নেয়—দু'টাকা। রামুকে কিঙ্কু শবুরা ডাকে রামুদা বলে। সে এখন কোন মাইনে নেয়না। সে ছিল মৈত্র মহাশয়ের প্রায় সমবয়সী—বহুদিনের পুরোনো ও বিশ্বস্ত। সংসারের অবস্থা বুঝতে পারে, কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠতায় এই বিপদের সময় সবাইকে ফেলে অন্যত্র যেতে সে পারেনি। তিন ভাই বড়বাবু মেজবাবু ও ছোটবাবুকে এককালে প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় থেকে সে হাতে ধরে স্কুলে নিয়ে গেছে, এসেছে। নাতনীদের এক এক করে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। বাঁধা পড়েছে মায়ার বন্ধনে। কোন মাইনে সে নেবেনা—শুধু দুবেলা দুমুঠো খাবে আর ঢেঁকিঘরের এক কোণে পড়ে থাকবে। তার পরিবারের লোকজন দেশে গাঁয়ে যেমন আছে যা হোক করে চালিয়ে নেবে—সে শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবে।

বাবা কাকারা রামুদাকে রামুকাকা বলে ডাকে। গিরিনবাবু শুনে বলেছিলেন—

'রামুকাকা, থাকবে অথচ কিছু নেবেনা, সে কি হয়?'

'আমাকে যেতে বোলোনা বড়বাবু। আমি না থাকলে তোমাদের দেখা শোনা কে করবে, হাটবাজার কে করে দেবে, গরুবাছুরগুলোকে কে দেখবে—গরুবাছুর না থাকলে আমার দিদিমণিরা ভাল দুধ খেতে পাবে না। আমাকে যেতে বলো না'—বলে রামুকাকা সকলের সামনে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করল।

শেষে নিঝরিণী দেবীই বললেন—'আহা, থাক। ওর আমলের লোক, ওর মনে ব্যথা দিও না।'

রামু রয়ে গেল। গিরিন বাবুও সত্যি সত্যি তাকে প্রাণে ধরে 'যাও' বলতে পারছিলেন না—এমনি বিচিত্র মায়ার টান। রামুদা একা হাতে হাট বাজার করে, গরু বাছুর দেখাশোনা করে, বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে আর অবসর সময় কিঙ্কু শবু মিতুদের কাছে দাদুর গল্প বলে। শুনতে শুনতে ওদের চোখ জলে ভরে আসে।

পরের বছর থেকে কিঙ্কু আর শবুর স্কুল আলাদা হয়ে গেল। কিঙ্কু চতুর্থ শ্রেণী থেকে পাশ করে মেয়েদের স্কুলে ক্লাশ ফাইভে ভর্ত্তি হল। সেখানে আর কেউ তাকে কিঙ্কু বলে ডাকে না—সে এখন হয়েছে 'কুমারী কিঙ্কিণী মৈত্র'। কি মজা! আর দু বছর পরে শবুকেও সবাই ডাকবে 'শ্রাবণী' বলে।

শবুকে বড়মার স্কুলে একা যেতে হচ্ছে। পাড়ারই স্বামী পরিত্যক্তা বিষ্ণুপ্রিয়াদি ওদের স্কুলে নতুন দিদিমণি হয়েছে—বড়মার স্কুল আর আশ্রমের দরজা এমন সব হতভাগিনীদের জন্ম সদা-উন্মুক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়াদি বেশী লেখাপড়া শেখেন নি, তাঁর উপর পড়েছে শিশুশ্রেণী দেখাশোনা করার ভার। স্কুলের গাড়ীতে করে তিনিও রোজ একসঙ্গে যান। ছোট কাকীমার একটি মেয়ে হয়েছে—খুব রোগা পাতলা—রংটাও পরিষ্কার নয়। অভাবের সংসারে এই প্রথম এক নতুন জীবনের আবির্ভাব কাকা-কাকীমার প্রথম সন্তান।

মাস দেড়েক যেতে শীতের শেষে বসন্ত সমাগমে জীর্ণ পাতার মত ঝরে পড়লেন ওদের সকলের প্রিয় কর্তামা। মহিমের মৃত্যুর পর মাস ছয়েক যেতে না যেতে পুত্র শোকাতুর নিস্তারিণী দেবী দেবধামে দেহ রাখলেন। জন্মেছিলেন বাংলার কোন এক সুদূর গ্রামে, বিয়ে হয়ে এসেছিলেন আর এক গ্রাম শিবপুরে, অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কত কষ্টে একমাত্র ছেলে মহিমকে মানুষ করেছিলেন, শেষ ক'বছর মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেলেন পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতবৌ ও কোল-নাতনীদের সঙ্গে। জীবনে আর কোন চাহিদা তাঁর ছিলনা। শ্রীহরির পাদপদ্মে ঠাঁই নিতে প্রস্তুতই ছিলেন।

কিন্তু একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগে পরপারের যাত্রী স্বভাব-সরলা এক মায়ের প্রাণও বারেবারে কেঁপে কেঁপে ওঠে। পায়ের কাছে বসা বিধবা পুত্রবধূর মুখের পানে তিনি আর যেন তাকাতে পারেন না। বিছানার পাশে গিরিন হেম অবিনাশ তিন নাতি, পদ্মিনী ও দীপ্তি দুই নাতবৌ, আর আশেপাশে চার কোল-নাতনীকে দেখতে দেখতে, স্মমুখে হরিনাম করতে করতে সজ্ঞানে নিস্তারিণী দেবী চোখ বুজলেন। চোখের কোলে জমা রইল দু ফোঁটা জল, পুত্র মহিমের উদ্দেশে।

পুত্রবধূ, নাতবৌরা কেঁদে আকুল হল। দেখাদেখি কোল-নাতনীরা কান্না জুড়ে দিল। নাতিরাও তাদের গরীয়সী কর্তামার জন্ম চোখের জল ফেলতে লাগল ছেলেমানুষের মত। এমন কি দরজার বাইরে দাঁড়ানো রামুদা, অন্নদা পিসির চোখেও নেমে এল জলের ধারা। কুকুর পিটার দাদু মারা যাবার পর থেকে বেশ কিছুদিন মনমরা হয়েছিল, এই সময় সেও যেন একবার ডাক ছেড়ে ককিয়ে উঠল। এত অল্প দিনের ব্যবধানে যে আবার একটি শোকের ছায়া নেমে আসবে মৈত্র পরিবারে—ভাবা যায়নি। খবর পেয়ে ঠাকুর মশাই আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন, বললেন—'বাসাংসি জীর্ণানি।' তাঁর নির্দেশ-

মত একে একে সব কাজ সম্পন্ন হল।

কতদিন পরে মিতু বলল—'থাম্মা, কর্তামা কোথা গেল?'

পাশ থেকে রামুদা বলল—'কর্তামা দাদুর কাছে গেছে।'

ঠাকুমার বুকে আবার শোকের সাগর উথলে উঠল, চোখে নেমে এল অশ্রু-বন্যা।

শবুর কানে বাজতে লাগল কর্তামার নিজের গলায় গাওয়া গান—হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।

এ গান তিনি আগে প্রায়ই গাইতেন। দাদু মারা যাবার পর তাঁকে আর গাইতে শোনা যায় নি। কর্তামার গানের গলা ছিল ভারি মিষ্টি।

কর্তামা কথায় কথায় কত ছড়া বলতেন। মা ঠাকুমাদের কাজে কর্মে দেরী দেখলে বলতেন—

'ধা ধুব্বৎ ধা ধুব্বৎ তিন মায়ে ঝিয়েতে
জামাইকে রেঁধে দিল তেঁতুল ভাতে ভাতে,
তে পহর বেলাতে।'

কেউ কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে বলতেন—

'উঠল বাই—কাশী যাই।'

নাতবৌদের পরিবেশনে ত্রুটি দেখলে বলতেন—

'কেউ খোলে সপসপে, কেউ পাকায় মুঠ্যা,
কেউ খেতে না পেয়ে যায় উঠ্যা।'

কাউকে হাই তুলতে দেখলে তাতেও ছড়া কাটতেন—

'হাই এর আছে ভাই—হাঁচির কেউ নাই।'

কোন দুটি জিনিষের তুলনা ঠিক না হলে ছড়ায় বলতেন—

'কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।'

আর একটি ছড়া প্রায়ই তাঁর মুখে শোনা যেত—

'পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবে নারীর কলঙ্ক নাই।'

সব কথার অর্থ শবুর বোধগম্য নয়। কিন্তু অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির অধিকারী শবুর মনে সব গেঁথে গেছে—যখনই সে সব কথা মনে পড়ে শবুর মন খারাপ লাগে কর্তামার কথা ভেবে।

দুই

চারদিকে যেন আকাল পড়েছে। জিনিষ পত্রের দাম বেড়েই চলেছে। সংসার চালাতে তিন ভাই একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। হৈমবাবু দেবগিরি থেকে নিজের খরচ কুলিয়ে সামান্য কটা টাকা পাঠাতে পারেন। অবিনাশবাবু ঠিকেদারীতে এখনও বিশেষ সুবিধে করতে পারছেন না, লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগই বেশী। জমিজমা থেকে বৎসরান্তে যা ফসল পাওয়া যায় তাতে ধান চালের প্রয়োজন তিন চারমাসের মত মেটে। কয়েকটা কোম্পানীর শেয়ার থেকে বছরে কিছু ডিভিডেণ্ড আসে। গিরিনবাবু প্রায় একক চেষ্টায় এই যুদ্ধের বাজারে সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশুনা করছে।

দিদি কিন্তুর হয়েছে ভারি মজা, মেয়েদের স্কুলটা ওদের বাড়ীর প্রাচীরের সঙ্গে লাগা। স্কুলের ঘণ্টা পড়লেই এক দৌড়ে ক্লাশে পৌঁছনো যায়, খিড়কী দরজা দিয়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি হয়। গাড়ী ঘোড়ার ঝামেলা নেই। শবু এখনও গাড়ীতে করে বড়মার স্কুলে যাচ্ছে। ছোটকাকার রোগা পাতলা মেয়েটার মুখে ভাতের পর নাম রাখা হয়েছে—শ্রীলা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তখন চরম অবস্থা। বাবা ও ছোটকাকা খেতে বসে রোজ যুদ্ধের কথা আলোচনা করেন। ঠাকুমা, মা, কাকীমা গালে হাত দিয়ে বসে শোনেন। কিন্তু শবুরাও বাদ যায় না। কাগজে নাকি লিখেছে, রোজ ইংরেজরা হাজার হাজার শত্রু সৈন্য মেরে ফেলছে। এরোপ্লেনে আকাশে উঠে নাকি সব যুদ্ধ করছে। সমুদ্রের ওপার থেকে কামান ছুঁড়ছে ত এ-পারে এসে পড়ছে। শুনে ওদের ভীষণ ভয় করে। ওরা ও ত সমুদ্রের পাড়ে থাকে, যদি ওদের উপরে এসে পড়ে? আবার বোমাও নাকি ফেলছে।

ওদের আশঙ্কা প্রায় সত্যি হল। বোমা এসে পড়ল, তবে এই ছোট্ট শহরে নয়—এখান থেকে প্রায় তিনশ মাইল দূরে কলকাতায়। অত সুন্দর অত বড় শহর কলকাতা, মাত্র বছর খানেক আগেও শবুরা যার উপর দিয়ে মামাবাড়ী যাওয়া আসা করেছে, তার না জানি কি অবস্থাই হয়েছে। বাবা কাকা খেতে বসে বলাবলি করেন—হাজারে হাজারে লোক প্রাণ ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, ট্রেনে মোটরে, ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ী যাতে

পারছে তাতে করে পালাচ্ছে। পায়ে হেঁটে বা নৌকোতেও পালাচ্ছে। এই শহরেই বেশ কিছু লোক কলকাতা থেকে এসে গেছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু শবুরা দেখেছে, তাদের খেলার জায়গা বালির ঢিবির ওধারে যে বাড়ী বহুদিন খালি পড়ে ছিল, সেখানে কিছুদিন হল কারা যেন এসেছে। তাদের একটা মেয়ে আছে—নাম হীরা—ঠিক শবুর বয়েসী। বয়সের গুণে আলাপ পরিচয় হতে দেরী হয় নি, দুদিনেই খুব ভাব সাব হয়ে গেছে। দুজনে আবার একই ক্লাশের পড়ুয়া তাই বন্ধুত্বটাও পাকা হয়ে গেছে। হীরা নাকি এখনই কোন স্কুলে ভর্ত্তি হবে না, তার বাবা আগে এখানে কোন রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারলে তারপর দেখে শুনে যে স্কুলে হয় ভর্ত্তি হবে। হীরার এক দাদা এক দিদি আর ছোট দুটো ভাই আছে—তারা বড় একটা খেলতে আসে না। হীরার মুখেই ওরা একটা কলকাতার ছড়া শুনেছে—

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানী
বোমার মধ্যে কেউটে সাপ
বৃটিশ বলে বাপরে বাপ।

কলকাতায় বোমা ফেলেছিল নাকি জাপানীরা। আর এদেশের লোক নাকি ইংরেজদের উপর চটে গেছে, অনেকে তাদের তাড়াতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কলকাতার মেয়ে হীরা—তার অনেক জ্ঞান—বালির ঢিবির খেলুড়েরা ওর সব কথা হাঁ করে শোনে।

বাড়ীতে শোনা যাচ্ছে, ছোটকাকা নাকি যুদ্ধের চাকরি করতে যেতে চায়। ঠিকাদারীতে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। যুদ্ধ মানে ত ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করা—কে কখন কাটা পড়ে ঠিক নেই। সঙ্গীত সম্মিলনী ক্লাবের থিয়েটারের আসরের স্মৃতি শবুদের। প্রতি বছর দুর্গা পূজায় নাটক হয়—মেবার গৌরব, চন্দ্রগুপ্ত, মহিষাসুর-মর্দিনী আরো সব কত কি। হীরা কলকাতা থেকে এসেছে তার জ্ঞান অনেক। সে ওদেরকে বোঝাল—

'আজকাল আর কেউ ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে না। সঙ্গীন বন্দুক, কামান বোমা দিয়ে যুদ্ধ হয়।'

বাড়ীতেও সেই কথা আলোচনা হচ্ছে। ঠাকুমা বললেন—'যুদ্ধ মানেই ত প্রাণ হাতে নিয়ে লড়াই করা।'

ছোট কাকা অবিনাশবাবু বোঝাবার চেষ্টায় বললেন—'সবাই ত আর যুদ্ধ করে না। সেখানে অন্য কাজও আছে। আমি যাব ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে—যুদ্ধের জন্য কত রাস্তাঘাট, ব্রীজ, ঘরবাড়ী, এরোড্রাম তৈরী করতে হয়। আমি শুধু সেই সব কাজ করব। মাসে পাঁচশ টাকা মাইনে—খাওয়া পরা থাকা সব ফ্রী। তবে যুদ্ধের ঝুঁকি ত সব সময়ই আছে—সে ত কলকাতার মত এখানেও বোমা পড়তে পারে।'

শুনে কাকীমা কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। কাতরে স্বামীকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য। শাশুড়ীকে বললেন—'মা, আপনি আপনার ছেলেকে কিছুতেই যেতে দেবেন না এই বিপদের মধ্যে। পাঁচশ টাকা দিয়ে কি হবে, যদি প্রাণটা যায়?'

ঠাকুমা বললেন—'তুমি পাগল হলে, বৌমা? আমি কি ওকে যেতে দিচ্ছি না কি? যত কষ্টই হোক যুদ্ধে যাওয়া নয়।'

এমনই সময় বাড়ীতে একটা কাণ্ড ঘটল। রান্না করার পুরোনো ঠাকুর কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। অন্য এক ঠাকুর মাসখানেক হল বহাল হয়েছে। লোকটা কাজে কর্মে খুব চটপটে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব কাজ একেবারে ঘড়ি ধরে। স্বাস্থ্যও খুব মজবুত। কথা বলে খুব কম।

আগের ঠাকুরটা ছিল কথার জাহাজ—কাজের চাইতে কথা বলত বেশী। খেতে বসে একদিন, বড় কাকা বলেছিলেন—'ঠাকুর, জল দাও ত। পানি দিয়।'

ঠাকুর জল দেবে কি, আগে তার কথা শোনো। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'কি পানি?'

শুনে বড়কাকা রাগের মাথায় জবাব দিল—'মুত পানি।'

দু একটা নিরামিষ তরকারি আলাদা করে মা কাকীমা রান্না করেন হবিষ্য ঘরে ঠাকুমার জন্য। খাবার সময় সে তরকারিও আসে সকলের পাতে। বড়কাকা চিরকালই ভালটা মন্দটা খেতে ভালবাসেন। আর একদিন বড়-কাকা খেতে খেতে বলেছিলেন—

'আজ লাউ ঘণ্টটা খুব ভাল হয়েছে। ঠাকুর আর একটু লাউ ঘণ্ট দাও ত।'

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলল—'মু পরা আঁইশরে অছি।' সে এখন আমিষ রান্নার দিকে আছে।

কাকা রেগে বললেন—'আন তবে, মাছ আন।'

'আজি পয়া মাছ নাহি'—ঠাকুর চটপট জবাব দিল।

'তবে ত তুমি খুব আমিষ ঘরে আছ'—বড়কাকা ক্ষোভে জলে উঠলেন। 'তেবে তমে কণ রাঁধিছ ?'

'সিদ্ধ চাউলর ভাত আউ পিঁয়াজ দেই কিরি মণ্ডর ডালি'—ঠাকুরের নির্বিকার জবাব।

বড়কাকা রেগে বললেন—'আন তবে তোমার মণ্ডরের ডাল।'

ছোট কাকীমা ততক্ষণে একটা বাটিতে করে বেশ কিছুটা লাউঘণ্ট এনে বড় কাকার পাতের সামনে নামিয়ে রাখলেন। বড় কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'করেছ কি বৌমা, আর সকলের জন্য আছে ত ?'

মা হেসে বললেন—'আপনি ব্যস্ত হবেন না ঠাকুরপো। আপনি খান।'

এসব ব্যাপারে বড়কাকা বলার অপেক্ষা রাখেন না। মা কাকীমারা সবাইকে খাওয়াতে খুব ভালবাসেন, বিশেষ করে বড়কাকার মত খাইয়ে লোককে।

এখন এই নতুন ঠাকুরের কাজে কর্মে সবাই খুব খুশী। বড়কাকা এখন দেবগিরিতে, ছুটিছাটায় আসেন। বাড়ীতে সবাই আলোচনা করছে, এই নতুন ঠাকুরটা যদি টিকে যায় ত বেশ ভাল হয়।

এমনি সময় একদিন সকালবেলা পুলিশ মিলিটারী এসে বাড়ী ঘিরে ফেলল। সবাই ত ভয়ে অস্থির। তবে কি অবিনাশ সবার অজান্তে মিলিটারীতে নাম লিখিয়ে এসেছে, আর সেই জন্যই মিলিটারী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে তাকে নিয়ে যেতে ? মেয়ে মহলে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ছোটকাকা বোকার মত সবার দিকে তাকাচ্ছেন, বলছেন—

'খোঁজ খবর করতে ওদের আফিসে ত একটা চিঠি-পত্র দিয়েছি, নাম ত লেখাই নি।'

ও মাগো, ঐ চিঠিই তবে সর্বনাশের মূল। যুদ্ধের জন্য লোক পাচ্ছে না, সবাইকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে যুদ্ধ করাচ্ছে। চিঠি যখন লিখেছে তখন আর চাই কি ?

গিরিনবাবু বললেন—'তোমরা সব থাম তো, আমি বাইরে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার।'

বাইরে যেতে হাতে লাল রিবন বাঁধা লাল মুখো এক মিলিটারী গিরিনবাবুকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল—

'মাস খানেক হল আপনাদের বাড়ীতে নতুন লোক কেউ এসেছে ? এখানে থাকে ?'

গিরিনবাবু কোন আত্মীয় স্বজনের কথা মনে করতে পারছেন না যারা এর মধ্যে এখানে এসেছে। মিলিটারী বলল—

'না না, আত্মীয় নয়—সারভেণ্ট, কুক্—ঠাকুর চাকর এমন কেউ?'

গিরিনবাবু বললেন—'হ্যাঁ, সে রকম একজন আছে—সে ত ঠাকুর—রান্না করে।'

'কি নাম তার?'—প্রশ্ন।

উত্তর—'বাঞ্ছারাম।'

মিলিটারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে—'বলরাম এখানে এসে বাঞ্ছারাম সেজেছে।' পরে বলল—

'তাকে বাইরে আসতে বলুন ত।'

সারাবাড়ী খুঁজে বাঞ্ছারামকে আর পাওয়া যায় না, শেষে পুলিশ আর মিলিটারীরা মিলে খুঁজে গরুর জন্য রাখা খড়ের গাদার তলা থেকে তাকে টেনে বার করল। ঠাকুর বাঞ্ছারাম হাউ হাউ করে কেঁদে গিরিনবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল—

'বড়বাবু, মতে বাঁচান্তু। সেমানে মতে কোট মাশাল করিবে, মারি পকাইবে।'

গিরিনবাবু নিরুপায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর এবার ঠাকুমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল—

'মা, আপন মতে বাঁচান্তু। মো ঘররে বুড়া বাপ মা আউ গুড়িয়ে ভাই ভউনী ন খাইকিরি মরি যিব মতে মারি পকাইলে। সে মানঙ্ক পাঁই মু মিলিটরীরে যাইথিলি। মু আপনঙ্কর গোড়রে পড়ুছি, মতে দয়া করি বাঁচাইবে।' বলে ভীষণই কাঁদতে লাগল।

কারো কিছু করার নেই, শুধু এই করুণ দৃশ্য দেখে যাওয়া ছাড়া। বাড়ী সুদ্ধ লোক অসহায় ভাবে তার কাতর প্রার্থনা শুনেই গেল, মুখে একটা সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করতে পারল না—এযে মিলিটারীর ব্যাপার, তাদের নিয়ম কানুন কেউ জানে না।

লাল মুখো মিলিটারী গিরিনবাবুকে বলল—'আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন থানায় একটা এজাহার দিয়ে আসবেন।'

ঘণ্টা দুই বাদে গিরিনবাবু ফিরে আসতে নিস্তারিণী দেবী শুধোলেন—

'হ্যাঁরে গিরিন, ওকি চুরি ডাকাতি করেছে? ওকে কি মেরে ফেলবে? কোটমশাল কি?'

গিরিন বলল—'ও লোকটা অভাবে পড়ে মিলিটারীতে গিয়েছিল। ছুটিতে বাড়ী এসে আর যায়নি, যেতে চায় না। বাড়ীতে থাকলে মিলিটারী এসে ধরে নিয়ে যাবে সেই ভয়ে এখানে ঠাকুরের কাজ নিয়ে লুকিয়ে ছিল। কোন চুরি ডাকাতি করেনি। পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করেছে। আমরা ত এসব কিছু জানতাম না।'

ঠাকুমা বললেন—'এ ত বড় জুলুম, যেতে না চাইলেও ধরে নিয়ে যাবে? মিলিটারী হোক আর যাই হোক চাকরিই ত, ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না?'

এতক্ষণে ছোটকাকার মুখে কথা ফুটল, বললেন—'মিলিটারীর আইন কানুন বড় কড়া। একবার ঢুকলে আর সহজে ছাড়া যায় না।'

কিন্তু ঠাকুমার প্রশ্নের খেই ধরিয়ে দিল—'আর কোটমশাল?'

ছোটকাকা জবাব দিলেন—'মিলিটারীতে কেউ দোষ করলে যে বিচার হয় তাকে বলে কোর্ট মার্শাল, কোটমশাল নয়। সে রকম অপরাধ করলে মেরেও ফেলে।'

শুনে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঐ হতভাগ্য বাঙ্গারামের জন্য। ঠাকুমা বললেন—

'বেচারী! ওকে নিশ্চয়ই গুলি করবেনা। ওর বাপ মা ভাই বোনদের কি দশা হবে?'

এ ব্যাপারের পর থেকে অবিনাশবাবুর মিলিটারীতে চাকরি নেওয়ার কথাটা একেবারে চাপা পড়ে গেল।

ঘটনাটা এই ছোট্ট শহরটার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে বেশ আলোড়ন তুলল। পথে ঘাটে দোকানে বাজারে নানাভাবে আলোচিত হতে লাগল। সে আলোচনার ঢেউ এসে লাগে শিশুদের খেলা ঘরেও। বাড়ীর পাশের বালির ঢিবির উপর রোজ বিকেলে শিশুদের যে খেলার আসর বসে সেখানেও আজ ঐ আলোচনাই মুখ্য। এখানে প্রধান বক্তা কিস্কু আর শবু—বাকি সবাই চোখ বড় বড় করে শুনছে। বাবা কাকার কাছ থেকে কিস্কু আর শবু নিজেদের জ্ঞানের পরিধি কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে।

কিস্কু বলল—'কোর্ট মার্শাল কাকে বলে জানিস? মিলিটারীতে কেউ দোষ করলে যে বিচার হয় তাকেই বলে কোর্টমার্শাল। বেশী দোষ করলে একেবারে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারে। যে সেরকম দোষ করেছে তার দু

চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। দূর থেকে পাঁচ সাতজন মিলিটারী একসঙ্গে তাকে গুলি করে আর লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়।'

একটা নিষ্ঠুর দৃশ্যের কল্পনায় শিশুমনগুলি শিউরে ওঠে—নাঃ, এ যুদ্ধ ভাল না—মিলিটারীরা ভাল না!

শবু বলল—'জানিস, ওদের মধ্যে লালমুখো যে দুজনের হাতে লাল রিবন লাগান ছিল, বিরাট বিরাট যাদের চেহারা, তাদের বলে মিলিটারী পুলিশ। ওরা কেউ যুদ্ধ করতে না চাইলেও জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার যুদ্ধ করায়। সব যেন এক একটা দৈত্য!'

ওদের জ্ঞানের পরিধি দেখে সমবেত শিশুদের তাক লেগে যায়। হীরা, যে অনেক কিছু জানে, সেও হাঁ করে শুনছে—কিছু বলতে পারছে না। সবাই ঠিক করল কানামাছি খেলার সময় কাউকে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা হবে না, যদি মিলিটারীরা দেখতে পেয়ে গুলি করে। একটা কথা সবাই বুঝে গেছে, মিলিটারীরা ভাল না, ওদের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

তিন

কিন্তু দূরে থাকতে চাইলেই কি দূরে থাকা যায়? দলে দলে মিলিটারী এসে শহরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করছে—শুধু বড়রা কেন, শিশুরাও অনেকে দেখেছে। এখানে ত যুদ্ধ নেই তবে ওরা এখানে এসেছে কেন—সব শিশু মনের একই প্রশ্ন। লোকে বলছে মাইল দুই দূরে কোথায় সমুদ্রের ধারে বালির উপর তাঁবু খাটিয়ে এক দঙ্গল মিলিটারী থাকে। সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় তারা দলে দলে শহরে বেড়াতে আসে—ঘুরে বেড়ায়। সময় সময় এক একটা দল ওদের এই বালির ঢিবির পাশের সরু রাস্তায়ও এসে পড়ে। খেলা ঘরের শিশুদের দেখেই লাল মুখো মিলিটারীগুলো হৈহৈ করে ওঠে, কেউ শিষ দেয়, কেউ নানা অঙ্গভঙ্গী করে। যেই দেখে শিশুদের কেউ ভয়ে বাড়ীর দিকে দৌড় দিয়েছে অমনি একটা দুটো লাল মুখো মিলিটারী কয়েক পা তেড়ে আসে, ভয় দেখায়। ভয়ে শিশুর দল যে যার বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে যায়। লালমুখোরা 'হা হা' করে হাসতে হাসতে চলে যায়। আড়াল থেকে

উঁকি মেরে যখন দেখে মিলিটারী সব চলে গেছে তখন শিশুরা একে একে আবার বালির ঢিবিতে জড়ো হয়! ওদের অসভ্যতায় শিশুর দল রাগে ক্ষোভে সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়—

'লাল মুখো বাঁদর—মর মর, মরে যা……'

আবার মাঝে মাঝে অন্যরকম মিলিটারীও ঐ পথ দিয়ে যায়—বিশাল বিশাল চেহারা, রং আলকাতরার মত কালো, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যায়। শিশুদের দেখে দু একজন হাত তুলে অভিনন্দন জানায়—'হ্যাল্লো' বলে হাত নেড়ে হাসতে হাসতে চলে যায়—সাদা দাঁতগুলো ওদের ঝকঝক করতে থাকে মুক্তোর মত। এদের দেখে শিশুরা অত ভয় পায় না। হীরা কলকাতায় থাকতে কালো মিলিটারীও দেখেছে, বলে—

'এরা ইংরেজ না, নিগ্রো। ইংরেজরা জোর করে ধরে এনে যুদ্ধ করাচ্ছে। আমরাও ত কালো, তাই এরা আমাদের ভালবাসে।'

সন্ত বাঙ্গারামের ঘটনাটা ওদের মনে গাঁথা, তাই কালো মিলিটারীদের সঙ্গে শিশুর দল একাত্ম বোধ করে। ধীরে ধীরে ওরা কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে। কালো মিলিটারীরা যেতে যেতে ওদের দিকে হাত তুলে—'হ্যাল্লো' বললে দু চারজন শিশুও কচি কণ্ঠে আওয়াজ তোলে 'হ্যা-ল্লো'। শুনে তারা খুব খুশী হয়, পকেট থেকে লজেন্স চকোলেট বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাত নাড়াতে নাড়াতে চলে যায়। শিশুরা সব মনের আনন্দে লজেন্স চকো-লেট কুড়িয়ে খায়।

এরই মধ্যে ইভিনিং শো সিনেমার আগ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল দিতে দিতে যায়। শিশুর দল ছোটে গাড়ীর পিছনে হ্যাণ্ডবিল ধরতে। ঘোড়া দুটো এত রোগা যে দৌড়তে পারে না, হেঁটেই চলে। শবু গাড়ীর পাশে দৌড়য় আর চিৎকার করে—

'আমাকে একটা দাও, একটা মার জন্য, একটা ঠাকুমার জন্য, একটা কাকীমার জন্য ……।'

হ্যাণ্ডবিলওয়ালা হেসে শবুর হাতে একগোছা হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দেয়। শবু সোজা বাড়ীতে ছুটে এসে বলে—

'মা, মা, তোমার জন্য হ্যাণ্ডবিল এনেছি—ঠাকুমা কাকীমার জন্যও।'

হীরার বাবা ভূপেন বাবু কলকাতায় ওকালতি করতেন। যুদ্ধের ডামা-ডোলে প্র্যাকটিস রোজগার ফেলে সপরিবারে এই ছোট শহরে এসে আশ্রয়

নিয়েছেন। ভাষায় অসুবিধের জন্য এখানে ওকালতি করা সম্ভব নয়। বাড়ীতে পোষ্য কম নয়—এই বাজারে কোন রোজগার না থাকলে চলে কি করে? নিকট প্রতিবেশী গিরিন বাবুর সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন। শাহীর বাজারে গিরিনবাবুর হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ভূপেনবাবু শাহীর বাজারে বেশ একটা বড়সড় ঘর ভাড়া নিয়ে মনিহারী দোকান খুলে বসলেন।

পুঁজি ভেঙে কোন রকমে চলছিল মাস ছয়েক ধরে—তারপর ভিন্ দেশের মিলিটারীরা এসে শহরের প্রান্তে শিবির গাড়ার পর থেকে দেখতে দেখতে ভূপেনবাবুর দোকানে কেনা বেচা চড়চড় করে বেড়ে গেল। বুদ্ধিমান ভূপেন বাবু তাঁর পুঁজি উজাড় করে দোকানটিকে মনোহারী করে সাজালেন। বিদেশী খদ্দেরদের পছন্দমত বিশেষ বিশেষ জিনিষ—যেমন পাথরের তৈরী নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের মডেল, মোষের শিংএর তৈরী নানারকম পশুপাখী, বাঁশের ও বেতের নানা ঘর সাজানোর সরঞ্জাম, চামড়ার জুতো ব্যাগ এইরকম সব জিনিষ বেশী করে রাখতে লাগলেন। বিদেশী মিলিটারী ও পর্য্যটকরা এসে যে কোন দামে সেই সব জিনিষ কিনতে লাগল। ভূপেন বাবুর তখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই, দুহাতে দোকানে বেচা কেনা করছেন, একা না পেরে দু তিনজন সেলসম্যান রেখেছেন।

হীরার এখন মিলিটারীদের খারাপ লাগেনা তা সে কালোই হোক আর লালমুখোই হোক। ওরা এক টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় কেনে, কোন দরাদরি করে না, তাই ওরা খুব ভাল। বালির ঢিবির খেলা-ঘরের বাকি শিশুরা কিন্তু এখনও লালমুখো মিলিটারী দেখলে ভয়ে পালায়—ওরা ভাল না।

এই সব যুদ্ধ মিলিটারীর মধ্যেই শবু চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছে, মিতু ভর্ত্তি হয়েছে শিশু শ্রেণীতে। দুজনে একসঙ্গে বড়মার স্কুলে যায় স্কুলের গাড়ীতে, বিষ্ণুপ্রিয়াদিও রোজ সেই গাড়ীর যাত্রী। কিন্তু মেয়েদের স্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ছে। শীলা এখনও ছোট, মাত্র বছর খানেকের।

বাবা ছোট কাকা আর একজন আশ্রিত বোমার-ভয়ে-ছিটকে-আসা পাঁচু-কাকা রোজ খেতে বসে যুদ্ধের গল্প করেন। হিটলার নাকি সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়াকে তছনছ করে দিচ্ছে। কত যে লোক মারা যাচ্ছে তার সীমা সংখ্যা নেই। জাপানীরা মালয় সিঙ্গাপুর বর্মায় হানা দিয়েছে। যুদ্ধে ইংরেজদের অবস্থা খুব খারাপ। সবাই বলাবলি করছে, শিগগিরই হয়ত তারা এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাবে। গান্ধী মহারাজের শিষ্যরা মাঝখানে তাদের

তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, এখন আর সে রকম কিছু শোনা যাচ্ছে না। বাংলার সুভাষ বোস জাপান বর্মা থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

কদিন ধরে শুরু হয়েছে ঝোড়ো আবহাওয়া। দিনের পর দিন আকাশ মেঘে ঢাকা। থেকে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের বেগে কত কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়েছে এই শহরেই। সেদিন দুপুরের একটু আগে প্রচণ্ড ঝড়ে মৈত্র বাড়ীর গোয়ালঘরের টিনের চালার একটা অংশ উড়ে এসে বাতাসের বেগে সারা উঠোনময় নাচানাচি করতে লাগল। ঝড় বৃষ্টির জন্য দোকান বাজারে লোকজন নেই তাই গিরিনবাবু আগেভাগেই বাড়ী ফিরেছেন। বড়কাকা হৈম কয়েকদিন হল ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসেছেন, শবুরা তাঁর কাছে অবসর সময় দেবগিরির গল্প শোনে। এখন বড়কাকা ছোটকাকা দুজনেই বাড়ীতে নেই, এই ঝড় বাদলের মধ্যে কোথায় গেছে কে জানে। পাঁচুকাকা একা একা বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে আছেন। কদিন হল স্কুলের গাড়ী আসছে না তাই শবু ও মিতুর স্কুলে যাওয়া নেই। কিন্তুও আজ আর স্কুলে যায় নি। ঠাকুমা মা কাকীমারা সংসারের কাজে ব্যস্ত। এমন সময় চালার টিন উড়ে এসে উঠোনে পড়তে সবাই ভয়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। গিরিনবাবু রামু ও পাঁচুকে ডাকাডাকি করে তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন-ঝড়ে দাপাদাপি করা টিনটাকে বাগে আনতে। ঠাকুমা ঘর থেকে চীৎকার করে বললেন—

'ওরে গিরিন, তোরা সব ঘরে আয়, ঝড় থামলে যা হয় করিস।'

গিরিনবাবু টিনের পিছনে ছুটাছুটি করতে করতে বললেন—

'টিনের ঘায়ে যদি গরু মারা পড়ে তবে যে গো-হত্যার পাপ লাগবে। তোমরা সব দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাক, কেউ বাইরে আসবে না। বাচ্চাদের সামলে রাখ।'

শবুরা ত ঝড়ের তাণ্ডব দেখে ভয়ে মরছে, বাইরে যাবে কি? তারা বাবাকে এই বিপদের মধ্যে যেতে দেখে স্থির থাকতে পারছে না, জানালার ফাঁক দিয়ে বাবা কাকাদের কাণ্ড সভয়ে দেখছে আর চিৎকার করে কাঁদছে—

'বাবা, তুমি চলে এস।'

মা ঠাকুমারা ঘরের ভিতর ভয়ে চোখ বুজে দুর্গানাম জপ করছেন। কতক্ষণ পরে উড়ন্ত টিনটাকে বাবারা বাগে এনে মোটা দড়ি দিয়ে সেটাকে বারান্দার থামের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। গরু-বাছুরগুলোকে গোয়াল

ঘর থেকে এনে ঢেঁকি ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ভিজে জবজবে হয়ে তিনজনে ভিতরে এসে জামা কাপড় বদলাতে গেল। সারা বাড়ী জলে ভিজে থৈ থৈ করছে, ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড অবস্থা। পিটার ভয়ে বাবার খাটের নীচে ঢুকে কুঁই কুঁই করে কাঁদছে।

এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ভিজতে ভিজতে দুই কাকাকে বাড়ী ফিরতে দেখে ঠাকুমা বললেন—

'হ্যাঁরে, এই ঝড় তুফানের মধ্যে তোদের কি না বেরুলেই নয়? আমরা সব ভেবে মরি।'

বড়কাকা বললেন—'জান দাদা, আমরা কজন সঙ্গীত সম্মিলনীতে বসে গল্প করছিলাম, হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে কামান দাগার মত শব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, যুদ্ধ কি তবে আমাদের এখানেও এসে গেল? কিছুক্ষণ পরে ব্রজ এসে বলল, তেমে সব এইঠি বসি অছ। আউ সেঠারে যাইকিরি দেখ সমুন্দর উঠি আসিলানি, শহরটা সমুন্দর ভিতর পশি যিব জনা পড়ুছি। বলেই ব্রজ বাড়ীর দিকে ছুটলো।

'আমরা কজন সাহস করে এই ঝড় জলের মধ্যে সমুদ্রের দিকে দৌড়লাম। বাতাসের বেগে যেতে কি পারি—দু পা এগোই ত এক পা পিছিয়ে আসি; কত ঘরের চালা বেড়া উড়ে উড়ে এসে পড়ছে আশেপাশে। অনেক কষ্টে উঁচু বালিয়াড়ির উপর শোভনদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম—সেখান থেকে সমুদ্র বেশ ভাল দেখা যায়। দেখলাম একটু নীচে সব জলে জলময়। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ এসে বালিয়াড়ির নীচ পর্য্যন্ত আছড়ে পড়ছে। সী-বীচের রাস্তা সম্পূর্ণ জলে ডুবে আছে—রানী মঞ্জিল, ভিক্টরদের বাড়ী, ইয়োর হোম, সোনা-স্মৃতি সব এক তলায় এক কোমর জল। এমনকি পঞ্চকোটের রাজবাড়ী যার বারান্দায় উঠতে গেলে বিশ পঁচিশটা সিঁড়ি ভাঙতে হয় তার অর্ধেকই নাকি ডুবে বসে আছে। লোকে বলাবলি করছে, যারা ঐ সময় সমুদ্রের ধারে কাছে ছিল তারা সবাই দেখেছে পূবদক্ষিণ কোণে সমুদ্রের মধ্যে নাকি একটা বিশাল কালো পাহাড় মাথা উঁচু করে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, পর-ক্ষণেই বিরাট এক গর্জন করে সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ে। সে সময় সমুদ্র পাড়ের দিক থেকে অনেকটা সরে গিয়েছিল—যেই পাহাড়টা ভেঙে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বিশাল ঢেউ দুরন্ত বেগে আছড়ে পড়ে সী-বীচের রাস্তা ডিঙিয়ে বালিয়াড়ির নীচ পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দেয়। আমরা থাকতে থাকতেই দেখলাম সমুদ্র আস্তে আস্তে তার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু এক-

বার যে জল রাস্তা ডিঙিয়ে এসে গেছে তার কিছুটা আর ফিরে যেতে পারে নি—তাই সমুদ্রের ধারে যত বাড়ী হোটেল সব এক তলা ডুবে বসে আছে।'

বাবা বললেন—'শব্দ একটা আমারও কানে এসেছিল কিন্তু টিনের দাপাদাপিতে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি তখন।'

মা কাকীমা ঠাকুমা সব শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। গালে হাত দিয়ে সব কথা শুনে ঠাকুমা বললেন—

'কি আশ্চর্য্য! সমুদ্র থেকে পাহাড় উঠে এল, আবার পরমুহূর্তে ভেঙে পড়ল! এ নিশ্চয়ই সেই কালা পাহাড়—ঠাকুর সকলকে বাঁচিয়েছেন। জয় বাবা জগবন্ধু' বলে দুহাত তুলে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। মা কাকীমাও দুহাতে প্রণাম জানালেন—দেখা দেখি কিস্কু শবু মিতুরাও ঠাকুরকে প্রণাম করল।

ছোটকাকা ইঞ্জিনীয়ার মানুষ। ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে এসে—

'ও সব কালা পাহাড় ফাহাড় কিছু নয়। এ হল জলস্তম্ভ। এরকম ঝড় তুফানে সমুদ্রের এক বিরাট এলাকা নিম্নচাপের ফলে হঠাৎই বায়ুশূন্য হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জল ছুটে এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে অনেক দূর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে উঠে যায়—সেটাকেই পাহাড়ের মত দেখায়, জলের পাহাড। কিন্তু জল ত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দূর দূরান্ত থেকে বাতাস ছুটে আসতেই জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ে। তারপর সেই জল হঠাৎ ছুটে এসে পাড় ভাসিয়ে দেয়। এবারের জলস্তম্ভ বোধ হয় অনেকটা উঁচু হয়েছিল, কয়েক বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হয়ত আধমাইলের মত উঁচু হয়েছিল, তাইতেই এই প্রলয় কাণ্ড।'

ঠাকুমা বললেন—'আমি তোদের ওসব জলস্তম্ভ ফস্ত বুঝিনা। একবার কালাপাহাড় এসে নাকি কোনারকের মন্দির ধ্বংস করেছিল। এবারে জগন্নাথের মন্দির ধ্বংশ করতে চেয়েছিল, পারেনি। এ সবই মহাপ্রভুর মহিমা—জয় জগন্নাথ।' বলে আবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

সেই প্রলয় তুফানে সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলে পাড়া। তারা থাকে নীচু জায়গায় সমুদ্রের ধারে কুঁড়ে ঘরে। ঝড়ে ও ঢেউয়ের আঘাতে তাদের ঘর-দোর জিনিষপত্র সব ভেসে গেছে। একেবারে রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে কাছাকাছি স্কুল, মঠ, মন্দিরের উঠোনে বারান্দায়

সব আশ্রয় নিয়েছে। মাছ ধরা জাল সব ভেসে গেছে, সমুদ্রের ধারে বালির উপর শোয়ানো নৌকাগুলো ঢেউয়ের তোড়ে আশপাশের বাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কিম্বা জলের টানে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। ধর্মশালা মঠ ও ক্লাবগুলোর তরফ থেকে জেলে ও অন্যান্য দুস্থদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ইংরেজ সরকার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, প্রসাদের দিকে তাকাবার অবসর নেই। পৌরসভা থেকে ওদের যথাসাধ্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

সে ত সব হচ্ছে, হবে। কিন্তু শহর সুদ্ধ, ঘরে ঘরে লোক খায় কি? ঝড় তুফানে বিপর্য্যস্ত শহরে হাট বাজার বসছে না, চাষীরা ক্ষেতের ফসল আনতে পারছে না, জেলেরা মাছ নিয়ে আসছে না, ট্রেন চলছেনা। দোকানপাট স্কুল পাঠশালা সব বন্ধ, অফিস কাছারীও প্রায় বন্ধ। কদিন ধরে এক নাগাড়ে এই অবস্থা চলছে।

মৈত্র বাড়ীতেও সেই এক প্রশ্ন—সবাই খাবে কি? ঘরে চাল ডাল আছে তা দিয়ে চলছে রোজ দুবেলা খিচুড়ি ভোজন। গরুগুলো যে টুকু দুধ দিচ্ছে তা দিয়ে কোন রকমে বাচ্চাদের ও ঠাকুমার চলে যাচ্ছে। কিন্তু রোজ এক খিচুড়ি কি খাওয়া যায়?

বৈঠকখানা ঘরে উপরের কুলুঙ্গি থেকে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার হল এক মোড়ক সমুদ্রের শুকনো মাছ আর মাছের ডিম। বড়কাকা বললেন—

'খুব ভাল হল। বহুদিন আগে আমার এক বন্ধু আমাকে শুকনো মাছ-গুলো দিতে এসেছিল। আমি বলেছিলাম, আমরা ত ওসব খাইনা—রেখে দাও ঐ কুলুঙ্গিতে ঝি-চাকরদের দিয়ে দেব। এখন এই দুর্দিনে আমাদেরই কাজে লাগবে।' বলে মাছগুলো এনে রান্না ঘরের সামনে নামিয়ে রাখলেন—গন্ধে দূর থেকেই সকলের বমি আসছে।

ঐ মাছই রান্না করে খুব তৃপ্তি করে খেল সবাই—একনাগাড়ে খিচুড়ি খেতে খেতে সবার মুখ পচে গিয়েছিল। কিন্তু শবুরা শুকনো মাছ কোন দিন খায়নি—এই প্রথম খেল। একেবারে অমৃত—বমি আসা ত দূরের কথা। একেই বলে খিদের জ্বালা।

সাতদিন পরে সূর্য্যের মুখ দেখা গেল। অল্প অল্প করে মেঘ কেটে যাচ্ছে, বাতাসের বেগ স্বাভাবিক হয়েছে। দোকানপাট খুলেছে, হাট বাজার বসেছে। অফিস কাছারীতে পুরোদমে কাজ হচ্ছে, ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। এখন সর্বত্র একই আলোচনার বিষয়বস্তু—জলস্তম্ভ।

কে দেখেছে আর কে দেখেনি তাই নিয়ে কথা। শহরের প্রাচীনতম ব্যক্তিও এমন অভূতপূর্ব ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারেনা। শহর সুদ্ধ লোকের একটা বড় অভিজ্ঞতা হল।

বড়কাকা ছুটি শেষে দেবগিরিতে ফিরে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে আসে। মৈত্র পরিবারের অভাবের সংসার গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। রামুদা গাইবাছুরের সেবা যত্ন করে, ঢেঁকি ঘরে এখনও মাঝে মাঝে পাড় পড়ে, মা কাকীমা বিকেলে উনুন ধরিয়ে জলখাবার বানায়। বাবা ডিস্‌পেন্সারী নিয়ে ব্যস্ত—সকাল ৮ টায় গিয়ে ১২ টায় ফেরেন—বিকেল ৪টেয় গিয়ে রাত ৮টায়। ছোটকাকা ঠিকেদারীতে লেগে আছেন। পাঁচু কাকা বেকার, ছোটদেরকে পড়াশুনা দেখিয়ে দেন। দুপুরে রাতে খেতে বসে বাবা কাকাদের আলোচনায় আজকাল যুদ্ধ, জলস্তম্ভ এসব চাপা পড়ে গিয়ে অন্য বিষয়বস্তু এসে ঠাঁই করে নিয়েছে। কলকাতায়, সারা বাংলায় নাকি দুর্ভিক্ষ লেগেছে, হাজারে হাজারে লোক খেতে না পেয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকছে আর দলে দলে মারা যাচ্ছে। সবাই বলছে, এটা ইংরেজদের চালকি। লোক যত খেতে না পাবে তত বাধ্য হয়ে যুদ্ধের চাকরি নেবে। খিদের জ্বালা বিষম জ্বালা—ঝড় তুফানের কদিনেই শবুয়া সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে—সে স্মৃতি এখনও তাদের মনে।

চার

এই দুর্দিনের বাজারে ইংরেজ সরকার হঠাৎ মৈত্র পরিবারের প্রতি সদয় হয়ে উঠল। যুদ্ধের বাজারে উপযুক্ত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার কাজের জন্য পাচ্ছে না। মহিম কান্তি মৈত্র দুবছর আগে সরকারী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। নির্ঝরিণী দেবীর পক্ষ থেকে তার ক্ষতিপূরণ ও পেনসনের দাবি নিয়ে বারবার লেখালেখি করেও কর্ত্তাদের কানে জল ঢোকানো সম্ভব হয় নি। এখন তারাই নিজে থেকে প্রস্তাব দিয়েছে মহিম বাবুর অবর্তমানে তাঁর ইঞ্জিনীয়ার পুত্র অবিনাশকে ঐ অফিসেই ওভারসীয়ার পদে বহাল করতে চায়। চিঠিটা দেখেই অবিনাশবাবু ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন, বললেন—

'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! বাবা আমাদের পরম পূজনীয়, তিনিই আমাকে পাটনা থেকে বি, ই, পাশ করিয়ে এনেছিলেন। একজন বি, ই কে

ওভারসীয়ার করতে চাইছে! বাবা প্রথমে ঐ পদে কাজ করলেও পরে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিলেন। আমার ডিগ্রী আছে—অন্ততঃ এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার করতে পারত। ওদের দেশ থেকে সাদা চামড়ার মুচি মেথরগুলো পর্য্যন্ত এসে সব বড় বড় পোস্টে বসে পড়ছে। আর আমাদের বেলায়! যত্তো সব!'

গিরিনবাবু বললেন—'ঠিক বলেছিস। এখন লোক পাচ্ছে না, তাই আমাদের দয়া দেখাতে এসেছে। সেই জন্যই ত আমি যাদবপুরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে গিয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি নিয়ে আছি। খাই না খাই পরের গোলামী করব না। তুমি এই চাকরির ব্যাপারে কি বল, মা?'

ঠাকুমা বললেন—'সেই ভাল, যেচে অসম্মান মাথা পেতে নিবি কেন?' বলে একটু মুখ টিপে হাসলেন।

মাকে হাসতে দেখে গিরিনবাবু কি যেন অনুমান করে গম্ভীর হয়ে বললেন—'মা, তুমি আর কোন কথা বলবে না কিন্তু।'

ঠাকুমা বললেন—'আমি আবার কাকে কি বলতে গেলাম।'

গিরিনবাবু নিজের কাজে চলে গেলেন। অবিনাশবাবু একবার আড়-চোখে বৌদির দিকে তাকিয়ে হেসে বেরিয়ে গেলেন। কিস্কু কি যেন একটা রহস্যের সন্ধান পেল।

কিস্কু এখন ক্লাশ সিক্সে পড়ে, মাঝে মাঝে ফ্রক, সালোয়ার পাঞ্জাবীর বদলে শাড়ী পরে স্কুলে যায়, অনেক কিছু বুঝতে পারে। কিস্কু শবু মিতু শ্রীলা প্রায় সময়ই ঠাকুমাকে ঘিরে থাকে। বাবা কাকাকে চলে যেতে দেখে কিস্কু চুপি চুপি ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করল—

'ঠাকুমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

ঠাকুমা আশ্চর্য্য হবার ভান করলেন—'আমি আবার হাসলাম কোথায়?'

কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় ভিতর থেকে হাসি ঠেলে বেরোতে চাইছে। কিস্কু ঠাকুমাকে চেপে ধরল—

'না, ঠাকুমা, বলতেই হবে। বাবা তোমাকে কি কথা বলতে বারণ করে গেল—নিশ্চয়ই কোন মজার কথা।'

শবুও ঠাকুমার গলা জড়িয়ে বলল—'হ্যাঁ ঠাকুমা, বল। মজার গল্প বল।'

নাতনীদের আগ্রহে অনেক দিনের গোপন কথা ঠাকুমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বললেন হাসতে হাসতে—

'সে অনেকদিন আগেকার কথা, তখন তোদের জন্ম হয়নি। গিরিনের বিয়েই হয়নি। গিরিনকে যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারীং-এ ভর্ত্তি করা হয়েছে—

থাকে কলকাতায়। একটা বছর বেশ ভালই কাটল। এরই মধ্যে তোদের দাদু মেয়ে পছন্দ করে গিরিনের বিয়ে দিল। আর ছেলে কলকাতায় যেতে চায় না—গেলেও থাকতে চায় না। বলে, কলকাতার বাতাসে আমি শ্বাস নিতে পারিনা—দম আটকে আসে আমার। বাপকে বলল—বাবা, আমি ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ব না, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হব। তোদের দাদু বলল, তোমার যা ইচ্ছে কর, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। আসলে দমবন্ধ ফন্ধ কিছুই নয়। নতুন বিয়ে করেছে, ঘরে তোদের মার মত সুন্দরী বৌ ফেলে কি কেউ দূর দেশে পড়াশুনা করতে পারে? তাই হল পরের গোলামী করব না।' বলে ঠাকুমা খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

উপাখ্যান শুনে ছোট কাকীমা মাকে একটা ছোট চিমটি কেটে বললেন—

'দোষ বুঝি শুধু আমার বেলায়, আমার জন্য নাকি ছোট ছেলে মিলিটারীতে যেতে পারল না? আর দিদি, আপনি?'

লজ্জায় গর্বে মার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললেন—

'এই সুখটুকু যেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় থাকে দীপু।'

কিন্তু আর শবুর মনে কি যেন এক অজানা কল্পনার জাল বোনা হতে থাকে। ওরা বাবা মাকে নতুন করে আবিষ্কার করল, নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। চোখে পড়ে এক নিবিড় দাম্পত্য জীবনের ছবি। যতক্ষণ ঘরে থাকেন বাবা-মা—সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা করেন। কোনরকম মতবিরোধ হয়না—কেউ কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলেন না। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সব সময় হাসি খুশী। একান্নবর্ত্তী পরিবারে এই আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের চিত্র কিন্তু শবুদের ভবিষ্যৎ জীবনের চরিত্র গঠন করে চলে।

বছর ঘুরতে এই আনন্দ ধারার পথ বেয়ে বর্ত্তমান মৈত্র পরিবারে ভূমিষ্ঠ হল প্রথম শিশু পুত্র—গিরিনবাবু ও পদ্মিনীদেবীর প্রথম পুত্র-সন্তান। এ সংসারে তিন পুরুষে কোন কন্যাসন্তান ছিল না—তাই পরপর চারটি মেয়ে হলেও তাদের কোন অনাদর অযত্ন ছিল না। তবু সংস্কারের বশে অনেকের মনেই একটা খুঁতখুঁতি ছিল—এবার একটা ছেলে হওয়া দরকার। সেই ছেলে হতেই বাড়ীতে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। একুশদিন পরে আঁতুড় থেকে বেরিয়ে এল একটি উজ্জ্বল শিশু। কিন্তু শবু মিতু এবং ছোট শ্রীলাও ভাই পেয়ে একেবারে আহ্লাদে আটখানা। শুধু ঠাকুমার চোখে

মাঝে মাঝে জল আসে, বললেন—

'তোদের দাদু আর কর্ত্তামা দেখে যেতে পারলেন না।'

পদ্মিনীদেবী বললেন—'দুঃখ করবেন না, মা। আজ আপনাকে একটা স্বপ্নের কথা বলি। এই ছেলে জন্মানোর আগে একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, বাবা বাড়ীতে এলেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি ছড়িটা একপাশে রাখতে রাখতে বললেন—ফিরে এলাম বৌমা। এক গ্লাস জল দাও ত আমাকে—বলে খাটে বসলেন। আমি প্রণাম করে তাড়াতাড়ি জল আনতে ছুটলাম। ফিরে এসে তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হল আমার পেটে যে আসছে সে নিশ্চয়ই তিনি। কিন্তু ঐ স্বপ্নের কথা আগে আপনাদের বলিনি—যদি সত্যিই তা না হয়। আমার মনে হয় আপনার নাতি ঠিক তাঁরই মত দেখতে হয়েছে।'

আশ্চর্য্য হয়ে ঠাকুমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাতিকে দেখে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হলেন। শিশু সর্বাঙ্গে অবিকল তাঁর মত। শিশু নাতিকে কোলে ধরে বলতে লাগলেন—

'আমার ছোট কর্ত্তা। স্বপ্নের কথা আগে না বলে তুমি ঠিকই করেছ, বৌমা। বললে অনেক সময় স্বপ্ন ফলে না—কখন কোন দেবতা কোথায় থাকে তার ঠিক কি?' বলে হেসে কেঁদে ছোট নাতিকে আদর করতে লাগলেন।

একেই বলে বংশধারা, উত্তর পুরুষের মাঝেই পূর্ব পুরুষরা বারে বারে ফিরে আসেন। বাড়ীর সকলেরই ধারণা কর্ত্তামশাই শিশুরূপ ধরে ফিরে এসেছেন।

পাঁচ

শবু ক্লাশ ফাইভে উঠে মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, সীমন্তী শর্মিষ্ঠা ও হীরাও সেই সঙ্গে একই ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছে। শেষদিন বড়মার স্কুল ছেড়ে আসার সময় শবুর চোখে জল এসেছিল। একে একে দিদিমণিদের প্রণাম করে সবাই মিলে বড়মার ঘরে এল। বড়মা হেমলতা দেবী আরাম কেদারায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ঘরে বিকেলের পড়ন্ত আলো। পাঁচ বছর আগে শবুর দেখা বড়মা যেন ঠিক আগের মতই আছেন, শুধু মাথায়

পাকা চুলের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। বড়মার চোখে কিন্তু শবুর বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন অনেকটা বড় হয়েছে, মাথায় তার ছোট ববছাঁট চুল নয়—দুপাশে ঝুলানো লম্বা বিনুনীর শেষে লাল রিবনের ফুল দুলছে, ফ্রক ছেড়ে সালোয়ার কামিজ গায়ে উঠেছে। মেয়েদের এই পরিবর্তন দেখতে দেখতে বড়মা বুঝি একটু আনমনা হয়ে পড়লেন—সুদূরের সেই কবেকার নিজের শৈশব স্মৃতি তাঁর মনে আসে।

বড়দি আস্তে করে বললেন—'বড়মা, এরা সব এবার স্কুল থেকে পাশ করে অন্য স্কুলে যাচ্ছে। আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে।'

ছেলে মেয়েরা সব একে একে গভীর শ্রদ্ধায় বড়মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মুখে স্মিত হাসি নিয়ে তিনি সবার মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, নানা কুশল প্রশ্ন করলেন। শবু প্রণাম করতে বললেন—

'তুমি সেই শিবনাথ মৈত্র—গিরিনের মেয়ে শ্রাবণী না? কত বড় হয়ে গেছ। তোমাদের মহিমবাবু ও কর্ত্তামার কথা আমি শুনেছি। বড়ই দুঃখের। নিস্তারিণী দেবী তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তায় আমাদের সকলের নমস্যা।'

পরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

'এখন তোমরা আরো বড় স্কুলে যাবে—কেউ কেউ কলেজেও পড়বে। প্রয়োজনে কাউকে কাউকে হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তবে মেয়েদের স্বামীর ঘরই হল তার আসল জায়গা। এর চাইতে আর বড় সুখ জীবনে নেই।

স্মৃতি গর্ব ও বেদনায় বড়মার চোখ দুটি ভারি হয়ে ওঠে। বাল-বিধবা বড়মার অন্তরের বেদনা সকলকে স্পর্শ করে গেল। মেয়েরা সকলে চোখ মুছতে মুছতে আর একবার করে বড়মাকে প্রণাম করে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর যেখানেই যাক বড়মার মত এমন আন্তরিক স্নেহ আর কোথাও পাবে না।

শবু ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসেছিল—বড়মার কি স্মৃতি শক্তি, কিছুই ভোলেন না। কিন্তু বাবা মাকে ছেড়ে স্বামীর ঘর কি ভাল লাগে? কে জানে। দিদির সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ত সরমাদির এই ত সেদিন বিয়ে হল—বাবামাকে ছেড়ে যাবার সময় তবে অত কাঁদল কেন?

পরে সরস্বতী পূজোর দিন সকালে শবু ও তার পুরোনো স্কুলের মেয়ে বন্ধুরা শিউলি ফুলে ছোপানো বাসন্তী রংএর শাড়ী পরে আশ্রমের স্কুলে গিয়ে বড়মা ও অন্যান্য টীচারদের প্রণাম করে এসেছিল। বড়মা খুব খুশী হয়েছিলেন,

সবাইকে আলাদা করে কুশল প্রশ্ন শুধোলেন ও নতুন স্কুল কেমন লাগছে জেনে নিলেন।

জন্মের সাত মাস পরে খুব ধুমধাম করে গিরিনবাবুর ছেলে—কিস্কু শবুদের একমাত্র ভাইয়ের অন্নপ্রাশন হল। ছেলের নাম রাখা হল অনিন্দ্য কান্তি মৈত্র—সকলের আদরের নন্দ দুলাল, নন্দ লাল—সংক্ষেপে নন্দু। খরচ হল পাঁচ শ টাকার মত। দেবগিরি থেকে বড়কাকা এলেন। দিনকাল ভাল নয়, যুদ্ধ চলছে, তাই মামারা আসতে পারলেন না।

অন্নপ্রাশন মিটে গেলে ঠাকুমা বললেন '—গিরিন তো প্রথম ছেলে—তার অন্নপ্রাশন হয়েছিল আমার বাপের বাড়ীতে। সে অনুষ্ঠানে পাঁচ গাঁয়ের লোক খেয়েছিল। আমার বাবার কত খরচ হয়েছিল জানিস? মাত্র ছ টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা, এখনও বাবার হিসেবের খাতায় লেখা আছে।'

শুনে কিস্কু শবুরা তাজ্জব বনে গেল, এখন ত ছটাকায় তাদের দুজনের একজোড়া ভাল ফ্রক হয় না। এই ত এবার পূজোর জন্য সব ভাইবোনের নতুন জামা কেনা হয়েছে পনরো টাকায়।

পূজো আসছে। সবাই অপেক্ষা করছে কবে পূজো আরম্ভ হবে, নতুন জামা পরা হবে, কাকারা নাটক করবে। বাবা নিজে আর নাটকে নামেন না —স্টেজের তদারক করেন। ওদের বড় আকর্ষণ বড়কাকা আসবেন দেবগিরি থেকে, তাঁর নাটকে পার্ট আছে। ষষ্ঠীর রাত চলে গিয়ে আজ সপ্তমীর সকাল তবু বড়কাকার দেখা নেই। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, বিকেল হল তবু বড় কাকার দেখা নেই। কিস্কু শবুরা ঠাকুমা মা কাকীমার সঙ্গে সেজে গুজে সন্ধ্যের পর আরতি দেখতে গেল। আরতির শেষে সবাই মুখ ফেরাল স্টেজের দিকে—এখন নাটক আরম্ভ হবে। ঘোষণা করা হল, প্রথমে একটা উদ্বোধনী সংগীত হবে তার পর নাটক। স্টেজের ড্রপসীন উঠল। কিস্কু শবুরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখল বড়কাকা অর্গানের সামনে বসে ভরাট গলায় গেয়ে উঠলেন—

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব ·।'

ওমা, তাইত, বড়কাকা আবার কখন এল! চোখ দুটো যেন খুব লাল দেখাচ্ছে। আশ্চর্য হবার অবসর নেই—নাটক শুরু হয়ে গেল। ছোটকাকা স্ত্রী-ভূমিকায় নেমেছেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিন্তু জিজ্ঞেস করল—

'বড়কাকা, কাল তুমি কখন এলে ?'

হেমবাবু বললেন—'ট্রেনটা লেট ছিল। দুপুর গড়িয়ে যায় দেখে সোজা পূজোবাড়ীতে গিয়ে পেট ভরে প্রসাদ খেলাম। তারপর সারা বিকেল রিহার্সাল দিয়ে রাতে একেবারে স্টেজে।' ··বলতে বলতে হঠাৎ আনমনা হয়ে এক দৃষ্টে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন। এত আপন বড় কাকাকে যেন অচেনা মনে হচ্ছে।

পূজোর কদিন কাটিয়ে হেমবাবু দেবগিরিতে গিয়ে একমাস পরেই একেবারে অসুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। খেতে বসে বাবা কাকারা গল্প করে থাকেন। এখনও কথা বার্ত্তা হচ্ছে—সবই যুদ্ধের কথা। এটাকে নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলে··প্রথমটা হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বছর আগে। এখন জার্মানী নাকি রাশিয়ার হাতে খুব মার খাচ্ছে আর রুশদেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। পালাতে কি আর পারছে—দলে দলে মারা পড়ছে। ওদিকে জাপানীরা নাকি মণিপুর পর্য্যন্ত এসে গেছে—বাংলার সুভাষ বোসও নাকি সঙ্গে আছে। কি যে হবে কিছু বলা যায় না। বাবা ছোটকাকা আর পাঁচু কাকাই শুধু কথা বলেন, বড়কাকা চুপচাপ খেয়ে যান। আগের মত ভালমন্দ চেয়ে খেতে ভুলে যাচ্ছেন, সব সময় কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব।

নন্দু একটু একটু করে বড় হচ্ছে। চার বোনের মধ্যে এক ভাই নন্দু বেশ আদরে গোবরে মানুষ হচ্ছে। সকলের, বিশেষ করে ঠাকুমার সে নয়নের মণি। শবু এবারে উঠল ক্লাস সিক্সে, কিন্তু এইটে। দুজনই শৈশব পেরিয়ে এখন রীতিমত কিশোরী। তাদের এখন তিনটে জগৎ। যখন নন্দু শ্রীলা মিতুদের সঙ্গে খেলা করে কিম্বা বাড়ীর পাশের বালির ঢিবির উপর পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে সবাই মিলে খেলা গল্প করে তখন তারা ফিরে যায় অতীতের শৈশবে। যখন স্কুলে যায়—তখন ক্লাশের সমবয়সীদের সঙ্গে কথায় গল্পে হাসিতে আর পড়াশুনায় একেবারে পূর্ণ কিশোরী। আর অবসর সময়ে বা রাতে মা কাকীমা ঠাকুমাদের মাঝে যখন থাকে কিম্বা বাবা কাকাদের কথাবার্ত্তা শোনে তখন ওদের চলে বড়দের জীবন ধারার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নেবার প্রস্তুতি। জীবনের সবচাইতে মধুর কাল এই কৈশোর তাদের মনের শাখা প্রশাখাকে ভরে তোলে নবকিশলয়ের সবুজ আভায়—নব নব মঞ্জরীতে রাঙিয়ে তোলে চারিদিক।

কিন্তু আর শবু দুবোনই ভর্তি হয়েছে মণিমেলায়—কাছেই রানীর বাগানে যত সব মণিভাই-বোনদের সঙ্গে মিশে হয় কত খেলাধুলা, ড্রিল, ব্যায়াম। বড়মার স্কুলে পড়ার সময় সে পাড়ার দুটি মেয়ে আরতি ও মিনতির সঙ্গে শবুর খুব মিতালী হয়েছিল—তিনজনে নিজেদের মধ্যে 'জুজু' পাতিয়েছিল, একে অপরকে ডাকত 'জুজু' বলে। মেয়েদের স্কুলটা দূরে হওয়াতে শবুর সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেছে, আরতি মিনতিরা ওদিককার একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে, মণিমেলাতেও তারা আসেনা।

ছয়

শবুর ক্লাশে এখন অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে। শুভাষিণী, সুনন্দা, সুলক্ষণা লাবণ্য, সীমন্তী, শর্মিষ্ঠা, উর্মিলা আরও কত। এছাড়া পাশের বাড়ীর হীরা ত আছেই। অপুর মত বড়মার স্কুলের ছেলে বন্ধুরা সব ছেলেদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। টিফিনের সময় ক্লাশের মেয়ে বন্ধুরা কয়েক জন মিলে একটা গাছতলায় বসে গল্প করে, ভাগাভাগি করে টিফিন খায়। ওদেরই মধ্যে শুভাষিণী আর সুনন্দা বেশ ভাল গান গায়। মাঝে মাঝে তারা গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয়—বাকি সবাই তাদের উৎসাহ যোগায়। স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে গানের জন্য ঐ দুজনের নাম সবার আগে। সবাই বলে—সুনন্দাই ভাল গায়।

সুনন্দা বিনয় করে বলে—'মু এইনে আউ কন শিখিছি কি? রাগ রাগিণী সব ভাল করি জানিবা দরকার, শিখিবার অছি। তবে প্রকৃত শিক্ষা হব। এ হউছি সাধনার জিনিষ।'

সুনন্দা খুব উঁচু ভাবের কথা বলে। শুভাষিণী বলে—

'মু পরা কেবল ভজন পূজন করুথায়, আউ কেবে কেবে চালু গীতভি গাহুছি। সেতে সাধনা মো দ্বারা হেই পারিব নাহি।'

ওরা সবাই নিজের নিজের ভাষায় কথা বলে। হেডমিস্ট্রেস্ এর নির্দেশ, ভিন্ন ভাষাভাষি হলেও যে যার মাতৃভাষায় কথা বলবে সবার সঙ্গে। শুভাষিণীর কথায় একটু ঈর্ষার আভাষ আছে। কিন্তু এখন আর গান গায় না, শবুরও নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। দাদু মারা যাবার পর থেকে যা দুর্দিন চলছে—বাড়ীতে বৈঠকখানা ঘরের সে গান বাজনাও আর হয় না।

শবুদের ক্লাশে সংস্কৃত পড়ানো শুরু হয়েছে—প্রথমে শব্দরূপ, ধাতুরূপ,

ব্যাকরণ এই সব। শবুর সংস্কৃত খুব ভাল লাগে। সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাইও শবুকে খুব উৎসাহ দেন। সুলক্ষণা আবার কিছুতেই সংস্কৃতটা ধাতস্থ করতে পারে না। তাই নিয়ে পণ্ডিত মশাই রোজ রাগারাগি করেন ওর উপরে। ক্লাশে এসে প্রথম পড়া ধরবেন সুলক্ষণাকেই—

'সুলক্ষণা, কহিলু—লতা শব্দর তৃতীয়ার একবচনরে কন হেব?'

সুলক্ষণা উঠে দাঁড়িয়ে কেবল নখ খুঁটতে থাকে। পণ্ডিত মশাই রেগে বলেন—

'সুলক্ষণা নুহে—কু-লক্ষণাটে। পাঁচ মিনিট ছিরা হেইকি রহ। শাওনী মিত্র—তু কহিলু?'

শবু ওরফে শ্রাবণী উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে জবাব দেয়—'লতয়া।'

'ঠিক হেলা. বস।' বলে পণ্ডিত মশাই পড়াতে আরম্ভ করেন আর তাঁর আদেশে সুলক্ষণা পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, আর সবার দিকে করুণ চোখে তাকায়। দেখে শবুর কষ্ট লাগে। কেন যে রোজ রোজ মেয়েটাকে হেনস্তা করেন পণ্ডিত মশাই বুঝতে পারে না।

আরও একটা জিনিষ শবু বুঝে পায় না—ওর নামকে ওরকম পাল্টে দেন কেন পণ্ডিত মশাই। শ্রাবণীকে না হয় শাওনী মানা যায়—কিন্তু মৈত্র কে মিত্র? একদিন অনেক চেষ্টা করে সাহসে ভর দিয়ে বলেই ফেলেছিল—

'স্যার, মিত্র নয়—মৈত্র।'

পণ্ডিত মশাই কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বলে দিলেন—'একা কথা।'

মিত্র আর মৈত্র এক কথা! এরপর আর কি বলা যায়? একেই ত শবু কথা কম বলে। তার উপর কোন কথার প্রতিবাদ করা বা তর্ক করা একেবারেই ওর স্বভাব বিরুদ্ধ।

সেই গ্রীষ্মেই হঠাৎ একদিন ঢন্‌ঢন্‌ করে ঘন্টা বাজিয়ে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। যুদ্ধ নাকি শেষ হয়ে গেছে—ইংরেজরা নাকি জিতেছে—জিতেছে রাশিয়া আমেরিকাও। হিটলার আর মুসোলিনী নাকি মরেছে। কদিন যেতে বর্ষার মাঝামাঝি জাপানের হিরোশিমা—নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা ফেলল আমেরিকা। এক এক বোমায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোক মারা পড়ল। জাপান ভয়ে মাথা নত করল—তোজোর নাকি ফাঁসী হবে।

শহরের লোক সব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু শবুরা এখন স্কুলেই অনেক খবর পায়। বাড়ী এসে ঠাকুমা মা কাকীমাকে শোনায়। ঠাকুমা বলেন—

'যুদ্ধ তো থামল বুঝলাম কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম কমে কই? গোরা পল্টনগুলোই বা যায় না কেন?'

জিনিষ পত্রের দাম কমেনা বটে, কিন্তু মিলিটারীদের আনাগোনা কমে আসছে। শেষে আর একটাও দেখা যায় না। শোনা যায় এখানকার শিবির তুলে নিয়ে সব কলকাতা না কোথায় চলে গেছে। ভূপেনবাবুর দোকানে বেচা কেনায় হঠাৎই খুব ভাটা পড়ে গেছে। মার খায় আরো অনেক দোকানী ব্যবসায়ী। যুদ্ধের তেজী বাজার হঠাৎ পড়ে গেছে। দলে দলে লোক মিলিটারীর চাকরি থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরছে—দেশে বেকারী বাড়ছে। সেই ঠাকুর বাঙ্গারামের কি হল জানা যায় না।

অবিনাশ বাবু এতদিন যে ঠিকেদারীর কাজ করতেন তার মধ্যে সরকারী কাজ খুব কমই ছিল—বেশীর ভাগই ছিল প্রাইভেট, মাঝে মধ্যে পুরসভার দু একটা কাজ। এখন সরকারী কাজের সুযোগ আরও কমে এসেছে। ফলে খুব সামান্যই আয় হচ্ছে ঠিকেদারী থেকে। হৈমবাবু অসুস্থ হয়ে বাড়ীতে বসে আছেন—পাওনা ছুটি ফুরিয়ে যাওয়াতে তাঁর মাইনেপত্রও আর আসছে না। তবে অধ্যবসায়ের জোরে গিরিনবাবুর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীতে এখন পসার কিছু বেড়েছে। এই সব নিয়ে অভাবের মধ্যে সংসারটা মোটামুটি কোন-রকমে টিকে আছে।

সরকার বাহাদুর সামান্য কিছু টাকা পেনসন মঞ্জুর করেছেন নির্ঝরিণী দেবীকে। মাত্র পঞ্চাশ টাকার পেনসন মঞ্জুর করাতে উকিল হিতেনবাবুকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। কতরকম সব ফ্যাকড়া সরকারী টাকা মঞ্জুর করাতে। প্রথমে প্রমাণ কর যে সত্য সত্যই তাঁর স্বামী মহিমকান্তি মৈত্র সরকারী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন কিনা? তাঁর স্ত্রীকে এ অবস্থায় ভাতা দেবার বিধান কোন আইনে আছে? মৈত্র মহাশয়ের উপযুক্ত ছেলেরা তাদের মাতৃদেবীর ভরণ পোষণ করতে অসমর্থ কিনা? এত সব আইনের ঘোরপ্যাচ অফিস কাছারী দৌড়োদৌড়ি হিতেন বাবুর মত শুভানু-ধ্যায়ী কৰিৎকর্মা উকিল সহায় ছিলেন বলেই সম্ভব হয়েছে। নির্ঝরিণী দেবীকে মাঝে মাঝে স্থানীয় কাছারীতে গিয়ে ছেলেদের অক্ষমতার কাহিনি গাইতে হবে তবে মাসে মাসে পঞ্চাশটা মুদ্রা পাওয়া যাবে। প্রাণ দিয়ে সর-কারের সেবা করার কি পুরস্কার!

বাড়ীতে ওরা তিন চার বোনে মিলে সকালে বিকেলে চেঁচিয়ে পড়াশুনা করে। শ্রীলা একটু একটু পড়তে আরম্ভ করেছে—সামনের বছর সে বড়মার স্কুলে ভর্ত্তি হবে। ওদের কোন গৃহশিক্ষক নেই। বড়রা ছোটদের দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়—পাঁচুকাকা উপর উপর সবাইকে দেখা শোনা করেন। সেদিনও ওরা সকালে বৈঠকখানা ঘরে পড়াশুনা করছিল। ঠাকুমা ভিতরের বারান্দা থেকে অবিনাশকে বললেন—

'বাইরের ঘরে পাঁচু আছে ওকে একটু ডেকে দিস ত।'

ছোটকাকা বাইরে বেরোবার মুখে সামনে শবুকে দেখে বললেন—'এই শবু, পাঁচুদাকে বল মা ডাকছেন।'

শবু বাইরের ঘরে ফিরে বলল—'পাঁচুকাকা, ঠাকুমা তোমাকে ডাকছেন।'

মিতু বড়মার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল—'আচ্ছা পাঁচুকাকা, ঠাকুমা বাবা তোমাকে বলে পাঁচু, মা বলে পাঁচু ঠাকুরপো, ছোট-কাকা বলে পাঁচুদা, আমরা বলি পাঁচুকাকা। একজন মানুষের ত একটাই নাম। সবাই কেন পাঁচু বলে না?'

এ কথার আবার কি উত্তর শবু ভেবে পায় না। অনাবশ্যক বোধে পাঁচু-কাকা জবাব না দিয়ে ঠাকুমার কাছে চলে গেলেন। কিন্তু মিতুকে বোঝাতে লাগল—

'যার সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাই বলে ত ডাকবে। এই দেখ, আমার নাম কিন্তু, কিন্তু তোরা আমাকে ডাকিস বড়দি বলে, কারণ আমি তোদের সবার চাইতে বড়। শবুকে ডাকিস তোরা 'মেজদি' বলে। শ্রীলা তোকে বলে সেজদি, নন্দুও তাই বলবে। ছোটরা বড়দের নাম ধরে ডাকে না। নাম ধরে ডাকে শুধু বড়রা আর বন্ধুরা।'

ব্যাখ্যায় মিতু সন্তুষ্ট হল কিনা বোঝা গেল না। শুধু শবুর কানে মধুর লাগে 'মেজদি' ডাকটি। সে যে ছোট ভাই-বোনদের সবার মেজদি। সবাই তাকে ভালবাসে, সেও সবাইকে খুব ভালবাসে।

ছুটির দিন ছিল। দুপুরে সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছে ভিতরের বারান্দায়। এক সারিতে বাবা কাকারা অন্য সারিতে ছোটরা। খেতে খেতে পাঁচুকাকা মিতুর সকালবেলার প্রশ্নের প্রসঙ্গ তুলে বললেন—

'মিতুটার খুব বুদ্ধি। এক এক সময় এমন সব প্রশ্ন করে এই বয়েসে যে শুনলে অবাক হতে হয়। কথাবার্ত্তায়ও খুব চটপটে। সুযোগ পেলে বড় হয়ে ও জজ ম্যাজিষ্ট্রেট না হলেও অন্ততঃ উকিল ব্যারিস্টার হতে পারবে। গানের

গলাও বেশ ভাল। এ বাড়ীর গান বাজনার রেওয়াজটা থাকলে ভাল গাইয়েও হতে পারত।'

পাঁচু কাকার কথা শেষ হতে ছোটকাকা কথার খেই ধরলেন—

'আমার কিন্তু মনে হয় কিন্তুই বেশী বলিয়ে কইয়ে। গানও ভাল গায়। খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চালাক চতুর। ছোট ভাইবোনদের একাই পরিচালনা করে। তবে বড্ড বেশী কথা বলে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে আর ভীষণ অগোছালো।'

ছোটকাকা সব সময় টিপটপ্ থাকতে ভালবাসেন, অগোছালোপনা মোটে দেখতে পারেন না।

বড়কাকা আজকাল অসুখের কারণে কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। অনেকদিন পরে হঠাৎ এখন মৌনতা ভঙ্গ করলেন—

'আর শবুর কথা বলার নয়। শ্রাবণী—শর্বাণী—শিবাণী—ভবানী। বোকার বোকা—কিন্তু লেখাপড়ায় মনযোগী। কথা বলে গুণে গুণে—যেন বেশী কথা বলা পাপ। অদ্ভুত ওর স্মৃতি শক্তি—সব জিনিষ সব কথা ওর মনে থাকে। যে যা বলে তাই মেনে নেয়, যুক্তি তর্ক করে না। ওর চোখে একবার যে খারাপ সে চিরকালই খারাপ—ভাল চিরকালই ভাল। সরল, নিরহংকার, —কিন্তু ভীষণ অভিমানী—যেন সব সময় ঠোঁট ফুলিয়েই আছে। আর রূপেগুণে গানে যেন স্বয়ং মা-সরস্বতী—যেমন মা তেমন তার মেয়ে।'

বলে বৌদির দিকে একটু তাকিয়ে হা হা করে ঘর ফাটানো হাসি হাসতে লাগলেন।

হেমবাবুর কথাগুলো কতখানি প্রশংসার আর কতখানি ঠাট্টার সঠিক ঠাওর হয় না। তবে শেষের কথাটিতে গিরিনবাবু জল খেতে খেতে বিষম খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। পদ্মিনী দেবী আরক্ত মুখে সবার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাকুমা নির্ঝরিণী দেবী খিলখিল করে হেসে উঠলেন। অতীতের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে·········

···সবে বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে ছোট খাট টুকটুকে বউ ঘরে এনেছেন। বাড়ীতে ছেলেরা সবসময় গান বাজনা নিয়ে থাকে। কর্ত্তামারও ছিল সুন্দর গানের গলা, রোজ সন্ধ্যায় হরিনাম গান করতেন, সবাই শুনে মুগ্ধ হ'ত। নির্ঝরিণী দেবী নিজেও কিছু কিছু গান বাজনা জানতেন। নতুন বউকেও গানের পরীক্ষায় বসতে হল—সে যেন এক অগ্নিপরীক্ষা। হারমোনিয়াম এস্রাজ বেজে চলে কিন্তু বউএর গলা দিয়ে গানের গা—ও বের হয় না। গলায় নেই সুর। কর্ত্তামা, মা, বড়-মেজো ছেলেতে মিলে হারমোনিয়াম

বাজিয়ে দিনের পর দিন সে কি গলদঘর্ম প্রচেষ্টা। ছ মাসের চেষ্টায় যখন তাকে দিয়ে একটা গানও গলা খুলে গাওয়ানো গেল না তখন হতাশ হয়ে সবাই একে একে হাল ছেড়ে দিল। কর্তামা নিরাশ হয়ে বললেন,—এ ছুড়ীর কিছু হবেনা। আর হৈম ছিল এসব ঘটনার সবচাইতে অন্তরঙ্গ সাক্ষী।

সে যাই হোক, বড়কাকা কিন্তু শবুকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসেন। বড়কাকা ত মেজো, শবুও মেজো। আবার যখন কেউ বলে—শবু ঠিক তার মায়ের মত, অবিকল—তখন শবুর বুক আনন্দে গর্বে ভরে ওঠে। সে যে মা-অন্ত প্রাণ, মা-ই তার ধ্যান জ্ঞান। অবাধ্য সে কারও নয় তবু মা-ই সব। আর মা? শবু যেন তাঁর নয়নের মণি, নিজেরই প্রতিচ্ছবি।

বাড়ীতে লক্ষ্মীর ঘট বসান আছে। সামনে মা লক্ষ্মীর একটি পটও সুন্দর করে সাজানো আছে। রোজ সন্ধ্যায় তার সামনে প্রদীপ জ্বালা হয়—ধূপ দেওয়া হয়। সামান্য জলবাতাসার ভোগ নিবেদন করে ছোটদের হাতে হাতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর কথা শোনা হয়, মেয়েরা পাশে বসে লক্ষ্মীর মহিমা কথা শোনে, শেষে প্রসাদ পেয়ে তবে সন্ধ্যার পড়া পড়তে বসে। বাড়ীতে নানা বার ব্রত পুজো আর্চা হয়। ঠাকুর মশাই এসে সে সব পুজো করে দিয়ে যান। কোন বাহুল্য বা বাড়াবাড়ি নেই—আছে ভক্তি, নিষ্ঠা। শহরে মাঝে মাঝে এক এক জন মহাপুরুষ বা গুরুর আবির্ভাব হয়। এ বাড়ীতে কিন্তু কোন গুরুর আনাগোনা নেই, শিষ্যও হয়নি কেউ। কর্তামাও বলতেন—ভগবান, ভক্তি সব যার যার মনে মনে, গুরু দিয়ে কি হবে? সেই ধারাই বাড়ীতে বহাল আছে। শবুদের কাছে বাড়ীর লক্ষ্মীই হল বড় দেবতা। মা বলেন—

'বাড়ীর পুরুষ মানুষরাই হল বাড়ীর লক্ষ্মী। তারা সব জুটিয়ে এনে দেয়—তাই দিয়ে মেয়েরা ঘর সাজায়, ঘরের শ্রী ফেরে। তোদের দাদু চলে যেতে বাড়ীটার কি হাল হয়েছিল—আবার এখন তোদের বাবা কাকারা এদিকে নজর দেওয়াতে বাড়ীর শ্রী একটু একটু করে ফিরছে।' শবুর কাছে মার কথাই বেদ বাক্য।

কিঙ্কুর জন্ম পঁচিশে ডিসেম্বর—বড়দিন। সে রাতে পাশের গীর্জায় যখন ঘণ্টা বাজছিল রাত বারোটায় সেই সময় দিদির জন্ম, ঠাকুমার কাছে ওরা শুনেছে। আর কদিন পরেই বড়দিন আসছে। ওদের মেয়েদের স্কুল থেকে বড়দিনের এক্সকার্শানে কারা যেতে রাজি নাম দিতে বলেছে। কিন্তু শবু ত-

জনেই যাবে বলে নেচে উঠল। বাড়ীতে এ নিয়ে মা ঠাকুমায়া আলোচনা করলেন। শেষে ঠাকুমা বললেন—

'কিন্তুর এখন যাওয়া হবে না। শবু যদি অন্যদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে তবে যায় যেন।'

কিন্তু কেঁদে কেটে অস্থির—'তোমরা শবুকে যেতে বলছ। আমি কি দোষ করলাম?'

কাকীমা বুঝিয়ে বললেন—'এখন তুমি বড় হচ্ছ—এ সময় তোমার বাড়ী ছেড়ে দূরে যাওয়া ঠিক নয়।'

এ কথার কি মানে, ওরা দুজনেই বুঝতে পারল না। বড়দের সব কথা ওরা বুঝতে পারে না। দিদির যাওয়া হবে না, তবে শবুও যাবে না। ওদের বেড়াতে যাওয়া আর হল না।

দিদি কিন্তু ক্লাশ নাইনে উঠতে উঠতে শাড়ী পরা ধরল। শবুর মনে হয় দিদি এখন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। দিদির মনের নাগালও বেশী পায় না। আগের মত আর সকলের সঙ্গে ছুটাছুটি করে খেলা করে না। প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। শবু অবাক বিস্ময়ে দিদির পরিবর্ত্তনগুলো লক্ষ্য করতে থাকে। দিদি যেন বদলে যাচ্ছে।

কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল, মা কাকীমা দুজনেরই ছেলে হবে। শবু মনে মনে ভাবত, আরো দুটো ভাই হলে খুব মজা হয়। দেখতে দেখতে সে দিন এসে গেল। আগে এল শবুদের আর এক ভাই। শবু যখন হয়েছিল, আঁতুড় ঘরে বিনা প্রদীপের আলোতেই সে জ্বলজ্বল করতো। আর এ ছেলের বেলায় খড়ের বিছানায় প্রদীপের আলো উস্কে দিয়েও তাকে বুঝি পুরোপুরি দেখা যায় না। একুশ দিন পরে যখন সে বাইরে এল সবাই দেখে বলল—

'এ যে দেখি শালগ্রাম শিলাকেও হার মানায়। কি কালোর কালো! সর্ব্বাঙ্গে সাদা ত দূরের কথা, এক বিন্দু লালের ছিটেও নেই।'

ঠাকুমা বললেন—'এ আমার বড়বৌমার অষ্টম গর্ভের সন্তান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশে এর জন্ম। এ হল আমাদের কানাইলাল।'

শবু বোকার মত প্রশ্ন করল—

'ঠাকুমা, আমরা ত এখন তিন বোন দুভাই, মোট হল পাঁচ। তুমি যে বললে—অষ্টম?' সামনের বছর সে অষ্টম শ্রেণীতে উঠবে, তাই আটের হিসেব সে ভালই জানে।

ঠাকুমা বললেন—'আগে তিনটি নষ্ট হয়ে গেছে। সে তুমি এখন বুঝবে না।' শবু সত্যিই বড় বোকা।

ক'দিন পরে শ্রীলার বোনটি হতে ঠাকুমা ঠাট্টা করে বললেন—

'ছোট বৌমা বিয়ে হয়ে এসে বলেছিল, দিদির দেখি তিনটিই মেয়ে। তা ছোট বৌমারও বুঝি তাই হতে চলেছে। এ বাড়ীতে অবশ্য মেয়েদের অনাদর অযত্ন হয়না—এরা সব আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। আগে তিন পুরুষে ত কোন মেয়ে ছিল না।'

ছোটকাকাও ঠাট্টার সুরে বললেন—'এবার তোমাদের তিন পুরুষের সাধ এক পুরুষেই মিটে যাবে। পঞ্চ কন্যাং স্মরেন্নিত্যং।'

একমাস পরে শ্রীলার বোন আঁতুড় থেকে বের হল। দুটিকে যখন তেল মাখিয়ে পাশাপাশি রৌদ্রে শুইয়ে রাখে তখন কানাই লালের পাশে শ্রীলার বোনকে বেশ ফর্সা দেখায়। দুটিতে পাশাপাশি শুয়ে হাত পা ছুড়ছে, বড় বোনেরা এবং নন্দুও গোল হয়ে ঘিরে শিশু দুটিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে—সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। মা পদ্মিনী দেবী যখন ছোট ছেলেকে কোলে করে তেল মাখান বা আদর করেন তখন সাদার কালোয় দৃশ্যটি আরও অপরূপ হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন মা যশোদার কোলে শিশু শ্রীকৃষ্ণ।

সাত

বাবা কাকাদের খাবার আসরে কদিন ধরে শোনা যাচ্ছে একটা নতুন কথা 'দাঙ্গা'। কলকাতায় নাকি হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছে। মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে—আবার হিন্দুরা মুসলমানদের মারছে। তখনও বর্ষা চলছে। হিন্দু মুসলমানে মারামারি কি ও কেন—কিছু শবুরা বুঝতে পারে না। কিন্তুর ক্লাসে এক বাড়ীর দুইবোন পড়ে—শবু তাদের ডাকে কমরুণ-দি ও আয়েসা-দি বলে। তারা নাকি মুসলমান—কই এখানে ত কেউ মারামারি করে না।

শবুদের বাড়ির পাশের গীর্জায় থাকে ফাদার আর নান্, তারা নাকি খৃষ্টান—প্রত্যেক রবিবারে আরও কত খ্রীষ্টান আসে। গীর্জায় ঘণ্টা বাজে প্রার্থনা হয়। বড়দিনে—পয়লা জানুয়ারীতে, কি সুন্দর করে গীর্জাটাকে সাজায়—ওদের সবাইকে কেক খেতে দেয়। সেখানে মাঝে মাঝে বিয়ের অনুষ্ঠানও

হয়। বর কিন্তু টোপর মাথায় দিয়ে আসে না। রীতিমত স্যুটবুট পরা বর। বউটা সাজে পরীর মত, ইংরেজী বইতে যেমন ছবি দেখা যায়। এদের সঙ্গে ত কেউ মারামারি করে না। গীর্জার খুব কাছেই থাকেন মেটিরিয়া মেম—খ্রীষ্টান। তাঁর মারফৎ এক মহিলা একদিন শবুদের স্কুলে এসেছিল। মুলো—হাতের কাজ পা দিয়ে করে। স্কুলে সবার সামনে আশ্চর্য্য কায়দায় শুধু দুটো পা দিয়ে স্টোভ জ্বেলে চা তৈরী করে কাপ ডিশে সাজিয়ে টীচারদের সামনে ধরে দিয়েছিল। এরকম কোন অদ্ভুত-কর্মা লোক স্কুলে এলে ছাত্রীদের কিছু চাঁদা দিতে হয় সাহায্যের জন্য—শবুরাও দিয়েছিল।

সেবার স্কুলে রান্নার পরীক্ষায় কমরুণ-দি কি সুন্দর পোলাও বেঁধেছিল—সবাই খুব প্রশংসা করছিল। কিন্তু শবুরাও খেয়ে দেখেছে—অপূর্ব। লোকে বলতেই বলে—হিন্দুর বাড়ী, মুসলমানের হাঁড়ি আর খ্রীষ্টানের শাড়ী—সব থেকে সুন্দর। হিন্দুদের বাড়ী সব সময় লেপাপোঁছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুসলমানদের রান্না করা খাবার সব থেকে সেরা। আর খ্রীষ্টানদের দেখবে যত পোষাকের বাহার।

কিন্তু শবুরা অনেকবার কমরুণদের বাড়ী গেছে—খুব কাছেই থাকে স্কুলের ওপাশটাতেই। তারা খুব বড়লোক—তাদের বাবা নাকি ইংরেজ সরকারের কাউন্সিলের মেম্বার। কিন্তু শবুরা বেড়াতে গেলে কমরুণদির মা আদর করে মাদুর পেতে বসতে দেন। ভাত তরকারী ছাড়া অন্য সব ভাল ভাল খাবার খেতে দেন। কিন্তু হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে। ওরা চলে এলে কমরুণদির ঠাকুমা নাকি মাদুরটা জলে ভাল করে ধুইয়ে শুকোতে দেন, পারলে হারমোনিয়ামটাকেও জলে চুবিয়ে আনেন আর কি—কমরুণদি নিজেই সেকথা ওদেরকে বলেছে। বলে—

'মোর দাদী সিমিতিয়া—কেবল ছুঁয়াছুঁত।'

কমরুণদিরাও যখন এবাড়ী বেড়াতে আসে তখন তাদেরও রান্না ঘর আর কর্ত্তামার ঘর (বর্তমানে ঠাকুর ঘর) এ ঢুকতে দেওয়া হয় না। তারা আসে, গল্প করে, জলখাবার খায়, চলে যায়। কোন ঝাড় পোঁছ ধোওয়া পাকলা হয় না। শুধু খাবারের প্লেটগুলো মাজাঘষা করার সময় অন্নদাপিসি গজগজ করে—

'এইনে অবেলরে গা ধোইবাকু পড়িব।'

রামুদা বলে—'সে সব মো পাঁই ছাড়ি দিয়। কর্ত্তাবাবুঙ্কর সাঙ্গেরে থিলা বেলে মু কেতে মুসল্‌মান খ্রীষ্টানর বাসন ধোই সারিছি—কণ হেইছি কি?'

অন্নদাপিসিও ছাড়েনা, বলে—'তেমে সব মরদ লোক, তোমর আউ কণ হেব ? মাইকিনা হেলে বুঝিথাস্ত।'

ওদের তর্কের ব্যাপার শবুরা বুঝতে পারে না—পুরুষ মানুষ আর মেয়ে-মানুষ কি আলাদা জাত ? মুসলমানের এঁটো ছুঁলে একজনের জাত যায় আর একজনের যায় না ?

কিন্তু মানুষ হয়েও যে হিন্দু আর মুসলমান আলাদা জাত তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মা বলেছিল, ছেলে দুটোকে তাদের মামাবাড়ী থেকে ঘুরিয়ে আনব—মামারা ভাগ্নেদের এখনও দেখেনি। কথা হচ্ছিল দুই ভাই বোনের মুখে ভাত হয়ে গেলেই একবার যাওয়া। কিন্তু কি দাঙ্গাই বাধল—সারা বাংলা দেশেই নাকি দাঙ্গা মারামারি হচ্ছে। ফলে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

বাবা বললেন—'এবার থাক, সামনের বছর দেখা যাবে।'

এবারে গেলেও কিন্তু শবুদের যাওয়া হ'ত না—তারা এখন বড় হয়েছে। যেত মিতু নন্দু আর কানাইলাল।

যথা সময়ে নয়মাস সাতমাস মিলিয়ে ছোট দুই ভাই বোনের মুখেভাত হল একসঙ্গে—অন্নপ্রাশন নয়, সে হয় শুধু বড় বা প্রথম ছেলের বেলায়। ছেলের নামকরণ হল অসিত কান্তি মৈত্র - ডাক নাম কেউ বলে কানাইলাল, কেউ কানাই, কেউ কালাচাঁদ, কেউ শ্যাম, কানু, লালু, মুরলীধর—কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামের মতই তার ডাক নাম অসংখ্য। ছোট বোনের নাম হল এলা—শ্রীলার বোন এলা।

এবারে বড়দিনের ছুটিতে স্কুল থেকে এক্সকার্শনে যাবে তালচেরে। কিন্তু শবু সহজেই অনুমতি পেয়ে গেল। এই প্রথম তারা বাবা মা ছাড়া বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে—নিজেদেরকে হঠাৎ যেন অনেকটা বড় মনে হয়, দল বেঁধে বেড়াতে যাবার একটা রোমাঞ্চও লাগছে। দলে প্রায় একশজন হবে স্কুলের ছাত্রী ও পরিচালিকা টিচারদের নিয়ে।

ট্রেনে করে সবাই তালচেরে এসে পৌঁছল। সেখানকার বিশাল রাজ-বাড়ীর একাংশে ওদের থাকার জায়গা হয়েছে। তিন দিন ধরে খাওয়া দাওয়া বেড়ানো, হৈ হুল্লোড়, গান বাজনা—একটানা পিকনিকের পরিবেশ। শেষ দিন সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল তালচেরে কয়লাখনি দেখতে। সেখানে এসে ইন্‌চার্জ টীচার বললেন, মেয়েদের মধ্যে যাদের ভয় করবে তারা খাদে নামবে না, উপরেই থাকবে। নীচে নামার ঝুঁকি আছে, যাদের সাহস আছে তারাই

শুধু নামবে। প্রায় অর্ধেক মেয়েই উপরে রয়ে গেল। কিন্তু আর শবু দু জনেই নীচে নামার দলে।

লিফট নীচে নেমে চলল অন্ধকারের মধ্যে—চারদিকে কিছু দেখা যায় না। লিফট থেকে বেরিয়ে দেখা গেল মাথায় টর্চ জ্বালিয়ে হাতে সেফটিল্যাম্প নিয়ে কিছু লোক আগে থেকে প্রস্তুত ওদের জন্য। সকলে তাদের পিছন পিছন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গের দেওয়ালে কিছুটা দূরে দূরে সেফটিল্যাম্প ঝুলছে। কোথাও পাশের দেওয়াল থেকে অল্পস্বল্প জল চুঁইয়ে পড়ছে। সকলে ভয়ে হাত ধরাধরি করে চলছে। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সবাইকে দূরে দাঁড় করিয়ে দেখান হল কি করে কয়লা কাটা হয়, ড্রিলিং এর সাহায্যে বিস্ফোরক দিয়ে কি ভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়—শব্দে সকলের কানে তালা লাগার উপক্রম হল। নীচে রেল লাইনও দেখা গেল কয়লা নিয়ে যাবার জন্য। সবাই দেখে উপরে উঠে এলে যারা ভয়ে নীচে নামেনি তারা সব শুনে খুব আফশোষ করতে লাগল।

পরে সন্ধ্যার আগ দিয়ে সকলে ক্যাম্পে ফিরে এল। পথে কুলি বস্তির পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেল একখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। ওদের গাড়ীর চালক জানাল, কাল খনিতে এক দুর্ঘটনায় একজন মারা গেছে তিনজন আহত হয়েছে। তাদেরই আত্মীয় স্বজনরা কাঁদছে। যারা মারা গেছে বা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে তাদের পরিবারকে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী তার দায়িত্ব শেষ করবে। যাদের পরিবার কোম্পানীর ঘর বা জমিতে আছে তাদেরকে করবে উচ্ছেদ। ইংরেজ রাজত্বে দেশের লোকের জীবনের মূল্য আর কতটুকু ?

বেড়িয়ে আনন্দ করতে এসে সবাই বেদনার স্মৃতি নিয়ে বিষণ্ণ মনে পরদিন বাড়ী রওনা হল।

শবু এবারে ক্লাশ এইটে উঠল—দিদি ক্লাশ টেনে। দিদির পড়াশুনার চাপ বেড়ে গেছে—সামনের বছর ইলেভেনে উঠবে আর তখনই হবে ফাইনাল পরীক্ষা—ম্যাট্রিক। কমকণদির বিয়ে হয়ে গেছে। শবুদের ক্লাশের সুলক্ষণা ও সুভাষিণীরও বিয়ে হয়ে গেল। ওদের খুব কম বয়েসে বিয়ে হয়। বিয়ের পর কমকণদি ও সুলক্ষণা স্কুলে আসা ছেড়ে দিল। সুভাষিণী কিন্তু স্কুলে আসা ছাড়েনি বরং রোজ নতুন নতুন শাড়ী পরে স্কুলে আসে, বিয়ের গল্প করে, বরের কথা বলে। বর থাকে ভুবনেশ্বরে—মাঝে মাঝে বরের চিঠি ক্লাশের

বন্ধুদের পড়ে শোনায়। শবু কিছু বোঝে, আবার অনেক জিনিষ বুঝতে পারে না। তবু মনে নেশা লাগার মত একটা ঘোর লাগে।

ক্লাশ এইটে উঠে সুনন্দা কটকে চলে গেছে—সেখানে স্কুলে পড়বে আর সেখানে সব বড় বড় ওস্তাদ আছেন তাঁদের কাছে গান শিখবে। গানই তার ধ্যান জ্ঞান, জীবনের ধ্রুবতারা। সুভাষিণী এখন ক্লাশের মধ্যে গানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—বিয়ের আনন্দে ডগমগ হয়ে থেকে থেকে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে। শবুর কিন্তু একটা আশ্চর্য্য লাগে। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হয়ে থেকে ওর স্কুলে মাইনে দিতে হয় না—কি যেন একটা ফী বাবদ মাসে মাসে শুধু দুই আনা দিতে হয়। কেন এমন হল তা সে জানেনা—অথচ দিদির মাইনে এখন মাসে সাড়ে তিন টাকা। শুনেছে, বাবার আয় কম, ইনকাম ট্যাক্স লাগেনা—সেইজন্য শবুর কোন মাইনে লাগেনা। ইনকাম ট্যাক্স কি জিনিষ, তার সঙ্গে শবুর মাইনের কি সম্পর্ক, দিদির কেন মাইনে লাগে—কিছুই বোঝা যায় না।

বাবা কাকারা খেতে বসে বলাবলি করেন, শিগগীরই নাকি দেশ স্বাধীন হচ্ছে। ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তার সঙ্গে নাকি একটা ফ্যাকড়াও আছে—দেশটা দুভাগ হয়ে অপর অংশের নাম হবে পাকিস্তান; সেজন্যই নাকি গত এক বছর ধরে কলকাতা আর সব কোথায় কোথায় দাঙ্গা হয়ে চলেছে, তার মধ্যে পাঞ্জাবের নাম খুব শোনা যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে ছোটকাকার মনে সন্দেহ, বলেন—

'না আঁচালে বিশ্বাস নেই, দেখাই যাক কি হয়।'

সব স্কুলেও এ নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে, হাটে বাজারে ত কথাই নেই। কিঙ্কু বলল—

'যাক বাবা, বাঁচা যাবে। তখন আর বন্দেমাতরম্ বললে লালপাগড়ী পুলিশ তেড়ে আসবে না।'

স্কুলে স্কুলে সব প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে কি ভাবে চারদিক সাজানো হবে। 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা' গানের রিহার্সাল চলছে, প্রভাত-ফেরী হবে, পতাকা উড়ানো হবে লম্বা বাঁশের মাথায়, স্কুলে খাওয়া দাওয়া হবে, মেয়েরা সব লেগে গেছে রং বেরং এর কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে কাগজের শিকল, ফুল, পতাকা তৈরী করতে।

সরকারী স্কুল—তাই হেডমিষ্ট্রেস একটু বেশী সাবধানী—শেষ পর্য্যন্ত যদি স্বাধীনতা না হয়। মেয়েদের বললেন—তোমরা যা করার একটু রয়ে সয়ে কর পনরোই আগষ্টের এখনও কটা দিন বাকি। ছাত্রীরা তাতে একটুও দমে

না—তাদের উৎসাহ আরো বেড়ে চলে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রীরা বলেছে, যদি দরকার হয় ঐদিন সবাই মিলে বন্দেমাতরম্ বলে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়বে। উৎসাহে আনন্দে মেয়েরা রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না।

• বাড়ীতে মা ঠাকুমাদের মনেও প্রচণ্ড উৎসাহ, ঠাকুমা বললেন—

'এতদিনে ইংরেজরা এদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পালাবে। অনেক অত্যাচার অবিচারের শেষ হবে।'

মার মনে শুধু একটা দুঃখ, বাপের বাড়ীটা বোধ হয় পাকিস্তান হয়ে যাবে। অত দূরের ভাবনা শবুদের নয়—তারা পনরই আগষ্টের ভোরের জন্য উন্মুখ।

কয়েক দিন পরেই এসে গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত পনরই আগষ্টের সকাল। খুব ভোরে মা কাকীমারা ডেকে দিতেই কিঙ্কু শবু মিতু শ্রীলা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল যে যার স্কুলে যাবে বলে। কিঙ্কু আর শবু দু'জনেই আজ শাড়ী পরেছে, মিতু শ্রীলা ফ্রক। মিতু শ্রীলা বড়মার স্কুলের গাড়ীতে চেপে রওনা হল। কিঙ্কু শবু হাঁটা দিল নিজেদের স্কুলের দিকে।

সকাল সাতটায় মেয়েদের স্কুল থেকে প্রভাত-ফেরী ও মিছিল বের হল, সকলের হাতে কাগজের পতাকা, মুখে বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ ধ্বনি আর দেশাত্মবোধক গান। ক্লাশ হিসেবে ভাগ করে করে দল সাজানো হয়েছে, সামনে আছে সবথেকে নীচু ক্লাশের ছাত্রীরা আর সবার পিছনে ইলেভেনের। প্রত্যেক ক্লাশের ক্লাশ টীচার নিজের নিজের ছাত্রীদের পাশে থেকে পরিচালনা করছেন। বড়দি ও অন্যান্য টীচাররা সবার পিছন পিছন আসছেন।

মিছিল জেলা স্কুল ঘুরে ভাদুরী-লজের পাশ দিয়ে কাছারীর সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করল ডাইনে ঘুরে। ছেলেদের স্কুলের মিছিলে ওরা নিজেদের ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে চলেছে—কদম কদম বাড়ায়ে যা। এক পাশে ডাকঘর আর পাশে সঙ্গীত সম্মিলনীর মাঠ ছাড়িয়ে শাহীর বাজারের মোড় ঘুরে মিছিল আর একদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের স্কুলের দিকে। ডান হাতে গীর্জা—সেখানে খ্রীষ্টানরা যেন একটু মনমরা।

পাশেই শবুদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর ছাদে উড়ছে পতাকা—পাশে দাঁড়িয়ে বড়কাকা ছোটকাকা পাঁচুকাকা রামুদা, ঠাকুমা, মা কাকীমা—এমন কি পিটারও কার্নিসের উপর দু পা তুলে মাথা উঁচু করে আছে—সবার দৃষ্টি মিছিলের দিকে। বাবাও তাঁর ডিস্পেনসারী যাবার জন্য খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে একেবারে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিঙ্কু শবুদের

উৎসাহ প্রচণ্ড বেড়ে গেল—আরো জোরে জোরে 'জয়হিন্দ' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে পতাকা নাড়তে নাড়তে মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

স্কুলে পৌঁছে সামান্য একটু বক্তৃতা হল, তারপর প্যাকেটের খাবার খেয়ে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরে চলল। শবুর এ সময় হঠাৎই মনে পড়ে গেল তালচেরের সেই হতভাগ্য শ্রমিকদের কথা। এখন নিশ্চয়ই তারা সুবিচার পাবে—ঠাকুমা বলছিলেন, সব অবিচারের অবসান হবে—স্কুলের বড়দিও তাঁর বক্তৃতায় সে কথা বলছিলেন।

স্বাধীনতার প্রথম প্রাপ্তি হিসেবে শহরে প্রথম কলেজ চালু হল—সরকারী কলেজ—কলেজ বসছে আপাততঃ সরকারী হাইস্কুলের বিল্ডিংএ মর্নিং শিফটে।

আট

আরো কয়েকটা মাস কেটে গেছে। স্বাধীনতার আনন্দ উৎসাহ থিতিয়ে এসেছে। বরং একটা আঘাতে সারা দেশ যেন কেঁপে উঠল। গান্ধীজী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাঁর চিতাভস্ম অনেক জায়গার মত এই শহরেও এনে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে—তৈরী হচ্ছে গান্ধীঘাট। গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে মনের দুঃখে বাবা গিরিনবাবু একদিন উপোস করে-ছিলেন। বাবা বলছিলেন—

'যীশুখৃষ্টের পর এত বড় মানুষ আর পৃথিবীতে জন্মায় নি।'

ছোটবেলা থেকেই শবুরা বাবাকে মোটা খদ্দরের পোষাক পরতে দেখেছে। গান্ধীজীর মৃত্যুতে সবাই মর্মাহত।

বড়কাকা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। তাঁর অসুখের কথা বিবেচনা করে তাঁকে নিজের শহরেই অফিসের কাজ দেওয়া হয়েছে। ফলে সংসারে একটু সাশ্রয় হচ্ছে। গিরিনবাবুর হোমিওপ্যাথিতেও আরো কিছু উন্নতি হয়েছে,—আয় বেড়েছে।

কিন্তু ছোটকাকা এখন প্রায় বেকার। তাঁর ঠিকেদারীর কাজে ভীষণ মন্দা চলছে। এদিকে সংসার বাড়ছে। ঘরে দু দুটো মেয়ে—শ্রীলা আর এলা। যুদ্ধ শেষ, দেশে বেকারী বাড়ছে। দেশ স্বাধীন হয়েও তাঁর কোন সুবিধে হয়নি। মনের দুঃখে এতদিনের শখের মোটর সাইকেলটা তিনি বিক্রি করে

দিয়েছেন। এখন তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন একটা চাকরি যোগাড় করতে।

দিল্লী থেকে ভারত সরকারের এক বড় ইঞ্জিনীয়ার এসেছেন শহরে। খবর পেয়ে অবিনাশবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটা কাজের জন্য অনুরোধ জানালেন।

সব শুনে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বললেন—'সে কি মশাই, আপনি বি. ই. পাশ ইঞ্জিনীয়ার, অথচ চাকরি পাচ্ছেন না! আশ্চর্য্য! যাই হোক, আপনার দরখাস্তখানা নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে দেখি আপনার জন্য কি করতে পারি। তবে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।'

অবিনাশ বাবু ভদ্রলোকের সহৃদয়তায় কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার জানিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এখন তিনি একটা চাকরির জন্য মরীয়া।

এদিকে দিদি কিন্নু ক্লাশ ইলেভেনে উঠেছে, শবুর এখন ক্লাশ নাইন। দিদি সামনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর শবুর নিজের অগোচরে তার শরীরে যে কাসের প্রস্তুতি চলেছে সে কথা শবু জানে না।

আষাঢ়ের রথ শেষ হয়ে গিয়ে এক পড়ন্ত বিকেলে বাড়ীর পাশের বালির ঢিবিতে খেলাঘরের বন্ধুরা সব জড়ো হয়েছে। শুরু হয়েছে দৌড়াদৌড়ি ছুটো-ছুটি। শবু কিছুক্ষণ একটানা স্কিপিং করে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে, এবার সে ছুটোছুটিতে যোগ দিয়েছে। দিদি কিন্নু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছে আর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে। হঠাৎ দিদি ছুটে এসে শবুর হাত ধরে বলল—

'শিগগীর বাড়ীর ভিতর আয়।'

শবু অবাক হয়ে বলল—

'কেন? কি হয়েছে?' সন্ধ্যে এখন তেমন ঘোর হয়নি, এখনই বাড়ী যেতে বলছে কেন?

কিন্নু বলল—'পরে বলছি, আগে আয়।' শবুকে প্রায় টানতে টানতে মার কাছে নিয়ে হাজির করে বলল—

'মা, শবুকে দেখ।'

এক কথাতেই মা বুঝে গেলেন—এই আশঙ্কাই তিনি করছিলেন সবসময়। সেই জন্য কিন্নুকে বলেছিলেন সব সময় ওকে চোখে চোখে রাখতে—শবুত আবার যা বোকা, কোথায় কি অবস্থায় পড়ে আর কি করে বসে।

ব্যাপারটা বুঝতে শবুর সময় লাগে। কিছুটা বুঝে আর বাকিটা না বুঝে ভয়ে কাঁপতে থাকে, লজ্জায় মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। মা কাকীমা নানা উপদেশ দিয়ে ওর ভয় কমাতে লাগলেন। কিন্তু লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কারো দিকে তাকাতে পারছে না, দুচোখ দিয়ে অবিরত শুধু জল গড়িয়ে পড়ছে—সারা অঙ্গে শাড়ী জড়িয়েও বুঝি সে লজ্জা ঢাকা দেওয়া যায় না। কাতর চোখে শবু দিদির দিকে তাকাল—দিদিকে এখন খুব কাছের মানুষ মনে হচ্ছে। শবু যেন হঠাৎই বড় হয়ে গেল।

শবু ও তার বন্ধু হীরা দুজনই এখন বয়ঃসন্ধিক্ষণে। কৈশোরের চাপল্য ধীরে ধীরে কমে আসছে। শবু এখন মাথায় অনেক বড় হয়েছে—হীরাকে অনেকটাই ছাডিয়ে গেছে। আগে হীরার মা পদ্মিনী দেবীকে বলতেন—

'দেখছেন দিদি, হীরা যেন দিনদিন তালগাছ হয়ে উঠছে। শবুকে ওর ছোট বোন মনে হয়।'

এককালে হীরাকে শবুর চাইতে মাথায় বড়ই দেখাত। কিন্তু এখন শবু সেই হীরাকে ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে গেছে। হীরা এখনও বেঁটেই রয়েছে, ছোট-খুকীর মত জোড়া বিনুনী কাঁধের দুপাশে দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়—দেহের পরিবর্তনের গুণে তাকে যেন আরো বেঁটে দেখায়।

আর শবু যেমন মাথায় বেড়েছে তেমনি তার একরাশ চুল কোমর ছাড়িয়ে নীচে নেমে গেছে। অল্প ঢেউ খেলানো চুলে একটি লম্বাবেণী দোলে তার পিঠে। ছোটবেলা থেকেই একমাথা ঝাঁকড়া চুলের জন্য সে সবার আদর কেড়েছে। এখন সে চুলের জট ছাড়াতে, বিনুনী গাঁথতে মা কাকীমারা সহজে অতবড় চুলের গোছা বাগে আনতে পারেন না। মা শবুর চুল বেঁধে, পাঁচগুছি সাতগুছি বিনুনী গেঁথে মুখ মুছিয়ে কপালে একটা টিপ পরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ছেড়ে দেন। কোন প্রসাধন লাগে না। এই টুকুতেই তাকে অপরূপ দেখায়। সুন্দর মুখ, ধনুকের মত টানা দুটি ভুরু, ভাসা ভাসা চোখ দুটি সহজেই সকলের নজরে পড়ে।

মার আর কোন কাজে ভুল হলেও রোজ বিকেলে শবুকে একবার সাজাতে কখন ভুল হয়না। নিজের বয়েস হচ্ছে, এখন আর নিজের সাজগোজ মানায় না। তাই মা শবুর দর্পণে রোজ নিজেকে দেখেন, নিজেকে আবিষ্কার করেন, ফিরে পান নিজের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি। এই বয়সেই ত তিনি বিয়ে হয়ে এসেছিলেন এসংসারে। শবুকে দেখে ঠাকুমারও বোধ হয় সেই কথা

মনে হয়। টিপ পরানো হয়ে গেলে নাতনীর রূপ দেখে খুশী হয়ে বলে ওঠেন—

'এ রূপসী যার ঘর আলো করবে সে বেচারী ভাগ্যবান, এই সোনার প্রতিমাকে সে মাথায় করে রাখবে, বলবে—দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

ঠাকুমা মনের আনন্দে কবি জয়দেব আওড়ান। শুনে মার মনেও আনন্দের শিহরণ জাগে। শবু যে একান্তভাবে তাঁরই প্রতিচ্ছবি। সে সারাজীবন সকলের স্নেহভালবাসা পাবে তাই শুধু তিনি চান। আর শবু?

শবু ঠাকুমার কথায় লজ্জায় রাঙা হয়ে পিঠের লম্বা বেণী দুলিয়ে তার ছিপ-ছিপে দেহখানি নিয়ে ছুটে চলে যায় বান্ধবী হীরার সন্ধানে। ঠিক যেমন উচ্ছ্বসিত এক হরিণী মনের আনন্দে নৃত্য করে ছুটে বেড়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশে। হীরাও তখন খোঁজে শবুকে। দুজনেরই দুজনকে এখন খুব প্রয়োজন—না হলে মনের কথা, ভাবের কথা বলবে কাকে? তারা দুটিতে গিয়ে বসে বালির ঢিবিটার এক প্রান্তে, কোলাহলমুখর অন্য শিশু ভাইবোনদের থেকে একটু তফাতে।

হীরা জিজ্ঞেস করে—

'শবু, তুই অমন করে ছুটে এলি কেন? তোর মুখটাও লাল দেখাচ্ছে।'

শবু বলল—'জানিস হীরা, আমার ঠাকুমা না, ভারি ইয়ে। একটু সাজলে গুজলে সবার সামনেই বলবে, আমার রূপ দেখে নাকি আমার বর আমাকে রোজ প্রণাম করবে। এমন লজ্জা করে না!'

হীরা বলল—'তা ভাই ঠিকই বলেছে। তোর রূপ দেখে আমারই এত লোভ হয়। যদি ছেলে হতাম তবে রোজ তোকে একটা করে চুমু খেতাম।

চুমুর কথায় শবু আরও আরক্ত হল। বলল—'তুইও একটা কম নোস।' পরে একটু ভেবে আবার বলল—'আচ্ছা হীরা, তোর কি রকম বর পছন্দ?'

হীরা বলল—'আমার বর হবে জজ বা হাকিম। থাকবে একটা বিরাট বাংলো বাড়ী। চাপরাশি, আর্দালি, বেয়ারারা দুবেলা সেলাম করবে। আমার ঠাকুর্দা জ্যেঠারা সবাই জজ। তোর কি রকম বর পছন্দ, শবু?'

শবু দূরে বিকেলের পড়ন্ত সূর্য্যের রক্তচ্ছটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল—

'কি জানি ভাই। তবে ওসব গোমড়া মুখো হাকিম—হুকুম আমার ভাল লাগে না। বর হবে বেশ হাসিখুশী—সারা দিন বাবা মার মত আমার সঙ্গে কথা বলবে, গল্প করবে।'

হীরা ঠাট্টা করল—'তুই নিজে এত কম কথা বলিস, তোর সঙ্গে কে সারা-দিন গল্প করবে?'

'সব কথাই কি মুখে বলতে হবে?' শবু পাল্টা প্রশ্ন করল।

'না হলে গল্প জমবে কি করে?' পাল্টা প্রশ্ন হীরারও।

এক সময় হীরা আবার বলল—'শবু তোর কোন ফুল বেশী পছন্দ? আমার কিন্তু পছন্দ গোলাপ ফুল। বাড়ীর লনে সারি সারি গোলাপ গাছে গোলাপ ফুটে থাকবে—কি সুন্দর লাগবে দেখতে।'

শবু ভেবে বলল—'আমার কিন্তু ভাল লাগে শিউলি ফুল। কি সুন্দর গন্ধ, শরৎকালে সকাল বেলা কি সুন্দর গাছতলাটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে থাকে। অবশ্য গোলাপ ফুলও খুব ভাল। গোলাপ ও পদ্মের তুলনা হয়না।'

হীরা বলল—'শিউলি ফুল বড় ক্ষণস্থায়ী—সন্ধ্যের পর ফুটে সকাল বেলাতেই ঝরে যায়।'

শবু বলল—'সেইত ভাল। ফুল ফুটল গন্ধ ছড়ালো তার পরে টুপ করে ঝরে পড়ল। গাছে ফুটে থেকে থেকে শুকিয়ে যাবে, আমার দেখতে ভাল লাগেনা। আর শিউলির কেমন মন মাতানো গন্ধ, বল।'

খেলা—শ্রান্ত ছোট ভাইবোনেরা একে একে এসে শবু ও হীরার চার পাশে বসে পড়ে। এতক্ষণ দুই বন্ধুতে বসে সব অপ্রয়োজনীয় কথা বলছিল, স্বপ্নের ভবিষ্যতের ছবি আঁকছিল। ভাইবোনেরা এসে পড়াতে ওদের কথায় ছেদ পড়ল। ছোট ভাই বোন পরিবৃত হয়ে দুজনে বসে আছে, সমুদ্রের হাওয়ায় ওদের পোষাক উড়ছে, দূর থেকে মনে হয় যেন নীরস বালির বুকে রং বেরংয়ের একরাশ ফুল রূপের বাহার তুলে হাওয়ায় দুলছে।

মিতু জিজ্ঞেস করল—'মেজদি, তোরা এতক্ষণ কি গল্প করছিলিরে?'

শবু বলল—'শিউলি ফুলের কথা। তোরা দেখেছিস?'

'হ্যাঁ'—একসঙ্গে তিন চারটে শিশুকণ্ঠে আওয়াজ উঠল।

'শিউলি গাছ দেখেছিস?'

এবার সব শিশু কণ্ঠ নীরব।

শবু বলল—'রানীর বাগানে আছে, একদিন তোদের দেখাব।'

এরপর সবাই সবাইকে গাছ চেনাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাউ আর নারকেল গাছ এখানে অজস্র। এ ওকে আঙুল তুলে আশপাশের গাছ দেখাচ্ছে আর বলছে—এটা আম গাছ, ওটা কাঁঠাল, ওটা জাম, সেটা তেঁতুল, এটা টগর, ওটা চাঁপা। একটা গাছের বেলায় সবাই আটকে গেল। হীরা চিনিয়ে দিল—ওটা মহুয়া গাছ। মহুয়া থেকে নাকি মদ তৈরী হয়। শবু বলল, 'মদ খেলে মানুষ মাতাল হয়—মাতাল হলে মানুষ কি রকম করে

দেখেছিস ?' গতবারের নাটকে যে মাতালের পার্ট করেছিল তার চেহারা কল্পনা করে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

বাড়ীর দরজা থেকে কিছু ডাকল—'এই, তোরা সব বাড়ী আয়, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোটরা যে যার বাড়ীর দিকে দৌড় লাগালো। সত্যিইত, এতক্ষণ ওদের খেয়ালই ছিলনা, ঘরে ঘরে সব প্রদীপের আলো জ্বলে উঠেছে। শবু আর হীরা উঠে দাঁড়িয়ে একটু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হেসে নিজেদের বাড়ীর দিকে ছুটে চলল ছোট ভাইবোনদের দেখাদেখি। ওরা এখনও তাদের কৈশোর ত্যাগ করতে পারেনি—গতি হয়নি মন্থর।

বাড়ীর ভিতর আসতে দিদি জিজ্ঞেস করল—'তোরা সব কি কথা নিয়ে অত হাসছিলি ?'

শবু বলল—'এমনি সব কথা।'

ঠাকুমা ফোড়ন কাটলেন—'ছোটতে ছোটতে দেখা হলে কথায় কথায় হাসি, বড়তে বড়তে দেখা হলে কথায় কথায় কাশি।'

শবু হাঁফ ছেড়ে কুয়োতলায় হাত পা ধুতে গেল—ভাগ্যিস ঠাকুমা আবার সে রকম কিছু বলে ফেলেনি।

দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়। শিশুর সরলতা, কৈশোরের চাপল্য একটু একটু করে দূরে সরে যায়। শৈশবের কত তুচ্ছ পাওয়া না পাওয়ার খেলাঘরের স্মৃতি মনে এলে এখন হাসি পায়। কৈশোরের খেলাধুলা, ছোটাছুটি আর ভয় ভাবনার কথা মনে জাগায় এক অদ্ভুত আকর্ষণ, মমতা—যেন সগু ছোট হয়ে যাওয়া শখের ফ্রকটা ছেড়ে ফেলার মত বিচ্ছেদের বেদনা। মন এখন ভাবতে শেখে, ভাবতে চায়। কঠিন বাস্তবকে দূরে ঠেলে রেখে ভাবনার রথ পাখা মেলে শুধুই উড়ে যেতে চায় দিক হতে দিগন্তরে। কত কল্পনা, কত রোমাঞ্চ, কত রং, কত ছবি, কত আশা নানা রঙের প্রজাপতির মত মনের চারপাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। এতদিন শবু শুধু খেলা করেছে, দেখে গেছে আর মনের স্মৃতি কোঠায় সঞ্চয় করে গেছে বহু ঘটনার মণিমুক্তো আর কয়েক ফোঁটা চোখের জলও। এখন ভাবতে শিখে শবুর মন শুধু অতীত শৈশব কৈশোরের স্মৃতিতেই আবদ্ধ থাকতে চায় না। মন চলে যায় কল্পনার রাজ্যে—যেখানে সে নিজেকে সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দুতে বসিয়ে চারপাশে নিজের মনোমত পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলে। তাই এত স্বল্প-ভাষী হয়েও শবু তার বান্ধবীর সঙ্গে করে কিছু প্রগলভতা। মন খুলে হাসে,

পাখীদের কাকলিতে কান পাতে, ফুলের সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, আকাশের চাঁদ দেখে পুলকে শিহরিত হয়, ভোরের সূর্য্যের কাছে পায় নতুন দিনের আহ্বান। দেহে মনে যৌবনের ঢেউ জাগে। আধফোটা পদ্মকলির মত একদিকে সে বিকাশোন্মুখ—ফুটে উঠতে চায় সৌন্দর্য্যে সৌরভে রূপে লাবণ্যে, অন্যদিকে নিজ দেহের পরিবর্তনকে অপরিসীম লজ্জায় ঢেকে রাখতে চায় সকলের দৃষ্টি থেকে। কি করে নিজেকে আড়াল করবে সেই তার দিন-রাত্রির লাজুক ভাবনা।

নয়

বড়দিনের ছুটির পর আবার স্কুল খুলেছে। দুদিন পরে শবু একাই স্কুল থেকে ফিরেছে। দিদির কোচিং ক্লাশ আছে। বাবা ডিস্পেন্সারীতে বেরিয়ে গেছেন; ছোটকাকা বাড়ীতে নেই, পাঁচুকাকাও না। মা কাকীমা দুজনেরই শরীর-খারাপ, বেশী কাজ কাম করে না। বড়কাকা একটু যেন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলেন। বাড়ীর ঠাকুরকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'মা, ঠাকুর কোথায়, তাকে ত দেখতে পাচ্ছিনা?'

ঠাকুমা বললেন—'একটু কাজে গেছে, কেন?'

হৈমবাবু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—'বৌদিদের ত আবার শরীর খারাপ, এক কাপ চা হলে ভাল হ'ত।'

মহামুস্কিল, ঠাকুমা এবেলা আমিষ ঘরের কিছু ছোঁবেন না—আর চায়ের সরঞ্জাম সব আমিষঘরেই। শেষে হৈমবাবু আবার বললেন—

'থাক না হয়, দোকান থেকেই খেয়ে আসি।'

শবু তখন সবেমাত্র স্কুলের বইখাতা রেখে কুয়োতলা থেকে হাত পা ধুয়ে এসেছে, স্কুলের কাপড়টাও ছাড়া হয়নি। বলল—

'আমি চা করে দিচ্ছি, বড়কাকা।'

তিনি বললেন—'তুই কি পারবি? বড়টি গেল কোথায়?'

শবু বলল—'দিদির কোচিং ক্লাশ আছে। তুমি বস।'

বড়কাকা বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলেন। শবু রান্নাঘরে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিল। জল ফুটতে শুরু করেছে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকের উপর চায়ের কৌটোর দিকে হাত বাড়াল। হঠাৎ শরীরে আগুনের আঁচ

লাগতেই ফিরে তাকিয়ে দেখে অসাবধান আঁচলের এক প্রান্ত জ্বলে উঠেছে স্টোভের আগুনের ছোঁয়া পেয়ে। মুহূর্তের মধ্যে একপাকে শরীরের কাপড়টা খুলে দূরে ছুড়ে দিয়ে 'মা গো' বলে এক চীৎকার করে মার কাছে ছুটে গেল।

শবুর ঐ রকম আলুথালু বেশ দেখে খাট থেকে ত্রস্তে নেমে মা শবুকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চীৎকার শুনে ঠাকুমা কাকীমা ছুটে এলেন। বাইরের ঘর থেকে বড়কাকা ভিতরের বারান্দায় এসে রান্নাঘরে আগুন আর ধোঁয়া দেখে একগাছা লাঠি নিয়ে পিটিয়ে আগুন নেভালেন। তারপর স্টোভ নিভিয়ে রান্নার বালতির জল ঢেলে দিলেন আধপোড়া শাড়ীখানির উপর। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে শবু মার সঙ্গে ঘরের বাইরে এল। ডাক্তার বড়কাকা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন শরীরের কোথায় কোথায় পুড়ে গেছে। কি আশ্চর্য্য! কোথাও এতটুকু পোড়ার চিহ্ন নেই, একটা ফোস্কাও পড়েনি। বড়কাকা অপ্রতিভের মত বললেন—

'অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, শুধু শাড়ীর আঁচলের দিকটা খানিক পুড়ে গেছে আগুনে। নিভিয়ে দিয়েছি।'

ঠাকুমা কাকীমাও খুঁটিয়ে শবুর দেহ পরীক্ষা করলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুমা বললেন—

'মস্ত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল।'

মা কেঁদে বললেন—'আমার তিন কড়ির ধনকে মা ষষ্ঠীই রক্ষা করেছেন। জানিনা ওর কপালে আরো কত কি আছে।' বলে সবলে আবার শবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় বার বার চুমু খেতে আর কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুমা কাকীমার চোখেও জল এল। নিজের অসাবধানতার লজ্জায় শবুও কাঁদছে। বড়কাকা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ফরাসে সটান শুয়ে পড়লেন— চা খাওয়া আর হল না।

খবর পেয়ে খেলাঘরের শিশুভাই-বোন ও বন্ধুরা খেলা ফেলে ছুটে এসে শবুর চারপাশে ভিড় করল—ওদের খেলার সাথী পিটারও এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর অল্প অল্প লেজ নাড়ছে। ভাই-বোনেরা সব হাঁ করে ঠাকুমার মুখ থেকে আগুন লাগার বর্ণনা শুনে বড় বড় চোখ করে মেজদির দিকে তাকাতে লাগল। কেউ কেউ আদর করে মেজদির গায়ে পিঠে হাত বুলাল। কানাই সোজা মেজদির কোলেই উঠে বসল। এতক্ষণে খেয়াল হল শবু শুধু সায়া ব্লাউজ পরে আছে। তাড়াতাড়ি কানাইকে কোলে করে শবু ঘরে গেল শাড়ী পরতে।

বাবা গিরিনবাবু বাড়ী ফিরলেন রাত আটটার পর। নিয়মমত ভিতরের বারান্দায় সকলের খাবার জায়গা করা হয়েছে। বাড়ীতে বিদ্যুতের চল নেই। দু তিনটে হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়ে খাবার জায়গায় আলোর ব্যবস্থা। শোবার ঘরে সাধারণত তেলের প্রদীপ জ্বলে আর রান্না ঘরে কুপি। লণ্ঠনের ব্যবহার বৈঠকখানা ঘরে আর পড়াশোনার জায়গায়। বাবা বাড়ীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ুয়াদের পড়ায় ইতি। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া।

সবাই এসে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ল। একে একে বাবা-কাকারা হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের খাবার আসনে বসলেন। ঠাকুর সবাইকে খাবার পরিবেশন করছে। ঠাকুমা অদূরে পিঁড়ি পেতে বসে সব দেখাশোনা করছেন। মা কাকীমাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি গুটিশুটি মেরে গায়ে চাদর জড়িয়ে বসলেন ঠাকুমার পাশে।

খেতে বসেই বড়কাকা বললেন—'জানো দাদা, আজকে কি কাণ্ড হয়েছিল শবুর?'

শুনেই শবুর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল—বড়কাকা কিই বা বলেন আর বাবা না জানি কি মন্তব্য করেন।

গিরিনবাবু খুব স্বাভাবিক-ভাবে বললেন—'হ্যাঁ, বাড়ীতে ফিরে তোমাদের বৌদির মুখে কিছুটা শুনলাম।'

বড়কাকা তখন সমস্ত ব্যাপারটার বিবরণ দিয়ে শেষে উচ্ছ্বসিত হয়েবললেন—

'বুঝলে দাদা, শবুর বুদ্ধির তুলনা হয়না। আমি ঐ অবস্থায় পড়লে হয়ত শুধু ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি করে আধপোড়া হয়ে যেতাম তবু আগুন-লাগা কাপড় খুলে ফেলে পালাবার কথা ভাবতেই পারতাম না। ও কেমন বুদ্ধি করে শাড়ী ফেলে পালিয়ে এল, গায়ে একটা ফোস্কাও পড়ল না।'

ছোটকাকা স্মরণ করিয়ে দিলেন—'মেজদা, কিছুদিন আগে তুমিই বলেছিলে, শবুটা বোকার বোকা।'

সঙ্গে সঙ্গে বড়কাকা বললেন—'আই উইথড্র—কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। বুদ্ধির কাজকে বুদ্ধির কাজ নিশ্চয়ই বলব, আলবৎ!'

পাঁচুকাকা বললেন—'সেদিন আমি মিতুর বুদ্ধির প্রশংসা করেছিলাম, এখন দেখছি শবুরই উপস্থিত বুদ্ধি বেশী।'

গিরিনবাবু ধীরস্থির ভাবে বললেন—

'শবুর বুদ্ধি চিরকালই পরিষ্কার, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে ওর কোন কূট বুদ্ধি নেই।'

বাবার মুখে শবু প্রথম নিজের প্রশংসা শুনল—যেটা ওর ভাই বোনদের কারো কাছেই একান্ত দুর্লভ। খেতে খেতে লজ্জায় শবুর মাথা বুঝি খাবারের থালার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। মেয়ের প্রশংসা শুনে মার বুক গর্বে আনন্দে ভরে ওঠে।

বুদ্ধি হোক আর যাই হোক—শবুর জীবনে যে নবজন্ম ঘটে গেল এ বিষয়ে মা ঠাকুমা এক মত। সে যে স্বল্পায়ু। মাত্র চৌদ্দতে পা দিয়েই এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল! মা ষষ্ঠীর কৃপায় অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

দশ

এবারে শোনা যাচ্ছে বড়কাকা নাকি বিয়েতে মত দিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় চিঠিপত্রে যোগাযোগ হচ্ছে। ঠাকুমা বলেছেন—

'বড়বৌমা ছোটবৌমা দুজনেরই সন্তান হবে। তারা খালাস হয়ে নিক আগে। তাছাড়া হৈমর বয়স ত একটু বেশীই হল। সেরকম বেশী বয়সের উপযুক্ত মেয়ে পেতে সময় লাগবে।'

বাবা বলেছেন—'কোন কিছু গোপন না করে সঠিক বয়স জানিয়ে যদি বিয়ের যোগাড হয় ভাল। না হলে আমাকে এসবের মধ্যে কেউ ডাকবেনা।'

ঠাকুমা বলছেন—'তাই হবে। হৈমর বয়স ত প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ হল।'

কদিন পরে বাড়ীতে এল একখানি সরকারী চিঠি। চিঠির বক্তব্য—পাশের সরকারী মেয়ে স্কুলের পরিসর বাড়ানো হবে, তার জন্য আশেপাশের লাগা সরকারের খাস জমি খালি করতে হবে, যেহেতু ৺মহিম কান্তি মৈত্র মহাশয় খাস মহলের জমি লীজ নিয়ে বসতবাটি তৈরী করেছিলেন এবং সেই জমি মেয়ে-স্কুলের সংলগ্ন সেহেতু সরকারী নির্দেশ এই যে পত্রপ্রাপ্তির তিন-মাসের মধ্যে মৈত্র মহাশয়ের পরিবারস্থ সকলকে অস্থাবর সম্পত্তি সহ অন্যত্র চলে যেতে হবে, অন্যথায় আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে—পরে উপযুক্ত সময়ে পরিত্যক্ত বাড়িঘরের জন্য সরকার নির্ধারিত পরিমান অর্থে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে সমস্ত পরিবারটি একেবারে হতবাক। মৈত্র গৃহিণী বিধবা নির্মরিণী দেবী কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—

'হায় হায়, আমাদের কি সর্বনাশ হল! মানুষটা সরকারের কাজ করতে গিয়ে অপঘাতে প্রাণ হারালো, তার কি এই প্রতিদান! দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে, তবু এই অবিচার চলবে!'

গিরিনবাবু চিরকালই একটু নির্বিরোধী মানুষ। বললেন—

'মা, উতলা হোয়ো না। আমার ত মনে হয় আইন সরকারের পক্ষে। স্কুলের দু পাশ দিয়ে সরকারী রাস্তা, আর এদিকটাতে রয়েছে চার্চ আর আমাদের মত কয়েকখানা বাড়ী যা সবই তৈরি হয়েছে সরকারের খাস মহলের জমিতে। লীজের শর্ত অনুযায়ী আর স্কুলের প্রয়োজনে সে জমি দখল করতেই পারে।'

ঠাকুমা বললেন—'তবে আমরা এতগুলো প্রাণী মাথা গুঁজবো কোথায়? দু দুটো বৌ ঘরে পোয়াতী, তাদের হাত ধরে কি পথে দাঁড় করাব? এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

এই দুঃসময়েও হৈমবাবু রসিকতা করতে ছাড়লেন না, বললেন—

'বৌদি, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে আপনি আপনার বাপের বাড়ী হারিয়েছেন আগের বছর দাঙ্গা লেগে আপনার যাওয়া হল না, এখন ত পাকিস্তান হয়ে সে যাওয়া চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এবার আমাদের বাপের বাড়ীও নয়া পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে, আমরাও রিফিউজী হব।'

রিফিউজী কথাটা হিন্দুস্থান—পাকিস্তানের দৌলতে নতুন চালু হয়েছে।

অবিনাশবাবু তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

'হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আর স্বাধীনতা হয়ে ত খুব লাভ হয়েছে। একদিকে দলে দলে লোক উদ্বাস্তু হয়ে সব হারিয়ে শুধুমাত্র প্রাণ হাতে করে এদেশে চলে আসছে। তারা থাকবে কোথায়, খাবে কি, করবে কি—কে দেখে। এদিকে ঘরে ঘরে লোকে বেকার হয়ে বসে আছে—কোথায় চাকরি, কোথায় কি? এ শুধু উপর উপর স্বাধীনতা, আমরা যে গোলাম সে গোলামই। আমাদেরকে নোটিশ ধরাল, ঐ গীর্জাটাকে দিক দেখি। না, ওটা যে খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান—রাজার জাত—গোলামী মনোবৃত্তি এখনও আমাদের রক্তে।'

ঠাকুমা আবার কপাল চাপড়ে কেঁদে বললেন—'ওরে গিরিন, ওসব কথা আমি জানিনা। আমার স্বামীর ভিটে, তোদের বাপের নিজে হাতে গড়া বাড়ী তোরা রক্ষা কর। ওনার বন্ধু হিতেনবাবুর কাছে যা—তিনি উকিল মানুষ, নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় করতে পারবেন।'

গিরিনবাবু মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ঠিক আছে মা, আমি এখনই

হিতেনবাবুর কাছে যাচ্ছি। বাড়ীঘরের মামলা, অবিনাশও আমার সঙ্গে চলুক।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন।

এ কি বিড়ম্বনা! বাবার নিজে হাতে গড়া বা ড়ী থেকে এক কথায় চলে যেতে হবে? ছেলেদের মনে হয় তাঁরা বুঝি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হতে চলেছেন। পিতার মত অভিভাবক আর মাথার উপর ঘরের ছাদ বা চালা ত একই কথা।

এ দিকে আশঙ্কায় মেয়ে মহলের বুক কাঁপছে। বিপদের পর বিপদ কি লেগেই থাকবে? সেদিন শ্বশুর মশাই গেলেন গেলেন কর্ত্তামা, এতবড় একটা যুদ্ধ গেল, বড়ঠাকুর বাৎসরাধিককাল অসুস্থ হয়ে রইলেন, ছোটঠাকুর এখনও বেকার—এবার এসেছে ঘর ছাড়ার নোটিশ। আর কত সহ্য হয়। এখানেই কি বিপদের শেষ নাকি আরো কত বিপদ আসবে—কে জানে? নিজেরা যাবেন কোথায়, এতগুলি সন্তানকে মানুষ করবেন কি করে, পেটে যারা আছে তাদের বাঁচাবেন কি করে ভাবতে ভাবতে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়লেন। অসীম অন্ধকারে একবিন্দু আলোর মত এখন একমাত্র আশা হিতেনবাবু যদি কোন পথ দেখাতে পারেন।

কিন্তু শবু এখন সব বুঝতে পারে। ওরা জানল ওদের আজন্ম আশ্রয় দাদুর তৈরী এই বাড়ী ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। এ বাড়ী আর ওদের থাকবে না। কোথায় যাবে? শেষে কি আশৈশব পরিচিতি এই শহর ছেড়েই ওদের চলে যেতে হবে? শুকনো মুখে দুই বোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কারো মুখে কোন কথা সরেনা—নেই কোন সান্ত্বনার ভাষা। মিতু শ্রীলা নন্দু ফ্যাল ফ্যাল করে সবার মুখের দিকে তাকায়। কানাই আর এলা কিছুই বোঝে না—ওরা একেবারেই শিশু।

কিছুক্ষণ বাদে গিরিনবাবু অবিনাশবাবু ফিরে এলেন। প্রথমেই ঝাঁঝের সুরে অবিনাশবাবু বললেন—

'নাঃ, ওসব আইন ফাইন করে কিছু হবে না।'

সবাই তাকাল গিরিনবাবুর মুখের দিকে। গিরিনবাবু বিমর্ষভাবে বললেন—

'হিতেনবাবু বললেন—কিছু করার নেই। আইন আদালত করেও কিছু লাভ নেই—প্রয়োজনে সরকার ছোট আদালত থেকে হাইকোর্ট এমন কি প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত যেতে পারে। সে টাকার খেলায় তোমার আমার মত গরিব মানুষ একেবারে মারা পড়বে—তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর। পথে আসতে শুনলাম ভূপেন বাবুরা বালির ঢিবির ওপাশে যে বাড়ীতে ভাড়া

থাকেন তার মালিককেও নোটিশ দিয়েছে। তার ওপাশে পানিগ্রাহীরা যে নতুন বাড়ী তৈরী করছে তারাও নোটিশ পেয়েছে। তবে হিতেন বাবু বললেন, আবেদন নিবেদন করে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীদের কথা বলে ছ'মাস ন'মাস সময় চেয়ে নেওয়া যেতে পারে।'

পুত্রবধূদের মুখ চেয়ে নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'তবে কি তাই করাই ঠিক করলি ?'

গিরিনবাবু শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—'না। যখন যেতেই হবে তখন আর আবেদন নিবেদন নয়। যা হয় হোক। এখন থেকেই ভাড়া বাড়ীর খোঁজ করতে হবে।'

গিরিনবাবু আর কোন কথা না বলে ডিস্পেন্সারী চলে গেলেন। তাঁকে সবাই নরম ও শান্ত প্রকৃতির লোক বলেই জানে। তাঁর মধ্যে যে এতখানি সংকল্পের দৃঢ়তা ও তেজস্বীতা আছে কারও জানা ছিল না। কিন্তু শবুরা বাবার মনের জোর দেখে মুগ্ধ। মা কাকীমারা মনে মনে গর্বিত। ঠাকুমা-ও উপযুক্ত মায়ের মত মন্তব্য করলেন—

'সেই ভাল, দয়ার ভিক্ষায় একদিনও নয়। পারলে কদিন আগেই অন্যত্র চলে যাবো।'

বাবা ঠাকুমার কথায় কিন্তু শবু প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ঠিকই ত। তারা কবিতার বইতে পড়েছে 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশির নাহি ভয়।' বাবাকে মনে হয় যেন মস্ত বড় বীর আর ঠাকুমা যেন এক বীরাঙ্গনা। তারা ঠিকই ভাবে। এ ত আর উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া স্বাধীনতা নয়। এ হল আত্মার স্বাধীনতা। আত্মসম্মানের প্রশ্ন।

এগারো

ব্যাপারটা এতদিনের বিশ্বস্ত লোক রামুর মনেও গভীর আঘাত হেনেছে। ভিতরের বারান্দায় সামনে ছোট ভাই বোনদের গোল করে বসিয়ে কানাইকে কোলে করে রামুদা গল্প শোনাচ্ছে—এই বাড়ী তৈরীর ইতিহাস। বড়কাকা ছোটকাকা অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করতে করতে আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় বাড়ীর আনাচে কানাচে জীবনের পুরোনো স্মৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পিটার বিমর্ষ ভাবে উঠোনের মাঝখানে শুয়ে সবার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে।

ঠাকুমা মা কাকীমা বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। সবাই কিন্তু রামুর কথাগুলি উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন। কিছু শবুও রামুদার কাছাকাছি বারান্দায় বসে পড়েছে। রামুদা এতকাল এ সংসারে থেকে ভাল বাংলা বলতে কইতে পারে। রামুদা কানাইলালকে কোলের উপর অল্প দোলাতে দোলাতে বলতে লাগল—

'জানিস দাদু, কর্তামশাই কত কষ্ট করে, কত সাধ করে এই বাড়ী বানিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রথম কাজ নিয়ে এই শহরে আসেন তখনই আমি তাঁর কাজে বহাল হলাম। ক'বছর যেতে বুড়ো কর্তামা, কর্ত্রীঠাকরুন হঠাৎ একদিন গ্রাম থেকে এসে পড়লেন, সঙ্গে তোমাদের বাবা কাকারা।...'

শ্রীলা প্রশ্ন করল—'আর মা, বড়মা?'

রামুদা বলল—'দূর পাগলি, তখন ত তাদের বিয়েই হয়নি—তোমাদের বাবারাই তখন তোমাদের মত ছোট সব। কর্তামশাই তিনভাইকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমি তিনজনকে রোজ হাত ধরে ইস্কুলে নিয়ে যাই নিয়ে আসি। বড়বাবু ত সবার বড়, সে আগে আগে হাঁটে, আমি মেজোবাবু আর ছোটবাবুকে দুহাতে ধরে নিয়ে চলি। মেজোবাবু চিরকালই ভীষণ ছটফটে আর খেয়ালী। যেতে যেতে হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে ঢিল কুড়িয়ে রাস্তার কুকুরকে তাড়া করে, নয়তো প্রজাপতি উড়তে দেখলে তাকে ধরতে ছুটে যায়। তাকে ধরতে আমি ছুটি তার পিছনে।'

নন্দু অসহিষ্ণুভাবে বলল—'বাড়ী তৈরীর কথা বল।' নন্দুর বয়স এখন পাঁচ বছর, কিছুটা বুঝতে শিখেছে, আসন্ন বাড়ী ছাড়ার বেদনার আভাস ওর মনে।

রামুদা বলতে লাগল—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মা ঠাকরুনরা ত এসে পড়লেন। একদিন কর্তাবাবু আমাকে বললেন—এরা সব হঠাৎই এসে পড়ল, খুব তাড়াতাড়ি একটা বাড়ী না বানালেই নয়। সবার আগে চাই এক টুকরো জমি। তুই একটু খোঁজ খবর রাখিস ত রামু, কোথাও কোন জমি বিক্রি হচ্ছে কি না। কত খোঁজ করি—কিন্তু জমি কি আর লজেন্স বিস্কুট যে দোকানে গেলাম আর কিনে নিয়ে এলাম? দু একটা জমির খোঁজ পাই ত সমুদ্র থেকে অনেক দূরে ভিতরের দিকে—কর্তাবাবুর পছন্দ হয় না। ভাল জমি অত তাড়াতাড়ি পাওয়াও যায়না।

'শেষটায় খাসমহলের এই জমিটাই নেওয়া ঠিক করলেন—আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন—নদীর কূলে বাস ভাবনা বারোমাস, সরকার কবে কেড়ে নেয় কে জানে? তখন ঐ মেয়ে ইস্কুল হয়নি, তাই সেকথা

মনেই আসেনি। ছেলেদের ইস্কুল অফিস কাছারী খুব কাছে, শাহীর বাজার-ও মাত্র দু মিনিটের পথ—বেশ নির্জন নিরিবিলি, তাই আর সবদিক থেকেই পছন্দসই। পাশেই খ্রীষ্টানদের গীর্জা তা তাদের থেকে কোন ভয় নেই—কর্তাবাবুরও সরকারী চাকরি।

'শুরু হল বাড়ী তৈরীর কাজ। প্রথম কাজ হল বালি সরানো—ঐ বালির ঢিবিরই একটা অংশ ছিল এই জমি। বালি সরিয়ে জায়গাটা সমান করা হল; কর্তাবাবু নিজে ইঞ্জিনীয়ার—বাড়ীর নক্সা বানিয়ে ফেললেন। আমাকে বললেন—এই দেখ এটা হল আমার শোবার ঘর আর এই তিনটে তিন ছেলের শোবার ঘর, বড় হয়ে বিয়ের পর সব আলাদা ঘর লাগবে ত। ততদিন দেশ থেকে আত্মীয় স্বজনরা এলে থাকতে পারবে। ওপাশে থাকবে বৈঠকখানা ঘর আর মার ঘর, মাঝখানে বাড়ীতে ঢোকা বেরোনোর গেট। পূবে রান্না ঘর ঢেঁকি ঘর তার ওপাশে চালা ঘরে হবে গরুর গোয়াল—কয়েকটা গরু কিনতে হবে—মা, ছেলেরা সব দুধ খাবে। শোবার ও বৈঠকখানা ঘরের দু-পাশ দিয়ে থাকবে লম্বা টানা চওড়া বারান্দা—বাইরের বারান্দায় বসে হাওয়া খাওয়া যাবে. ভিতরের বারান্দায় খাওয়া দাওয়া কাজ কম হবে। গেটের পাশ বেয়ে উঠবে ছাদের সিঁড়ি। ইঞ্জিনীয়ার কর্তাবাবুর সঙ্গে থেকে আমিও ততদিনে বাড়ীর নক্সা অনেকটা বুঝতে শিখে গেছি।

'তারপর আরম্ভ হল বাড়ী তৈরী। ভুবনেশ্বর থেকে পাথর এল, খুরদা থেকে ইট, সম্বলপুর কেওনঝাড় থেকে কাঠ, রাণীগঞ্জের টালি—এছাড়া চুন সুরকি বালি সিমেন্ট ত আছেই। সে এক বিরাট ব্যাপার। কর্তাবাবু সব কাজের দায়িত্ব দিলেন কণ্টাক্টর বন্ধু রাখহরি বাবুকে। কাঠের ব্যাপারে তিনি বন্ধুকে বললেন—বুঝলে রাখহরি, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় কোন লোহার জিনিষ টিকবে না, দুদিনে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাবে। কাঠই হতে হবে লোহার মত শক্ত ও নীরন্ধ্র। তোমার সব জিনিষের দাম আমি পাই পয়সা মিটিয়ে দেব, কিন্তু একটা কাঠও যদি খারাপ হয় বা ঘুণে ধরা হয় তবে কাঠ দিয়েই তোমার মাথা ফাটাবো।

'রাখহরি বাবু বললেন—সে কাঠ দিয়ে আমার মাথা ফাটাতেও পারবে না, মহিম, আমার মাথাও লোহার মত শক্ত। করি ত ঠিকেদারী, আমার মাথা সবাই ফাটায়। এবেলা মিস্ত্রি মজুররা মাথা ফাটায় মজুরীর জন্য ওবেলা সরকারী অফিসার ইঞ্জিনীয়াররা টাকা ফাঁকি দিতে বা আমার টাকায় ভাগ বসাতে মাথায় বাড়ি মারে।

'কর্তাবাবু রাগের ভান করে বললেন—আমিও ত সরকারী ইঞ্জিনীয়ার। আমাকে তুমি কবে ক'পয়সা ভাগ দিয়েছো?

'রাখহরিবাবু বললেন—আহা তোমার কথা উঠছে কেন? তোমার সঙ্গে ত আলাদা সম্পর্ক।

'তা কণ্টাক্টরবাবু ভাল কাঠই দিয়েছিলেন। আজ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পরও নতুনের মত আছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। দিনে পনর বিশ জন মিস্ত্রি মজুর খাটছে, বিশ ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল হচ্ছে, খিলেন করা দরজা জানালা, কড়িবরগা, টালির পেটা ছাদ। সব হয়ে গেলে দরজা জানালা বসল, ঘর বারান্দার মেঝে হল। সেদিন কত পূজা আর্চা করে জাঁকজমকের সঙ্গে গৃহপ্রবেশ হল। আজ এত সাধের তোমাদের দাদুর বাড়ী সরকার কেড়ে নিচ্ছে। হা ভগবান…'!

বলতে বলতে রামুদা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

ঠাকুমার তখনকার তেজোদৃপ্ত চোখ দুটো দিয়ে এখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। মা কাকীমা ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছছেন। বেদনায় সবার চোখ ছলছল করছে। বড় কাকা আর থাকতে না পেরে বৈঠকখানায় গিয়ে সটান ফরাসে গা এলিয়ে দিলেন। ছোটকাকা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাইরে চলে গেলেন। সমস্ত বাড়ীতে নেমে এল বিষাদের করুণ ছায়া। উঠোনের মাঝে পিটার হঠাৎ করুণ সুরে কেঁদে উঠল। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে গোয়ালঘরে গরুগুলোর ফোঁস ফোঁসানিও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছে, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালবার কথাও কারো মনে পড়ছে না। কুকুরটা আবার করুণ সুরে ককিয়ে উঠল—'কেঁ-উ-উ-উ।'

শবুর মনে যে নানান রংয়ের প্রজাপতিরা কিছুদিন হল উড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ এক সর্বনাশের আশঙ্কায় তারা সব একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল। পড়তে বসে পড়া কখন ভুলে যায়—মনে পড়ে রামুদার কথাগুলো—কত কষ্টের বাড়ী, কত সাধের বাড়ী। স্কুলে যেতে আসতে সেই একই ভাবনা। বালির ঢিবির উপর হীরার সঙ্গে গল্প করতে গিয়েও সেই একই কথা। ছোট ভাই বোনেরা অভ্যাস মত বালির ঢিবির উপর খেলতে আসে ঠিকই কিন্তু খেলা যেন জমেনা—কোলাহল গেছে কমে। ওদের মধ্যে নন্দুকেই যেন একটু বেশী মনমরা লাগে।

হীরার সঙ্গে দেখা হতেই প্রথমে এসে পড়ল বাড়ীর কথা। শবু বলল—

'জানিস হীরা, আমাদের বাড়ী সরকার নিয়ে নেবে।'

হীরা বলল—'সে ত আমাদের বাড়ীও নেবে।'

'তোদের ত ভাড়া বাড়ী আর আমাদের নিজেদের বাড়ী। দাদু কত কষ্ট করে বানিয়েছিল।'

হীরা ওর কষ্টের কথায় তেমন আমল দিল না, বলল—'তোরাও একটা বাড়ী ভাড়া করে নে।'

শবু বলল—'অত সহজে বাড়ী পাওয়া যায় না কি? তোরা বাড়ী পেয়েছিস? বাবারা ত সবাই মিলে খুঁজছে, কত দিনে পাবে কে জানে।'

হীরা বলল—'আমার বাবা বলেছে—বাড়ী ছাড়ব না। দরকার হলে মামলা লড়ব, দেখি কি করে বাড়ী থেকে উঠায়। একবার বোমার ভয়ে কলকাতায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসেছি, আবার?

শবু বলল—'এখন ত যুদ্ধ নেই, বোমাও নেই—তোরা ত কলকাতায় ফিরে যেতে পারিস।'

'ইস, গেলেই হল? যাওয়া কি অত সহজ? বাবার এখন সব রোজগার ব্যবসা এখানে।'

শবুর মনে হয়, হীরার কথার মধ্যেও কিছুটা যুক্তি আছে। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল, কথা আর জমে না। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মন ভারি হয়ে থাকে। হাসির গল্প, কল্পনার কথা আর যেন মনেই আসে না। একসময় নীরবে উঠে ওরা যে যার বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকে। ভাইবোনদের সঙ্গে করে বাড়ীতে ঢোকে। বাড়ীটাও আজকাল যেন নিঝুম মেরে থাকে।

তখনও বাসার খোঁজ খবর করা চলছে, সেই অবস্থায় পনরো দিনের আগে পিছে করে এই নিরানন্দ পুরীতে দুটি শিশুর জন্ম হল। এবারে দুটিই ছেলে কিন্তু দুজনেই অসম্ভব রুগ্ন আর অপুষ্ট। দুজনেরই জন্ম হল শহরের হাসপাতালে। ঠাকুমা বললেন—

'এরা দুজনেই সময়ের আগে জন্মালো—রুগ্ন আর অপুষ্ট হবে না? বৌদের কারও মনে কি সুখ আছে? জন্মালো সব এক আতঙ্কের মধ্যে।'

শবুর কাছে এসব ব্যাপার ততটা বোধগম্য হয় না। দু-দুটো ভাই হয়েছে তাতে সব ভাই বোনই এই বিষাদের মধ্যেও বেশ খুশি। কাকীমা প্রথম পুত্র-সন্তান পেয়ে ভারি খুশি। খুশি ছোটকাকাও। কাকীমার ছেলেটি হয়েছে

ফুটফুটে ফর্সা, ঠিক শবুর গায়ের মত রং যেন। ছোটকাকা ঠাট্টা করে বললেন—

'বৌদি, এতদিনে শবুর একটা নিজের ভাই হল।'

মা হেসে বললেন—'বেশ ভালই ত।'

ছোটকাকীমা বললেন—'দিদির এই ছেলের চোখ দুটি হবে দেখার মত, এখনই কত বড় বড় করে তাকায়।'

কিন্তু ঠাকুমার কণ্ঠে শঙ্কা—'এদের কি বাঁচানো যাবে?'

বারো

ছেলেদের আঁতুড় মিটতে মিটতে দেখা গেল পিটার একেবারে শয্যাশায়ী। দিনরাত বাড়ীর এক কানাচে ছাই গাদাটার উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বলতে গেলে প্রায় সেই বাড়ী ছাড়ার নোটিশ আসার পর থেকেই তার খাওয়া দাওয়া কমে গিয়েছিল। শিকল খুলে দিলেও কোথাও যেত না, ছাদেও উঠত না। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা কেউ বিশেষ লক্ষ্য করে নি। পরে যখন দেখা গেল সে মোটে নড়াচড়াও করতে পারছে না, তখন গিরিনবাবু তাকে যত্ন করে কোলে করে এনে ভিতর-বারান্দার এক প্রান্তে বস্তা পেতে তার উপর শুইয়ে দিলেন। কিছু ওষুধও দিলেন, সে ওর পেটে গেল কিনা বোঝা গেল না। সবার ধারণা ওর নিশ্চয়ই কোন অসুখ করেছে।

কিন্তু শবু থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট ভাই বোনেরা যখনই সময় পায় পিটারকে ঘিরে বসে থাকে। তাদের অশৈশব খেলার সাথী, আর ওর অসুখে তারা ওকে একটু দেখবে না? কিন্তু বলল—

'জানিস, আমাদের পিটার ভীষণ সাহসী, ওর ভয়ে পাড়ার আর কোন কুকুর এদিকে আসতে সাহস পায় না। অনেক বছর আগে বাবার এক বন্ধু বাবাকে দিয়েছিল। এটা বিলিতি কুকুরের বাচ্চা, দেখছিস না গায়ে কত বড় বড় লোম। ওর লোমগুলো ত সাদা—ছোটবেলায় কর্তামা ঠাকুমার মাথার পাকা চুল তোলার সময় পিটারের লোম মিশিয়ে দিতাম, দশটা সাদা চুল দেখাতে পারলে একটা পয়সা দিত।'

পিটার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো। মিতু বলল—

'ঐ দেখ, ও সব কথা বুঝতে পারে। কেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।'

শ্রীলা ডাকল—'এই পিটার, পিটার, একটু তাকা আমাদের দিকে।'

পিটার ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে আবার চোখ বুজল।

শবু বলল—'ওর ভয়ে আমাদের উঠোনে কাক, বেড়াল, বাঁদর আসতে পারত না। একবার ত গুটিগুটি গিয়ে এক লাফে একটা বানরকে ধরে কামড়ে মেরে ফেলেছিল। একবার নাকি একটা সাপকেও গোয়াল ঘরের পাশে কামড়ে মেরে ফেলেছিল। রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বাবা রোজ পিটারকে ছাদে পাঠিয়ে দিত। রাস্তা দিয়ে কোন কিছু রাত করে যেতে নিলেই পিটার ছাদের উপর এমন দৌড়োদৌড়ি চেঁচামেচি শুরু করে দিত যে চোরের কি সাধ্যি আমাদের বাড়ীতে আসে। সকালে বাবা ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় ওর গলার শিকলটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালে ডাকতেও হত না, পিটার কানদুটো নীচু করে বাবার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াত। বাবা ওর গলায় শিকল পরিয়ে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে এনে বৈঠকখানার পাশের বারান্দার ঐ থামটাতে বেঁধে রাখত, দুপুরে খাবার সময় ওকে ছাড়া হত একেবারে রাতের মত।'

ভাই বোনেরা তাদের খেলার সাথী পিটারের গায়ে মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। নন্দু বলল—

'পিটারের সঙ্গে কেউ দৌড়ে পারবে না। ওর অসুখ হবার আগে বালির উপর আমরা যখন দৌড়তাম ও সবার আগে ছুটে যেত। সবার ফার্স্ট'

পিটার আর একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মিতু আবার বলল—

'ঐ দেখ—ওর খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই।'

এইভাবে শিশুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের মুখে নিজের গুণ কীর্তন শুনতে শুনতে আর তাদের আদরের স্পর্শ পেতে পেতে কোনরকমে আরো দুটো রাত পার করে তৃতীয় দিন বিকেলে সকলের আদরের খেলার সাথী পিটার শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

ডাক্তার বড়কাকা বললেন—'বয়েস হয়েছিল তাই মারা গেল। কুকুরটা ভাল ছিল—না হলে কত কুকুর ত এ সময় পাগলা হয়ে যায়।'

ঠাকুমা বললেন—'বয়েস হোক আর যাই হোক, এই সব গৃহপালিত জীব বড় মায়া কাড়ে। ওরা গৃহস্থের মঙ্গলামঙ্গল বুঝতে পারে। না হলে যে-ই আমাদের বাড়ী ছাড়ার কথা উঠেছে অমনি কেন ও চলে গেল? আমরা বাড়ী ছেড়ে গিয়ে কষ্ট পাবো ও সেটা দেখতে চায় না।'

বাবা গিরিনবাবুও রীতিমত দুঃখে অভিভূত হলেন। তিনি বললেন—'ওকে গোয়াল ঘরের পিছনে কবর দেওয়া হোক—এই বাড়ীতেই ও শুয়ে থাক।'

ছোটকাকা বললেন—'পৌরসভা আপত্তি করবে।' স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার বড় কাকাও তাঁকে সমর্থন করলেন।

শেষে সন্ধ্যের সময় পৌরসভার ধাঙড়রা এসে পিটারকে ঠেলায় তুলে নিয়ে গেল। বাড়ীর বাইরে পর্য্যন্ত শিশুর দল পিছন পিছন এসে সমস্বরে 'পিটার' 'পিটার' বলে কাঁদতে লাগল। তাদের এতদিনের খেলার সাথী চিরদিনের মত সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। বাড়ীর সবার মনেই দুঃখ।

দিল্লী থেকে চিঠি এসেছে। অবিনাশবাবুর চাকরি হয়েছে কেন্দ্রীয় স্থাপত্য বিভাগে। ভুবনেশ্বরে পোষ্টিং। খবর শুনে সবাই খুব খুশি।

ঠাকুমা বললেন—'ছেলেটা পয়মন্ত হয়েছে। ছেলের জন্ম আর বাপের চাকরি প্রায় একই সময় হল।'

ছোটকাকা তেমন একটা খুশী হতে পারছেন না—পদটা ঠিক উপযুক্ত হল না। তবু সংসারের চাপে আর 'না' বলাও যাচ্ছে না। চাকরির যা বাজার। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক তা হলে কথা রেখেছেন—ছোটই হোক আর যা-ই হোক একটা চাকরির ব্যবস্থা ত করেছেন। দু একদিনের মধ্যে ছোটকাকা ভুবনেশ্বর রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে কাজে যোগ দিয়ে বাসা ঠিক করে মাসখানেক পরে বৌ ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাবেন। সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে। বাড়ীটাই চলে যাচ্ছে—সংসারও ভাঙছে।

নোটিশ পাওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে একটা সুবিধামত বাসার বন্দোবস্ত হল। শাহীর বাজারের কাছে রানীর এস্টেটের কর্মচারীদের থাকার উপযুক্ত যে বাড়ীগুলো আছে তারই একটাতে দুখানা ঘর। এ ছাড়া উঠোন রান্নাঘর ইত্যাদি মোটামুটি আছে। এবাড়ীর তুলনায় একেবারে বেমানান কিন্তু কি আর করা যাবে, উপায় ত কিছু নেই। আর এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল দিন দেখে সবাই গিয়ে উঠবে সে বাসায়। আশ্রিতের মধ্যে রয়েছেন শুধু পাঁচুকাকা—তিনি ভাগ্যান্বেষণে চলে গেলেন আসামে। গিরিনবাবু মার সঙ্গে পরামর্শ করে রামুকে বললেন—

'অবস্থা ত সবই দেখতে পাচ্ছ, রামুকাকা। আমাদের এখন আর ঠাকুর চাকরের বিলাসিতা সাজে না। তাছাড়া নিজেদেরই থাকার জায়গার অভাব। তুমি কি বল?'

রামু বলল—'বড়বাবু, এতদিন আপনাদের নুন খেয়েছি আপনাদের বিপদের কথা বুঝব না এমন নিমকহারাম আমি নই। একি আর বলে বোঝাতে হয়? ভাবছি, বুড়ো হয়ে গেলাম, এবার দেশের বাড়ীতে ফিরে যাই।'

গিরিনবাবু বললেন—'সেই ভাল। আমরা ঠিক করেছি আমাদের যে পাঁচটি দুধেল গাই আছে তা থেকে তোমার পছন্দমত যে কোন দুটি গাই তার বকনা ও বাছুর সহ তোমাকে আমরা দিয়ে দেব। একটা নেবে ধামউলী হোতার মা, একটা অন্নদা আর একটা দেওয়া হবে বাবার সেই আর্দালীকে যে শেষ সময় বাবার কাছে ছিল।'

ঠাকুমা বললেন—'রামু ভাই, কর্ত্তামশাই চলে যাবার পরেও তুমি ছিলে আমাদের বল ভরসা, এতদিন কোন মাইনে পত্তরও নাও নি। আমরা ত ব্রাহ্মণ, আমাদের গরু বিক্রি করতে নেই। তুমি ঐ দুটো গরু নিয়ে সন্তুষ্ট মনে বাড়ী যেও। এ গরু কখনও বিক্রি করবে না—দরকার হলে অপরকে দান করে দিও।'

রামু বলল—'ও কথা বলবেন না মা ঠাকরুন। এতদিন আপনাদের সেবা করে এসেছি—আপনাদের নিয়ম কানুনের বাত্যয় আমার দ্বারা কোনদিন হবে না। এখন বাড়ী গেলেও আমার প্রাণটা সবসময় এই দাদা-দিদিদের মধ্যে পড়ে থাকবে। যখনই কোন দরকার হবে একটা খবর দেবেন যদি বেঁচে থাকি আর চলচ্ছক্তি থাকে এক ডাকে শ্রীচরণে হাজির হব।' বলে সত্যি সত্যিই ঠাকুমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে চোখের জল ফেলতে লাগল।

আবার শিশু মহলে একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। পিটার চলে গেছে। এবারে গরুবাছুরগুলো নাকি সবাইকে দিয়ে দেওয়া হবে। এতদিন গরু বাছুরগুলো বাড়ীতে ছিলই শুধু তারা জানত। সেই গরুর দুধ যে তারা খায় তাও জানে। তবু সেগুলোর সাথে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় তেমন ছিল না। তার কারণও আছে। যদিও এরা এত উপকারী তবু বিরাট বিরাট চেহারা আর তার সঙ্গে বড় বড় শিং শিশুদের কৃতজ্ঞতা জানাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। মাঝে মাঝে তারা গরুদের একটা করে বাছুর হতে দেখেছে, জন্মাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বাছুর দাঁড়াতে শিখে আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। সে যেন এক অবাক বিস্ময়! একবার মায়ের দুধ খায় আবার একটু নাচানাচি করে। আর দেখেছে মাঝেমাঝে পালাপার্বণে বিশেষ

করে পৌষ সংক্রান্তিতে সকালবেলায় গরুদের গা মুছিয়ে বাড়ীর উঠোনে আনা হ'ত। ঠাকুমা, মা, কাকীমা গরুদের শিং ও পায়ের খুরে তেল লাগাতেন, কপালে এঁকে দিতেন তেল সিঁদুরের ফোঁটা-তিলক। তবে তখন পার্বণের পিঠে পুলি পায়েস পাটিসাপটা খাওয়ার আগাম আনন্দে ও গন্ধে তারা এত ব্যস্ত থাকত যে গরুদের ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্যই করত না।

গরুগুলো সব চলে যাবে শুনে হঠাৎই তাদের খুব আপন মনে হচ্ছে। রোজ সকালে যখন রামুদা গরুগুলোকে গোয়াল ঘরের বাইরে এনে খাবারের চাবি মাটির জাবার সামনে বাঁধে শিশুর দল তখন সেখানে ভিড় করে। আগেই দুধ দোয়া হয়ে গেছে, বাছুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে যার মার কাছে লেপটে রয়েছে। নন্দু একটু সাহস করে কাছের গরুটার গায়ে হাত বুলোতে যায়। মিতু বলে উঠল—

'কাছে যাসনে, নন্দু, ঢুসোবে।'

রামুদা অভয় দিয়ে বলল—'কিছু বলবেনা, এখন সব জাবনা খাচ্ছে। তা ছাড়া এরা খুব লক্ষ্মী, ঢুসোয় না।'

নন্দু হাত বাড়িয়ে গরুর গলার নীচটায় হাত বুলিয়ে দিল। গরুটা খেতে খেতে আরামে মুখ তুলে কান দুটো অল্প অল্প নাড়তে লাগল। দেখাদেখি আর সকলে গিয়ে একটু একটু করে ছুঁয়ে এল। গরুর গায়ে যেখানে তারা হাত দিচ্ছে সেখানেই জেগে উঠছে একটা কাঁপুনি। মনে হয় ওরা বুঝি খুবই অনুভূতিপ্রবণ। ছটফটে বাছুরগুলোকেও সবাই আদর করছে। কিন্তু আর শবু বড়। তারা গরুগুলোর কপালে গলায় হাত বুলাল। বাছুরগুলোকে ধরে আদর করে চুমু খেল।

রামুদা গরুগুলোকে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিল—

'এটা বুধি—বুধবারে জন্মেছিল, এই সাদাটা ধবলী, পরেরটা মঙ্গলবারে জন্মেছিল—তাই নাম মঙ্গলী, যেটার গায়ে লাল লাল ছোপ আছে তার নাম চিত্রি, আর যেটার গায়ে সাদা লাল বাদামী হলুদের বাহার তার নাম রঙিলা। কার কোনটা বাছুর তা ত বুঝতেই পারছ। আর এই বকনা দুটো রঙীলা আর বুধির।

মিতু জিজ্ঞেস করল—'আর তিনটের বকনা কই?'

রামুদা বলল—'ওদের ত এঁড়ে বাছুর হয়েছিল, দুধ ছাড়ার পর গ্রামের লোকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

শ্রীলা বলল—'কেন?'

রামুদা—'সে তোমরা এখন বুঝবে না।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'রামুদা, তুমি কোন দুটো গরু নেবে?'

রামু খুব খুশি হল এই প্রশ্নে, বলল—'শবুদিদির খুব বুদ্ধি, আসল কথা জিজ্ঞেস করেছে। আমি নেব ধবলী আর রঙিলাকে।'

শবুও খুশি হল—তারও পছন্দ ধবলী, দেখলেই মার কথা মনে হয়।

এমনি করে রোজ সকালে বিকেলে শিশুদের ভিড় হয় গোয়ালের সামনে। সবাই বারবার করে গরু বাছুরগুলোর গায়ে হাত দিয়ে আদর করে। গরুগুলো লেজ নাড়ে, গায়ে হাত দিলেই ওদের গায়ের চামড়া কেমন থিরথির করে কাঁপে দেখে সবার আশ্চর্য্য লাগে। গরুগুলো ঘাড় ফিরিয়ে ওদের গা শোঁকে। একবার ত ধবলী শবুর বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচটা চেটেই দিল। বাছুরগুলোর মুখের কাছে খড় নিয়ে ওরা খাওয়াবার চেষ্টা করে। কোনটা একটু শুঁকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আবার কোনটা দু চারটে খড় মুখে নিয়ে একটু মুখ নেড়ে খড় মুখে করেই নাচতে শুরু করে। শিশুরা সব আনন্দে হাত তালি দিতে থাকে। ধবলীর বাছুরটা সব থেকে ছোট—সেটাই বেশী নাচানাচি করে।

বাড়ী ছাড়ার, ভাড়া বাড়ীতে যাবার প্রস্তুতি চলেছে। সব গোছগাছ হচ্ছে। খাট চৌকি আলমারী বিছানাপত্তর, আলনা কাপড় চোপড়, বাক্স স্যুটকেশ, বাসন কোসন, লক্ষ্মীর ঘটপট পুজোর বাসন, শিল নোড়া হাঁড়ি কলসি বালতি—কোনটা বাদ দেওয়া যায়। স্কুলের স্লেট পেন্সিল বইখাতাপত্তরও আছে। ঐ টুকু ভাড়া বাড়ীতে সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুই পুরুষের সঞ্চিত আসবাবপত্র কি করে ঢোকানো যাবে? সে সব ঢোকালে বাড়ীর মানুষগুলো সে বাড়ীতে ঢুকবার জায়গা পাবে কি? মহা সমস্যা!

কোনটা ফেলে কোনটা নেওয়া যায়? গানবাজনার সরঞ্জাম হারমোনিয়াম বাঁয়া তবলা বেহালা গাইয়ে বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল—গান বাজনার পাট সে কবে উঠে গেছে। শুধু গিরিনবাবু তাঁর অতি শখের এস্রাজটা নিজের কাছে রাখলেন অতীতের স্মৃতি হিসেবে। অতিরিক্ত চৌকি বেঞ্চ আলমারী নানা বন্ধুদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঢেঁকিঘরের ঢেঁকিটা ঝি অন্নদা নিয়ে যাবে। পুরোনো বইপত্র সেরদরে বিক্রি করে দেওয়া হল—রাখার জায়গা নেই। গরুবাছুরগুলোর ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক হয়েই আছে।

'গিরিনবাবু বললেন—'বাড়ীর কোন জিনিষ এমন কি একটা ইটও আমরা নেব না।'

রামু বলল—'বড়বাবু, একটা কথা বলি। বাড়ীটা তুলে নেওয়া যাবেনা ঠিকই। কিন্তু কর্ত্তাবাবুর নিজের হাতে তৈরী বাড়ীর কিছু স্মৃতি ত রাখা দরকার। একদিন ত তোমাদের বাড়ী হবেই। আমি বলি কি, ভাল দেখে ঘরের দু-চার জোড়া দরজা খুলে নিয়ে যাও—নিজেদের বাড়ী হলে সেখানে লাগিয়ে নিও। ওগুলো খুব মজবুত, বহুদিন টিকবে—আর কর্ত্তাবাবুর স্মৃতি-টাও থাকবে।'

কথাটা সবার মনে ধরল। ঠাকুমা বললেন—'হ্যাঁ, সেই ভাল, একটা স্মৃতি থাকা দরকার। সরকার জমিটাই নিতে পারে, ঘর দরজা রাখা না রাখা আমাদের ইচ্ছে।'

ঠিক হল শুধু কয়েক জোড়া দরজা নিয়ে যাওয়া হবে।

তের

বাড়ী ছাড়ার আগের দিন খবর পেয়ে এসে গেল ঘাসউলী হোতার মা আর মহিমবাবুর পুরোনো আর্দালি। হোতার মা এসেই হাউমাউ করে কান্না-কাটি আরম্ভ করল—

'আলো মালো, বাড়িপোড়া সরকারর এ কণ বিচার। বিনা দোষরে এ-মানঙ্ক ঘর ছাড়া করিব। টিকে দয়া মায়া নাহি। এমানে কণ ছুয়া পিলাকু নেই দাণ্ডরে ছিয়া হব?' শবুকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলল—ভাল অছ রে মা। গরিব মাঙ্কর কথা মনে অছি?' বলে নিজের মেয়ের মতই শবুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

শবুরও তার ধাইমাকে খুব ভাল লাগছে। মা ঠাকুমার মুখে শোনা জন্মের সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিধিমতে হোতার মা-ই এখন শবুর নিজের মা—আপন মা এখন পালিকা-মা মাত্র। শবুর মনে এক আশ্চর্য্য রূপকথার জগৎ ভেসে উঠছে—সে যেন এক রাজকন্যা যার দুই মা—এক মা খুব গরিব, ঘাস কেটে ঘাস বিক্রি করে সংসার চালায়, আর এক মা দেহে মনে একান্তভাবেই সে যার প্রতিচ্ছবি। কি ভালই লাগত যদি সে একই সঙ্গে দুই মায়ের কাছে থাকতে পারত। এই গরিব মাকে 'মা' বলে ডাকতে

বুকের ভিতরটা উদ্বেল হয়ে ওঠে কিন্তু মুখে কথা সরে না, সংকোচে আর আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে—শুধু হোতার মার সাদর আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করে স্নেহের বন্যায় ভেসে যেতে থাকে।

ছোট ছোট ভাই বোনেরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল। পরে হোতার মা একে একে অন্য শিশুদেরও কোলে করে আদর করল, সকলের কার কি নাম জেনে নিল—মিতু, শ্রীলা, নন্দু, কানাই, এলা। কানাইকে কোলে করে আনন্দে গদগদ হয়ে বারবার বলতে লাগল—

'কানহাই, ননীচোর, রাখাল, গোপাল, মোর কালাচাঁদ।' পরে কচি দুটো ছেলেকেও আদর করে কোলে নিল।

মহিমবাবুর আর্দালী এসে কর্তাবাবুর কথা বলে চোখের জল ফেলতে লাগল। ঠাকুমার চোখেও নামল অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া অশ্রু বন্যা। সবাই সবার কুশল বিনিময় করল। ঠিক হয়েছে আজই দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে গরুবাছুরগুলো যে যার বাড়ী নিয়ে যাবে।

গরু বাছুরগুলোকে ভাল করে নাইয়ে ধুইয়ে বাড়ীর ভিতরের উঠোনে নিয়ে আসা হল। কিন্তু শবু ও বাড়ীর শিশুর দল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বিদায় অনুষ্ঠান। ঠাকুমা মা কাকীমা গরুগুলোর পা ধুয়ে দিলেন। তেল সিঁদুরের তিলক এঁকে দিলেন সবার কপালে, বকনা ও বাছুরগুলোও বাদ গেল না। চাল ডাল চিড়েমুড়ি মোয়া গুড় কিছু খড় শাক শবজি বাতাসা খইল ভূষি ও নুন মিশিয়ে জল দিয়ে জাবনা মেখে গামলা বালতি ভর্তি করে গরুগুলোর মুখের সামনে রাখা হল। গরুগুলো খেতে আরম্ভ করল ঠাকুমা সবার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—

'তোমরা ছিলে আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমাদের আর ঘরে রেখে সেবা করতে পারলাম না। তোমরা এই খেয়ে সন্তুষ্ট মনে নতুন ঘরে যাও মা-সব' বলতে বলতে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

মা কাকীমাও বারবার আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। গরুগুলো খাচ্ছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে। মনে হচ্ছে ওরাও বুঝি কাঁদছে। বাছুরগুলো একবার করে খাবারের পাত্রে মুখ ঠেকাচ্ছে আবার মুখ তুলছে। এ সবের চেয়ে ওদের মায়ের দুধই বেশী পছন্দ। বকনা দুটো কিন্তু বেশ খাচ্ছে

শিশুর দল আগ্রহভরা চোখ মেলে ওদের খাওয়া দেখছে। দু একটা

গরুর চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে— শিশুদের মনে হয় ওরা বুঝি বাড়ী থেকে চলে যাবে বলে কাঁদছে। শবুর অন্ততঃ তাই মনে হয়। ঠাকুমা সেদিন বলেছিলেন, এরা সব গৃহপালিত অবলা জীব। যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীর প্রতি এদের অসীম মমতা। কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে চায় না। শুনেছে—দূরে মাঠে চরাতে নিয়ে গেলেও ঠিক পথ চিনে বাড়ী ফিরে আসে। আর গরুরা হল অন্তর্যামী— স্বয়ং মা ভগবতীর অংশ। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে আজ ওদের চলে যেতে হবে—একদিন ওরা এই বাড়ীতেই হয়ত প্রথম জন্মেছিল, আজ বড় হয়েছে—যেমন হয়েছে কিস্কু শবুরা। তাই বুঝি ওরা কাঁদছে। ঠাকুর বিসর্জনের আগে মা-রা যখন সিঁদুর পড়াতে যায় তখন সবাই বলে, আর শবুরও মনে হয়েছে, প্রতিমার মুখ কেমন করুণ দেখায়, মনে হয় যেন মা দুর্গা কাঁদছেন।

গরুগুলোর খাওয়া হয়ে গেলে ঠাকুমা মা কাকীমা ওদের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি কিস্কু শবু ও শিশুর দল এগিয়ে গিয়ে যে যেখানে পারল গরুগুলোকে ছুঁয়ে প্রণাম করতে লাগল। সব হয়ে গেলে ঠাকুমার অনুমতি নিয়ে রামু, মহিমবাবুর আর্দালী, হোতার মা, আর অন্নদা নিজের গরুবাছুরগুলোকে দড়ি ধরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ঠাকুমা মা কাকীমা সজল চোখে বাড়ীর দরজা পর্যান্ত এসে দাঁড়ালেন। শিশুমহল আরো এগিয়ে গোয়াল ঘর ছাড়িয়ে গরুগুলোর পিছু পিছু বালির ঢিবির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গরুগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে—কিছুতেই ওরা যেতে চায় না। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় গরুগুলো ওদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। এখন সব শিশুর চোখেই নামে জলের ধারা, কাঁদে কিস্কু শবুও। সব থেকে বেশী কাঁদে শবু আর নন্দু—ওদের মন বুঝি বেশী কোমল। শূন্য গোয়ালের পাশ দিয়ে ওরা যখন শূন্য মনে ফিরে আসছে তখন ওদের বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। কেউ কোন কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে সবাই একে একে বাড়ীর ভিতর চলে এল।

পরদিন বাড়ী বদল শুরু হল। খুব ভোরে রামু তার গ্রাম থেকে আবার চলে এসেছে। লোক জন লাগিয়ে প্রথমে খাট বিছানাগুলো, আলমারী বাক্স প্যাঁটরা অন্যান্য টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে যাওয়া হল। দুপুরে খাওয়া দাওয়া

সেরে ঠাকুমা মা কাকীমার সঙ্গে কিছু শবু মিতু নন্দু শ্রীলা এলা কানাই সবাই নতুন বাসার দিকে রওনা হচ্ছে, ছোট ভাই দুটি যে যার মায়ের কোলে। বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় ঠাকুমা থেকে আরম্ভ করে সবাই কাঁদছে। ঠাকুমা মা কাকীমা প্রত্যেকটি ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি ছোটরাও মাথা ঠেকাল।

শবু শেষবারের মত সব কটা ঘর ঘুরতে ঘুরতে ভাবে—এইটা দাদু ঠাকুমার শোবার ঘর, তার পাশে বড় কাকার, তারপর ছোট কাকা কাকীমার ঘর—এই ঘরেই ছোট কাকীমা বিয়ে হয়ে এসেছিলেন, শেষে বাবা-মার শোবার ঘর—যে ঘরের সঙ্গে ওদের আজন্ম সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। সিঁড়ির ওপাশে বৈঠকখানা ঘর—আগে সেখানে সব সময় ফরাস পাতা থাকত—সারাদিন চলত গানবাজনা গল্পগুজব আর বড় হয়ে ওদের পড়াশুনা। তারপর কর্তামার ঘর-এখনকার পুজোর ঘর। উঠোনের অপরদিকে কুয়োতলা রান্না-ঘর, ঢেঁকিঘর, পেছনে গোয়ালঘর, দুটো নারকেল গাছ সবে ফল দিতে শুরু করেছে, কয়েকটা ফুলের গাছ। জীবনের তের চৌদ্দটা বছর রোজ সকালে শবু রান্নাঘর ঢেঁকিঘরের মাথার উপর দিয়ে নতুন সূর্য্য উঠতে দেখেছে। ঘরগুলো এখন ফাঁকা—আসবাবপত্র সব চলে গেছে। শূন্যঘর-গুলো এখন মস্ত বড় বড় দেখাচ্ছে, তার মধ্যে বাবা-মার শোবার ঘরটাই সবথেকে লম্বায় বড়। এখানে সেখানে ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা জিনিষপত্রের টুকরো ছড়ানো। সারাটা বাড়ী প্রতিটি ঘরের কোণ বহু ঘটনার স্মৃতিতে ভরা। আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কত সুখ দুঃখ হাসি-খেলা ব্যথা বেদনার ইতিহাস। ছোট ছোট গাছের ঝোপের আড়ালে ছিল ওদের খেলনার সংসার, তার পাশে বালির ঢিবি যেখানে কেটেছে ওদের খেলাধুলার অধিকাংশ সময়।

চারপাশের জমাট স্মৃতির পাহাড় ফেলে শূন্য ঘরগুলোর মত শূন্য মনে বেদনায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবাই হেঁটেই রওনা হল ভাড়া বাড়ীর উদ্দেশে। মাত্র দু তিন মিনিটের পথ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন পুরোনো আবাস ছেড়ে সবাই চলেছে কত যোজন দূরে—যেখান থেকে ওরা আর কখনও ফিরে আসতে পারবে না সেই আজন্ম স্নেহের আশ্রয় দাদুর বাড়ীতে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে মহিম কান্তি মৈত্র মহাশয় যে ভদ্রাসন এই শহরের বুকে পেতেছিলেন, দ্বিতীয় পুরুষেই তাঁর বিধবা স্ত্রী ও বংশধরেরা আজ সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাযাবর জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হল। মৈত্র মহাশয়ের

স্ত্রী দ্বিতীয়বার অনাথ হয়ে পুত্র পুত্রবধূ নাতিনাতনীদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন অজানা আশ্রয়ের উদ্দেশে! সম্পূর্ণ পরিবারটির যেন জন্মান্তর ঘটতে চলেছে। প্রথমবারের আঘাতে নির্ঝরিণী দেবী হারিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে, এবার হারালেন স্বামীর হাতে গড়া নিরাপদ আশ্রয়টুকু। ঘটল দ্বিতীয়বার ভাগ্য বিপর্যয়।

পথে যেতে শবুর মনে পড়ছে তালচের কয়লাখনি দেখে ফেরার সময় গাড়ী চালকের সেই কথাগুলি—নিহত ও অকর্মণ্য শ্রমিক পরিবারগুলোকে কোম্পানী তার জমি বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করবে। সেদিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি, এত শিগ্‌গীর বা কোনদিন তাদেরকেও নিজেদের বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

ভাড়া বাড়ীতে এসে সকলের প্রায় দমবন্ধ অবস্থা। মাত্র দুখানা ঘর, তারমধ্যে এতগুলো মানুষ জিনিষপত্র—সব একেবারে ঠাসাঠাসি। ছোট-কাকীমা অবশ্য মাসখানেকের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে যাবেন। ততদিন বাড়ীতে পা ফেলার এতটুকু জায়গা নেই। সামনে এক-ফালি বারান্দা আছে, দিনেরবেলায় অনেকটা সময় সেখানে কাটানো যায়—পড়াশুনাও সব সেই বারান্দাতেই। রাতে জ্বলে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বড় কাকা অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে কাটান। গরুগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন বাইরের জল মেশানো দুধই ভরসা। ছেলেমেয়েদের দুধের বরাদ্দে টান পড়েছে।

শবুরা আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে, স্কুলের কাছাকাছি যেতে ডান হাতে আগে পড়ে গীর্জা, তার একটু পিছনে ওদের ছেড়ে আসা দাদুর বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। পথের ঐখান দিয়েই যাবার সময় প্রথম স্বাধীনতার সকালে বাবা মাদের দেখতে পেয়ে ওরা অধিক উৎসাহে জোরে জোরে বন্দে মাতরম বলে চিৎকার করেছিল। এখন দুঃখে অভিমানে ওরা সে বাড়ীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না—পাশের বালির ঢিবিটা বুক চিতিয়ে পড়ে থাকে শ্মশানের মত, সেখানে নেই শিশুদের কলরব।

যেতে আসতে শবু আড়চোখে একবার করে পুরোনো বাড়ীটার দিকে তাকায়। কাকে দেখে সে! এ যেন ওদের সৎমা। নিজের জন্মভূমি—জন্মভিটা, সে-ও ত মায়ের মত। তবে? নিজের মা সৎমা হবে কি করে? হ্যাঁ ঠিক, সৎমা নয়। এ যেন দিদিদের পড়ার বইয়ের ডেভিড্ কপারফীল্ডের মায়ের মত এখন পরের ঘরনী। নিজের মা যদি পরের ঘরনী হয় তবে তার মত কুৎসিত জিনিষ বুঝি কল্পনা করা যায় না। গল্পটা শুনে শবুর গা ঘিনঘিন করত—উয়্যাক্, মাগো! একজন বাইরের লোককে কি বাবা বলা যায়—আর সেই চির-স্নেহশীলা মাকে কি ঠিক আগের মত মা বলে মনে হয়, বা ভালবাসতে পারা যায়? এখন ত ওদের জন্মভিটা-মা পরের হাতে চলে

গেছে—আর কি তাকে আগের মত মা বলে ভাবা যায়? শবুর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, মিতুরঃচোখেও জল। কিতুর মনটাও ভারি হয়ে ওঠে তবু ওদের সাবধান করে দেয়—

'পথের মাঝে কাঁদিসনে, লোকে কি ভাববে।'

স্কুলে গিয়েও শবু আগের চেয়ে বেশী গম্ভীর হয়ে থাকে। ক্লাসের বান্ধবীরা ওকে সান্ত্বনা দেয়, মন ভোলাবার চেষ্টা করে। সীমন্তী বলে—

'এ নিয়ে অত মন খারাপ করে থাকিসনে। দেখনা, হীরাদের বাড়ীও ত দুদিন বাদে নিয়ে নেবে তবু সে কেমন হাসিখুশি থাকে।'

শবু বলে—'সে ত ওদের নিজের বাড়ী নয়, আর সেখানে জন্মায়ওনি। বাড়ীটার সব স্মৃতি আমার সব সময় মনে পড়ে, একটা কথাও ভুলতে পারি না।'

আর কয়টা দিন গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সরকারের লোকজন এসে বাবা বড়কাকাকে ডেকে নিয়ে গেল দাদুর বাড়ীতে, সেখানে বাড়ীঘর সব বুঝিয়ে দিয়ে হস্তান্তর করতে হবে, শেষে ঠাকুমা শুধু প্রয়োজনীয় সই সাবুদ করে দেবেন বাবা কাকার ফিরতে সেই দুপুর গড়িয়ে গেল। বড় কাকা এসেই বললেন—

'ঠিক হয়েছে, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! এখন বোঝ সব—কি অপমানটাই হতে হল সবাইকে।'

ঠাকুমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'কি হয়েছে, সব খোলসা করে বল কার কি হয়েছে?'

গিরিনবাবু বললেন—'ঐ ভূপেন বাবুদের কথা। সরকারের লোকজন এসেছে ওদের বাড়ীরও দখল নিতে। ভূপেনবাবু বাড়ী ছাড়বেন না, ছুটলেন উকিল হিতেনবাবুর কাছে কোর্ট কাছারি করবেন বলে। শুনে হিতেনবাবু বললেন—এ ব্যাপারে এখন কিছু করার নেই। এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? যা করার আগে করতে হ'ত। আর আপনাকেও বলিহারি যাই মশাই। গিরিন হৈময়া তাদের পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে সাতদিন আগেই উঠে গেল আর আপনি ভাড়া বাড়ী নিয়ে আজ মামলা লড়তে এসেছেন? কিছু হবে না। —ভদ্রলোককে ফিরতে দেখে সরকারের লোকজন ঘরের আসবাবপত্র টেনে বার করতে আরম্ভ করল। বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক পথে দাঁড়ায় আর কি। সেই অপমান থেকে

বাঁচবার জন্য আমরা ছোটাছুটি করে সমুদ্রের দিকে কৈলাস ভবনের কাছে একখানা বাসা ঠিক করে—ভূপেন বাবুদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে ফিরছি।'

শুনে কাজের ঝি অন্নদা বলে উঠল—

'মূলক মাইপো নাহি, পুয় নাম গোপালিয়'—এ হেলা সিমিতি কথা।'

ঠাকুমা বাধা দিয়ে বললেন—'থাক বাছা, পরের বিপদ আপদ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা ভাল দেখায় না। কার কখন কেমন দিন আসে কে বলতে পারে?'

অন্নদা তবু বলল—'নাহি, মু সত্য কথা কহিবি। বড পয়সার গরম দেখাউছি। সরকারঙ্কর সঙ্গে লড়িবাকু যাইছি!'—কেউ আর কথা বাড়ালো না।

সুখে দুঃখে দিন যাচ্ছে। কিস্কুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল, সীট পড়েছিল জেলা স্কুলে। ওখানেই বছর দুই হল মর্ণিং কলেজ হয়েছে। রোজ পরীক্ষা দিতে যাবার আগে দিদি সব গুরুজনদের প্রণাম করে রওনা হ'ত। পরীক্ষা শেষ—এখন ফল বের হবার অপেক্ষা। ছোট কাকীমার এই সময় ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভুবনেশ্বরে যাবার কথা ছিল, বাসাও ঠিক হয়ে গেছে—কিন্তু যাওয়া পিছিয়ে গেল।

উত্তর বঙ্গ থেকে বড়কাকার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে। গিরিনবাবুর কথা মত মা নির্ঝরিণী দেবী হৈমর বয়স অসুখ ইত্যাদির বিষয় কোন কিছু গোপন না করে চিঠি দিয়েছিলেন। তার জবাবে পাত্রী-পক্ষ লিখেছেন—তাঁদের মেয়েরও বয়স বেশী—প্রায় আটাশ উনত্রিশ। একেবারেই অরক্ষণীয়া—সম্ভব হলে তাঁরা পরের লগ্নেই বিয়ে দিতে প্রস্তুত। এতদিন সে বিয়ে হয়েই যেত—কিন্তু এই বাড়ী ছাড়ার ঝামেলা আর কিস্কুর পরীক্ষায় জন্য আটকে ছিল। বিয়ে ত হবে—কিন্তু বাড়ীতে ঘর কই? মাত্র দুখানা ঘর। খোঁজাখুঁজি করে রাস্তার প্রায় উল্টোদিকে ঘটকবাবুর বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া পাওয়া গেল। ঠিক হল ফুলশয্যার রাত থেকে হৈম আর মেজবৌ ঐ ঘরে থাকবে, সারাদিনের কাজকর্ম খাওয়া দাওয়া সব মূল বাড়ীতেই হবে।

সামনের লগ্ন দেখে বিয়ে হয়ে গেল। বেশী ধুমধাম হল না—বয়স বেশী ত। শুধু ভুবনেশ্বর থেকে অবিনাশ এল মেজদার বিয়েতে।

পাড়াপড়শীরা বৌ দেখে আড়ালে বলাবলি করল—'তা মেয়ের বয়েস আছে, ত্রিশের নীচে নয়।'

শবুরা ভেবেছিল বড় কাকা যেমন আমুদে ও রসিক, বড় কাকীমাও বুঝি তেমনি হাসিখুশি হবে। প্রথম দর্শনেই কিন্তু ঠিক তেমন মনে হল না। এবার বিয়ে হয়ে নতুন বৌ সকালবেলা এসে উঠল তিলকবাবুর বাড়ীতে। কিন্তু শবুরা ভাইবোনদের নিয়ে সেখানেই গিয়েছিল প্রাথমিক আলাপ পরিচয় করতে। নতুন বৌ ওদের তেমন আমল দিল না। ওরা সব চুপচাপ বাড়ী ফিরে এল। বৌভাতও মিটে গেল।

ঠাকুমা আফশোষ করতে লাগলেন—

'মেজবৌমা এসে উঠল ভাড়া করা বাড়ীতে। শশুরের ভিটে তার রেখা হল না। সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই।'

মনে হয় ঠাকুমা তাঁর মেজছেলেকে একটু বেশী স্নেহ করেন, আর সেই সূত্রে মেজ-বৌমার প্রতিই তাঁর টানটা অধিক।

বিয়ে মিটে গেলে অবিনাশবাবু স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভুবনেশ্বরের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। ছোট কাকিমা যাবার সময় খুব কাঁদলেন। বড়-জা পদ্মিনী দেবীর গলা জড়িয়ে অনেক কেঁদে বললেন—

'দিদি, বাবা চলে গেলেও এতদিন মাথার উপর মা ছিলেন, ছিলেন বাবার মতই বট্‌ঠাকুর আর ছিলেন আপনি আমার সর্বংসহা দিদি। সব আপদে বিপদে আপনারাই আমাদের রক্ষা করেছেন। এখন বিদেশ বিভূঁয়ে আমি একা একা সংসার কি করে চালাব? কে আমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে?'

মা ছোটবোনের মত ছোট কাকীমাকে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

'সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, মন খারাপ করিসনে, দীপু। আমরা ত কাছেই রইলাম, মাত্র তিন চার ঘণ্টার পথ। যখনই খবর দিবি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হব। ছেলেমেয়েদের সাবধানে রাখিস। ছোট্‌ ঠাকুরপোকে যত্ন করিস।' বলতে বলতে পদ্মিনী দেবীও কাঁদতে লাগলেন।

সবার আদরের ছোট কাকীমা চলে যাচ্ছেন—প্রণাম করতে গিয়ে ভাসুরঝিরা কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল। তাদের খেলার সাথী শ্রীলা একা আর ফুটফুটে ছোট ভাইটা চলে যাচ্ছে তাতেও সকলে শোকাহত—আবার কবে দেখা হবে। ছোট কাকীমা দীপ্তিরানী বড় ভাসুর মেজ ভাসুরকে দূর থেকে মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। মায়ের মত শাশুড়ী নির্ঝরিণী দেবীর পায়ে মাথা রেখে অনেক কাঁদলেন। বড়জাকে প্রণাম করে, প্রণাম

করলেন মেজ-জা খনা দেবীকে। যদিও অল্পদিনের পরিচয় তবু খনা দেবীর চোখেও জল নামল। হাজার হোক মেয়ে মানুষ ত—আর কান্নাটা খুব ছোঁয়াচে।

ছোট কাকীমারা চলে গেলেন। বাড়ীটা অনেক ফাঁকা ফাঁকা লাগে এখন যদিও মাত্র দুখানা ঘর। ঠাকুমা বসে বসে বিলাপ করছেন—

'তোদের মা বিয়ে হয়ে প্রথমদিন উঠেছিল কৈলাস ভবনে। বাড়ীর মালিক হারুর বাবা ছিলেন তোদের দাদুর বন্ধু। হারুর মা কামিনীর সঙ্গে সে বাড়ীতে কত তাস খেলেছি আমরা। কিনু শবু আমার সঙ্গে যেত, ওরা তখন খুব ছোট, শবু সবার কোলে চড়ে যেত। মেজ বৌমা বিয়ে হয়ে উঠল তিলকদের বাড়ী। আর ছোট বৌমা এসে উঠেছিল ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে। এক এক বৌ-মার আমার এক এক স্মৃতি।'

কিনু বলল—'ছোটকাকীমার বিয়ে হয়ে আসা আমার বেশ মনে আছে।'

শবু বলল—'আমারও। আমি কাকীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কোন ক্লাশে পড়?'

স্মৃতিকথায় ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করার চেষ্টা।

মিতু বলল—'শ্রীলা ছোটবেলায় কি রোগা পাতলা ছিল, আমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতাম। শ্রীলা দৌড়তে আরম্ভ করলেই সমুদ্রের জোর বাতাস ওকে একপাশে ঠেলে নিয়ে যেত।'

শবু বলল—'মা একবার মিতুকে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিল—অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। শ্রীলা আর আমি পাড়ে বসে দেখছিলাম, আর হাততালি দিয়ে আনন্দ করছিলাম—মা সাঁতার দিয়ে কত দূরে চলে গেছে। হঠাৎ এক জেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মা আর মিতুকে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই মা মিতুকে নিয়ে সমুদ্রে ডুবে যেত—কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনি। ভাগ্যিস জেলেটা দেখেছিল।'

কিনু বলল—'জন্মাবার পরে এলাকে যতটা ফর্সা মনে হয়েছিল এখন আর অতটা লাগে না। কাকীমার ছেলেটাও ফর্সা কিন্তু শবুর মত নয়।'

মিতু উঠে কুয়োতলার দিকে গেল। ঠাকুমা বললেন—

'চলল মেয়ে সাবান মাখতে। কেউ যদি শবুকে ফর্সা বলল অমনি সে গিয়ে বসবে সাবান মাখতে—মেজদির মত ফর্সা হবে। আরে ওসব কি সাবান মেখে হয়? তা হলে তোদের ঠাকুমাও তোদের মাকে ছাড়িয়ে

যেত—আমি ত এককালে কম সাবান মাখিনি।'

কথা শুনে মা পদ্মিনী দেবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছেন—আগের আমলে শাশুড়ীর সেই সাবান ঘষা, হাতে পায়ে মুখে হেজলিন ভেজলিন স্নো ক্রীম মাখার দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মিতুও তার ঠাকুমার স্বভাব পেয়েছে। স্কুলের গাড়ী এসে গেছে, মিতুর ভাল করে খাওয়াই হয়নি, না হোক, আগে সাবান স্নো পাউডার মাখা চাই-ই।

দুই

বাড়ীর এই স্বল্প পরিসরে আবার এক নতুন বাসিন্দা এসেছে। শবুদের বড় মাসীর বড় ছেলে—শুভেন্দু।

মামারা আর বড় মেসোমশাইরা পাশাপাশি গ্রামের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার পরিবার—রেষারেষিটা বংশানুক্রমিক চলে আসছিল। বড় মাসীর গায়ের রং কালো, উপযুক্ত পাত্রস্থ করা যাচ্ছে না। সেই অবস্থায় পাশের গাঁয়ের জমিদার বিপত্নীক হয়ে পড়াতে সেই দোজবরে বড় মাসীমার বিয়ে হয়। কুটুম্বিতা হলেও কেউ কারো কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয়—কর্তারা কেউ অপরের বাড়ী যান না, লোকজন পাঠিয়ে সামাজিকতা সারেন। বড় মাসী বাপের বাড়ীর টানে আসা যাওয়া করেন, মা এখনও বেঁচে। মামা বাড়ী গেলে শবুরা ঐ বড় মাসীর বাড়ীতেই যেত নৌকো চড়ে। সেখানে কিন্তু শুভেন্দুদাকে কোনদিন ওরা দেখেনি। যখনই গেছে শুনেছে সে শহরের হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। ওদের ধারণা ছিল সে দাদা না জানি কি এক দিগগজ হয়ে বেরিয়েছে স্কুল কলেজ থেকে।

দাদা আসাতে সব কথা জানা গেল। জমিদারের বড় পুত্র ও, শুধু হোষ্টেলেই থেকেছে, পড়াশুনা ঐ ম্যাট্রিকের বেশী এগোয় নি। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে শুধু টাকা উড়িয়েছে কলেজের খাতায় নামটা লিখিয়ে রেখে। দেখে শুনে জমিদার বাপ টাকা পয়সা কমিয়ে রাশ টেনে ধরলেন। ছেলেও রেগে মেগে মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে চলে গেল যুদ্ধের চাকরি নিয়ে। যুদ্ধ থেমে যেতে ঐ সূত্রেই এক সরকারী চাকরির দৌলতে এই শহরে আসা।

তা ভালই হয়েছে, থাকো। এও ত তার মাসীর বাড়ী। কিন্তু শবু মিতুর বেশ ভালই লাগে—ওদের ত কোন দাদা ছিল না, দাদা পেয়ে সবাই খুশি।

যুদ্ধের চাকরির দৌলতে একটা কিন্তু ভাল হয়েছে—ওদিকে বিষয় সম্পত্তি সব পাকিস্তানে পড়ে গেছে আর সেখানে কি সব কাণ্ড ঘটছে, পাকিস্তানের সম্পত্তির উপর ভরসা কি? শুভেন্দুর এদিকে চাকরি হওয়াতে ভবিষ্যতে একটা পা রাখার জায়গা হয়েছে তাদের।

দাদার কিন্তু সব সময় মুখে বড় বড় কথা। একদিন বলল—

'এ বাড়ীতে দেখি এ বেলার তরকারি ও-বেলাতেও খাওয়া হয়। আমরা একবেলা যে স্বাদ মুখে দিয়েছি আর বেলায় সে জিনিষ মুখে তুলি না।'

ঠাকুমা বললেন—'তা বাবা, তোমরা ত জমিদার আর আমাদের ছিল চাকুরের সংসার—এখন ত আরো দুঃখে কষ্টে পড়েছি। তা ওসব জিনিষ এখানে পাবে কি করে?'

শবু ভাবে, বড়কাকা ঠিকই বলেছিল—দাদা, ওরা যে ঘরের জামাই, তুমি সে বাড়ীর জামাই হলে কি করে?

আবার একদিন শুভেন্দু বলল—'মাসীমা, আমরা মায়ের সাত ছেলে, মায়ের গলার সাতনরী হার। হাজার পাকিস্তান হলেও আমরা মাকে মাটিতে পা রাখতে দেব না, মা থাকবে আমাদের মাথায়। আপনার ত মেয়েরাই সব বড়।'

বোনপোর ঔদ্ধত্যে ও গ্রাম্যতায় মার মুখ লজ্জায় ক্ষোভে লাল হয়ে উঠল। ঠাকুমা তার হয়ে জবাব দিলেন—

'সে সব বাবা ভগবানের হাত। ভগবান কাকে মাটিতে রাখবেন আর কাকে সোনার পালঙ্কে বসাবেন তা কে বলতে পারে?'

কথাবার্ত্তায় দু দিনেই শবুদের দাদা-প্রীতি উবে গিয়ে এক গভীর বিতৃষ্ণা মনে ঠাঁই করে নিল। বাবা মার অসম্মান ওদের বুকে শেল হানে। তা ছাড়া ওরা যে মেয়ে হয়ে জন্মেছে আজ পর্য্যন্ত তার জন্য কোন দিন কারো কাছে কিছু শোনেনি—এ কটাক্ষ যে ওদেরই প্রতি।

শুভেন্দু আরো একধাপ এগিয়ে গেল, মাসের মাইনে পেয়ে তার মেসো-মশাইকে খাই-খরচের টাকা দিতে গেল।

গিরিনবাবু বললেন—'ও টাকা তোমার কাছেই রাখ। তোমরা ত জমিদার, তোমাদের নিয়মই আলাদা। আমাদের এখানে ও-রেওয়াজ নেই।'

বাবার কথায়ও তিক্ততার আভাস। তবু শুভেন্দু থাকে, থেকে যায় আটো সাঁটো জায়গার মধ্যেই। একটা জিনিষ অনেকেরই নজর এড়ায় না। কিন্তুর প্রতি শুভেন্দুর নজরটা ঠিক ভাইয়ের মত মনে হয় না। আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস করা কঠিন। শবুর রীতিমত ঘেন্না লাগে।

অনেকদিন পরে শবুদের আবার বাংলা দেশে যাবার সুযোগ এল। এখন আর বাংলাদেশ নয়—পশ্চিমবঙ্গ। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম বাবা মা সহ কিন্তু শবুরা সবাই পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছে। যেতে হবে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে—বড় মামার বড় ছেলে শুভদা দাদার বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষে দিদিমা মামা মামীরা সবাই বাসা ভাড়া করে জিয়াগঞ্জে উঠেছেন। সেইখানেই মেয়ের বাপের বাড়ী। বিয়ের কদিন বাকি থাকতে গিরিনবাবু সবাইকে নিয়ে জিয়াগঞ্জে পৌছলেন। শুভেন্দুদা চাকরির অজুহাতে মামাবাড়ীর বিয়েতে গেলনা। আসলে সেই জমিদারী রক্ত আর রেষারেষীর ব্যাপার।

ওখানে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল খাওয়া-দাওয়ার ঘটা। ছোটমামা জমিদার-সুলভ পোষাক পরে দু তিনটে চাকর সঙ্গে নিয়ে রোজ সকালে বাজারে যাচ্ছেন। বাজার থেকে মাছ এনে বাড়ীর কুয়োতলায় ঢালা হচ্ছে ভাঁই করে, বারান্দার একপাশে তৈরী হয় তরকারির পাহাড়। দই দুধ ঘিয়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, চলছে নানান রকমারি মুখরোচক মিষ্টির ছড়াছড়ি। লুচি, ডাল, হালুয়া, পায়েস, মিষ্টি ছাড়া সকালে জলখাবার হয় না।

পাশেই গঙ্গা—শবুরা একদিন অল্পস্বল্প স্নানও করল হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে—ওরা ত সাঁতার জানে না, মা জানে। মামাতো ভাইরা ঝপাং ঝপাং করে নদীতে নেমে সাঁতার কাটে।

বিয়ে হয়ে গেল—খাওয়া দাওয়ার ধুমধাম আরও বেড়ে গেল। বিয়েতে একটু ঝামেলা হল। মেয়ের বাবা বিয়েতে যে বরপণ দেবেন বলেছিলেন তা নগদে না দিয়ে মেয়ে জামাইকে একটা বাড়ী লিখে দিলেন—শুধুই মেয়ের নামে। ফলে দিদিমা মামাদের পক্ষে কোন দিন সে বাড়ীতে থাকা সম্ভব হবে না নিজেদের মানসম্মান বজায় রেখে।

প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতে করতে বিয়ে বৌভাত ফুলশয্যা সব মিটে গেল। বিয়ের সময় থেকে শুভদাদাকে যেন সত্যি সত্যিই রাজপুত্রের মত লাগছে, নতুন বৌদিও অনেক গয়না পরে থাকে। মামাদের বাবুগিরির দাপটে স্থানীয় বাজারে মাছের দাম বেড়ে গেছে—সব থেকে ভাল আর বড়মাছ সে ছোট-মামা কিনবেই যত দাম লাগে। দই মিষ্টির দরও বেড়ে যাবার উপক্রম হল। এমন কি পথে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা পর্যন্ত দেড়গুণ দুগুণ ভাড়া হাঁকতে লাগল! কেউ ডাকে—'রায় সাহেব, এ গাড়ীতে আসুন'—কেউ বলে 'রায়বাহাদুর পূর্বপাকিস্তানের এক রাজা।'

দেখে শুনে গিরিনবাবু খেতে বসে একদিন শাশুড়ী ঠাকরুনের উপস্থিতিতে বড় সম্বন্ধীকে বলেই ফেললেন—'দাদা, এভাবে টাকা খরচ না করে হিন্দুস্থানে কোথাও একটা বাড়ী কিনে ফেলুন।'

বড রায়মশাই তখন ক্ষীরের বাটিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। ছোটভগ্নীপতির প্রস্তাব শুনে আড়চোখে একবার তাঁর দিকে চেয়ে গোঁফের ফাঁক দিয়ে শুধু একটু মৃদু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

শবুরা মার কাছে শুনেছে বিয়ের বাবদে মামারা এক মাসের জন্য জিয়াগঞ্জে এসেছেন লাখ টাকা নিয়ে। সবটাকা শুধু বাবুগিরি করে আর খেয়েই উড়িয়ে দিচ্ছেন—বেশীদিন এ অবস্থায় আর এখানে থাকতেই পারবেন না—নিজেদের জমিদারীতে ফিরে যেতে হবে। বড় দাদার সেই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের হাসি পতিপ্রাণা পদ্মিনী দেবীর মনে গভীর আঘাত হানল—সেকাল হলে হয়ত সতীর মত দেহত্যাগ করতেন। শবুরাও দেখল বড়মামা কোন জবাব না দেওয়াতে অপমানে বাবার মুখটা কি রকম কালো হয়ে গেল। টাকা আছে ঠিকই, তাই বলে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়—সর্বম্ অত্যন্তম গর্হিতম্—শবু সংস্কৃত বইতে পড়েছে।

একদিন পরেই শবুরা বাবা মার সঙ্গে নিজেদের শহরে ফিরে এল। জিয়াগঞ্জে গিয়ে একটা লাভ হয়েছে—একদিন আজিমগঞ্জে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজার দুয়ারী, মোতিঝিল প্রাসাদ, খোসবাগ, যে ঘরে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী করে রেখেছিল, যেখানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই সব ঐতিহাসিক স্থান ওরা ঘুরে দেখে এসেছে। স্কুলে ইতিহাস শবুর খুব প্রিয় বিষয়। কত ইতিহাস মুর্শিদাবাদের মাটিতে।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে—কিন্তু পাশ করেছে। এখনই পাত্র জোটানো, বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সাংসারিক অনটনের জন্য। অগত্যা তাকে কলেজে ভর্তি করা ঠিক হল। কিন্তু এখানকার কলেজে ভর্তি করা ঠিক হবে না—এখানে কো-এডুকেশন। শুভেন্দুর নজরটাও ভাল মনে হচ্ছে না, অথচ তাকে বাড়ী থেকে চলে যেতেও বলা যায় না। কটকে মেয়েদের আলাদা কলেজ আছে, হোস্টেলও আছে। কিন্তু সেখানেই গিয়ে আই এ ক্লাশে ভর্তি হল। শবু উঠেছে ক্লাশ টেনএ, মিতু সিন্ধু আর নন্দু বড়মার স্কুলে পড়ছে।

দিদি কটকে গিয়েছিল শবুদের ছোট ভাইটার মুখে ভাতের পরদিনই। ছোটভাইয়ের নাম হয়েছে অমিয় কান্তি মৈত্র—সংক্ষেপে অমু কিন্তু সবাই

আদর করে ডাকে ডাবু, ডাবুলাল বলে—কানাইলালের ভাই ডাবুলাল। ডাবু জন্মে থেকেই অসম্ভব রুগ্ন তাই ওর প্রতি সবারই স্নেহ একটু বেশী।

এবারে পাঁজি পুথি দেখে ছোটকাকার ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হয়েছে—অনুষ্ঠান হবে ভুবনেশ্বরে কাকার কোয়ার্টারে। প্রথম ছেলে ত, তাই একটু ভাল করে অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে সকলের। ভুবনেশ্বরে গিরিনবাবু যেতে পারছেন না তাঁর প্র্যাকটিস ফেলে, বড়কাকা হৈম বাবুও তাঁর অফিসের কাজের জন্য আটকে গেলেন। শুভেন্দুও যাবে না। ঠাকুরের হাতে বাড়ীর রান্নার ভার রইল। ঠাকুমা মা ও বড়কাকীমার সঙ্গে শবুরা সব ভাইবোন যাবে। ছোটকাকা এসে সবাইকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে গেল। কিন্তুও সেখানে এল কটক থেকে।

প্রথম দিনই সবাই মিলে দেখতে গেল সেই রাক্ষুসে গঙ্গুয়া নদী—যে নদীতে একদিন ভেসে গিয়েছিলেন মৈত্র মহাশয় মহিমবাবু, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পুরো মৈত্র পরিবারটিকে দুর্দশার সাগরে। বাড়ী থেকে আধমাইল হেঁটে গিয়ে সবাই পৌঁছল গঙ্গুয়ার সেই ঘাটে যেখান থেকে মহিমবাবু সেদিন তাঁর শেষ যাত্রা শুরু করেছিলেন। অবিনাশবাবু সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এখনও সেই বর্ষাকাল, নদী কানায় কানায় ভরা, তবে সেই বন্যার পরিবেশ নেই।

ঠাকুমা স্বামীকে স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধায় নদী থেকে অঞ্জলি ভরে জল তুলে নদীতে অর্ঘ দিলেন স্বামীর উদ্দেশে 'ওঁ গয়া গঙ্গা গদাধর হরি'। পরে নদী থেকে জল নিয়ে নিজের মাথায় ও আর সবার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। এ যেন একরকম স্মৃতিতর্পণ—শান্তি বারি বর্ষণ। ঠাকুমার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, অবসন্নভাবে বসে পড়লেন নদীর কূলে। অবিনাশবাবু মা একটু শান্ত হলে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, তারপর মার হাত ধরে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন। মা কাকীমাদেরও চোখে জল, কাঁদে কিন্তু শবুও। মিতু ছাড়া শ্রীলা এলা নন্দ কানাই—কেউ দাদুকে দেখেনি, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ফিরে চলল।

পরদিন ভালভাবেই অন্নপ্রাশন পর্ব মিটল। ছেলের নাম রাখা হল প্রবাল কুমার মৈত্র—তাকে সবাই বাবুলাল বা বাবু বলে। নন্দলাল, কানাইলাল, ডাবুলাল, বাবুলাল—চার ভাই। বাড়ীর ব্যাপার মিটলে অবসর হয়ে একদিন পরে সবাই চলল উদয়গিরি খণ্ডগিরি বেড়াতে। ঠাকুমা, বড় ও ছোট-কাকীমা বাড়ীতে রইলেন বাবু ও ডাবুকে নিয়ে। বড়কাকীমাকে সবাই বার

বার যেতে বলল। বড় কাকীমা গেলেন না, বললেন—

'ও সব পাহাড় টাগাড় দেখে কি হবে, আমার ভাল লাগেনা।'

মা পদ্মিনী দেবীর এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ—কোথাও বেড়াতে যাবার কথা হলেই একেবারে ছেলেমানুষের মত নেচে ওঠেন।

সকাল সকাল নয়জনের একটা দল তিনটে রিক্সায় চেপে পাহাড়ের নীচে পৌঁছল। শবুদের এই প্রথম পাহাড়ে চড়া। সবাই দৌড়োদৌড়ি করে পাহাড়ে উঠতে লাগল। একটু যেতেই দম ফুরিয়ে একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল এবার আর দৌড়ানো নয়, হেঁটে হেঁটে ওঠো। এই ছোট টিলার মত পাহাড়ে উঠতেই এই অবস্থা, তবে দার্জিলিং বা হিমালয় পাহাড়ে লোকে ওঠে কি করে? পাহাড় বলতে সকলের চোখে ভাসে সাদা বরফে ঢাকা হিমালয় পাহাড়ের চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি, গৌরীশঙ্কর, এভারেস্ট—ভূগোলের সব বিবরণ।

•উদয়গিরিতে কত কারুকার্য্য করা গুহা আর খণ্ডগিরিতে দাঁড়ানো পাথরের এক বিশাল দিগম্বর মূর্ত্তি। বারবার পাহাড়ে উঠা নামা করতে করতে হয়রান হয়ে সবাই ধর্মশালার কুয়োর জল খেয়ে এসে রিক্সায় বসল। এবার রিক্সাগুলো গড়িয়ে দ্রুত গতিতে নামতে লাগল।

নামার মুখে একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলেকে নিজের সাইকেলটাকে ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখে ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন—

'বাঙালী মনে হচ্ছে, সাইকেল খারাপ নাকি?'

'আজ্ঞে না।' জবাব পেতে পেতে রিক্সা তিনটে গড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে। শবু বলল—

'আসার সময় আমাদের রিক্সাগুলোকেও হেঁটে হেঁটে টেনে তুলছিল।'

'কঙ্কু বলল—'এতগুলো মানুষ নিয়ে রিক্সা চালাবে কি করে? ঐ লোকটা নিজের সাইকেলই ঠেলে উঠাচ্ছে।'

মিতু বলল—'ঠিক যেন আমাদের ওখানকার উঠানিয়া বাট—সেখানেও রিক্সাগুলোকে এমনি করে ঠেলে তোলে।'

পাহাড় সম্পর্কে ওদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। পদ্মিনী দেবীর যদিও এ পাহাড় আগে দেখা স্বামীর সঙ্গে এসে তবু একেবারে নতুন দেখার মতই আনন্দে উচ্ছল। পরদিন সকলে ফিরে এল ভুবনেশ্বর থেকে।

আবার স্কুল শুরু হয়েছে। কদিন পরে আবার শবু ও মিতু তাদের স্কুলে

যাবে বলে তৈরী হয়েছে। হীরাকে শবুদের বাড়ীর পাশ দিয়ে স্কুলে যেতে হয়। সেও এসেছে। সকলে মিলে শাহীর মোড়ে পৌঁচেছে এমন সময় একজন ভদ্রলোক মিতুকে জিজ্ঞেস করল—

'খুকী, মন্দিরে যাবার রাস্তা কোনটা?'

মিতু আঙুল দিয়ে পশ্চিমের রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে তারা সেই দিকে চলতে লাগল। ভদ্রলোকের সঙ্গে এক বিধবা, বোধ হয় মা হবেন, আর একটি লোক তার হাতে ঝোলানো ক্যামেরা। মনে হচ্ছে তারা সমুদ্রে স্নান করে মন্দির দেখতে যাচ্ছে। এরকম সবদিন কত লোকই যায়।

হীরা জিজ্ঞেস করল শবুকে—'চিনিস নাকি?'

'নাঃ।' শবু জবাব দিল।

মিতু বলে উঠল—'নারে মেজদি, ঐ যে ক্যামেরা হাতে লোকটা, ওকে আমরা উদয়গিরির পথে দেখেছিলাম সাইকেল ঠেলে উঠছিল। এতক্ষণ আমাদের মনযোগ দিয়ে দেখছিল।'

শবু পথ চলতে কারো দিকে তাকায় না। মিতুর কথায় দূরে চলে যাওয়া দলটির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল—

'হাঁ, সেই লোকটিই মনে হচ্ছে। তবে এরকম লোককে চেনা লোক বলেনা।'

হীরা বলল—'তবু দেখ, একদিন লোকটাকে তোরা এক পলক দেখেছিলি আজ দেখে চিনতে পারছিস। আর দেখ আমাদের স্কুলে দুদিন হল নতুন এক মিসট্রেস এসেছে, তোকে দেখিয়ে দেব, বন্দনা দি—কটকে আমাদের জ্যেঠার বাড়ীর পাশেই তাদের বাড়ী, কতবার তাকে সেখানে আমি দেখেছি সেও দেখেছে অথচ এই স্কুলে এসে আমাকে যেন চিনতেই পারছে না। বেশী ঢং!'

তা ঠিক, শবু একবার যাকে দেখে সহজে তাকে ভোলে না। ওদের ডোমেষ্টিকের বইতে পড়েছে মানুষের মগজে নাকি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সূক্ষ্ম কোষ আছে যাদের কাজ হচ্ছে প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি ঘটনা সেখানে জমা করে রাখা—প্রয়োজনে সে গুলো মগজ থেকে মনে এসে সব স্মরণ করিয়ে দেয়। শবুর স্মৃতিশক্তি খুব—কেবল অঙ্কের বেলাতেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। অথচ দু তিন ক্লাশ নীচে থাকতেও সে অঙ্কে একশর মধ্যে নব্বই পেয়েছে।

তিন

দিদি ভুবনেশ্বর থেকেই আবার হোস্টেলে চলে গেছে। শবুর একা একা লাগে—দিদি ওর সব সময়ের বন্ধু। এখন সে আপন মনে পড়াশুনা করে, স্কুলে যায়, ছোটভাইবোনদের দেখা শোনা করে। আর দিদি না থাকাতে সব সময় বাড়ীতে মার কাছাকাছি থাকে। মার মত ভাল সে আর কাউকে বাসে না। মাতে আর মেয়েতে অদ্ভুত মিল, কি চেহারায় কি মনে। শবু মাথায় একটু লম্বা হয়েছে, তা বয়েসকালে ওরকম একটু দেখায় বৈকি।

ভাই বোনেরা বাড়ীতে বই নিয়ে বসে চেঁচিয়ে যে যার পড়া পড়ে। শুভেন্দু দা মাঝে মাঝে ওদের পড়াশুনার দিকে নজর দেয়। শবু কিন্তু শুভেন্দুদাকে মোটেই পাত্তা দেয় না, নিজের মনে পড়ে। ছোটগুলো আর মিতুকে নিয়েই দাদার সব কেরামতি। ঠিকমত না পড়লে দাদা যখন তখন ওদের চুলের মুঠি বা কান ধরে টানে। একদিন পড়ানোর মধ্যে দাদা মিতুর গালে একটা চড়ই কষিয়ে দিল। মিতু চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ছোট বাড়ী, দুখানা মাত্র ঘর—সকলেরই কানে গেল সে কান্নার আওয়াজ। ঠাকুমা সংযত কণ্ঠে বললেন—

'ওকে মারলে, শুভেন্দু?'

শুভেন্দু রাগ দেখিয়ে বলল—'পড়াশুনায় ওর যা অমনোযোগ, আমাদের গ্রামে হলে উঠোনের পেয়ারা গাছের সঙ্গে বেঁধে ওকে মারা যেত, তবে ঠিক হ'ত।'

ঠাকুমা গম্ভীর হয়ে বললেন—'এটা তোমাদের গ্রাম নয়, শুভেন্দু। বাড়ীতে পেয়ারা গাছও নেই। তাছাড়া এ বাড়ীতে আমরা কেউ কারো গায়ে হাত তুলিনা। অমনোযোগের কথা যদি বল, সময়কালে নিজে যদি মনোযোগ দেখাতে তবেই কি ভাল হ'ত না?'

শুভেন্দু রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে দাদা আর ভাই বোনদের লেখাপড়া দেখাশোনা করা একেবারে ছেড়ে দিল। শুধু খাবার সময় খায়, অফিস যায় ও অবসর সময় পাড়ার ক্লাবে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। বন্ধু বান্ধবরা বলে জমিদার-নন্দন, রায়-সাহেব। বড়কাকা হৈম-

বাবুর নতুন বিয়ে হয়েছে, তাই এ সব ব্যাপারে এখন আর তেমন মন দেন না। অন্য সময় হলে রসালো কথার খোঁচায় জমিদার নন্দনকে মজাটা বুঝিয়ে দিতেন নিশ্চয়ই। গিরিনবাবু পদ্মিনী দেবীর পক্ষে কিছু বলা শোভন নয়—শুধু সহ্যই করে যাচ্ছেন।

নন্দু এমনিতে খুব শান্ত-শিষ্ট—কোন দুরন্তপনা করে না। সকলের খুব বাধ্য। আর ঠাকুমার ত সে নয়নের মণি। তাঁর, শুধু তাঁর কেন মৈত্র পরিবারের সবারই ধারণা, মহিমবাবু এই নাতির মধ্য দিয়ে এ সংসারে ফিরে এসেছেন। ঠাকুমা তাকে ডাকে 'ছোট কর্ত্তা' বলে। এই পুরুষে সে প্রথম পুত্র-সন্তান, সুতরাং এ বাড়ীতে তার একটা বিশেষ আদরের স্থান আছে। আছে কিছুটা প্রশ্রয়। এখন সে বড়মার স্কুলে পড়ছে। সেখানে তার অনেক বন্ধু হয়েছে। পড়ায়ও কিছু বন্ধু আছে। এই বাসা বাড়ী থেকে ওদের পুরোনো বাড়ী মাত্র দুতিন মিনিটের পথ। কীসের যেন আকর্ষণে একদিন ছুটির সকালে নন্দু দু তিনজন বন্ধু সঙ্গে করে পুরোনো বাড়ীটা ঘুরে এল। এসে সরল মনে মা ঠাকুমা দিদিদের সামনে সে কাহিনী শোনায়। বলল—

'জান মা, রঞ্জু ভিক্টর শামু আর আমি আজ সকালে পুরোনো বাড়ীটায় গিয়েছিলাম। দেখলাম বাড়ীর গেটে মস্ত বড় তালা ঝুলছে। বাড়ীটাতে একটা লোকও নেই। আমরা ওপাশে বালির ঢিবির উপর দিয়ে ভাঙা গোয়ালঘরের ধার ঘেঁষে খিড়কীর সামনে গেলাম। দরজাটা বাইরে থেকে কাঠি দিয়ে খোলা যায় আমি জানতাম—আগে ওখানে থাকতে কতবার খুলেছি। আজও খুলে আমরা বাড়ীর ভিতর ঢুকলাম।

'দেখি সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। সারা উঠোনে ঘাস গজিয়েছে। দু তিনটে ঘরের দরজা নেই, কয়েকটা জানালার পাল্লাও নেই। দরজাগুলো ত আমাদের সঙ্গে এসেছে—জানালাগুলো নিশ্চয়ই চুরি হয়ে গেছে। ঘর বারান্দা সব ধুলো বালিতে ভরা, ছেঁড়া ভাঙা জিনিষ পত্র চারদিকে ছড়ানো। দেখতে দেখতে আমার কান্না পেয়ে গেল। বন্ধুরা বলল—চল, আমরা চলে যাই না হলে তোর আরও মন খারাপ লাগবে। খিড়কী দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে আমরা চলে এলাম। আচ্ছা মা, সরকার কে? সরকার বাবুরা ত কেউ সেখানে থাকে না—তবে শুধু শুধু আমাদের ঐ বাড়ী থেকে উঠিয়ে দিয়ে কেড়ে নিল কেন?'

বলতে বলতে নন্দু কেঁদে ফেলল।

এতক্ষণ সকলে অবাক হয়ে ওর বর্ণনা শুনছিল—সকলেরই অবচেতন মন দিনরাত ঐ বাড়ীটাকে ঘিরে ঘুরপাক খায়, ঘুমের ঘোরে ঐ বাড়ীটাকে স্বপ্নে দেখে। নন্দুর সরলতা, বুদ্ধি ও বাড়ীটার প্রতি মমতায় সকলে আভিভূত হল। ঠাকুমা প্রবল কান্নায় নন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—

'ওরে আমার দাদুরে, এই ত উপযুক্ত ছোটকর্তার মত কথা। কেন ঐ বাড়ীটা কেড়ে নিল তুই বড় হয়ে সরকার বাবুকে জিজ্ঞেস করিস।' পরে উপস্থিত দুই পুত্রবধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'বাড়ীটার প্রতি ওঁর যে কি ভীষণ টান ছিল, যেন নিজেরই অস্থিমজ্জা। সেই টানে একেও পেয়েছে। এ ত ভাল নয়। ঐ বাড়ীটার টানেই উনি আমার ছোটকর্তা হয়ে এসেছেন। সেই বাড়ী চলে গেছে—আমার ছোটকর্তা তা কি করে সহ্য করবে?'

এ বাড়ীর সবাই শুনেছে নন্দুর জন্মের আগে পদ্মিনী দেবীর সেই স্বপ্নের কথা—সকলেরই বিশ্বাস মহিম বাবুই নন্দু হয়ে ফিরে এসেছেন এসংসারে।

শবু অভিমানে যে বাড়ীর দিকে তাকাতে পারে না ভাইয়ের মুখে তার রিক্ত শ্রীহীনতার বর্ণনা শুনে করুণায় বিগলিত হল। সেই সুন্দর সদা কোলাহল-মুখর জন্মভিটার এই অবহেলিত অনাদৃত রূপ তার মনকে পীড়িত করে, চোখে বয়ে আনে জল। মনে পড়ে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এখন থেকে পথে যেতে সে-মাকে দেখে শবু আর অভিমানে মুখ ফেরাবে না—জন্মভিটাও ত মা, জন্মাবামাত্রই তাকে কোলে ধারণ করেছিল, আর এ মা যে একেবারেই অবলা।

দুপুরে খেতে বসে বাবা বড়কাকা ঠাকুমার মুখে সব কথা শুনলেন। বড় কাকা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন—

'সরকারের কাজই ঐ রকম। কবে কি কাজে লাগবে, দাও সবাইকে ঠেলে উঠিয়ে। গায়ের জোর আর কি?'

বাবা বললেন—'শুনতে পাচ্ছি ওখানে নাকি টিচার্স কোয়ার্টার হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ত কিছু জানাচ্ছেনা। কানাঘুষায় শুনছি পনরো ষোল হাজার টাকার বেশী দেবে না।'

ঠাকুমা বললেন—'ওমা সেকি কথা! অতবড় বাড়ী যুদ্ধের পরে এই চড়া বাজারে নাকি ঐ টাকায় হয়?'

বড়কাকা বললেন—'সরকারের যেমন আঠারো মাসে বছর, দামও দেবে তেমনি আঠারো বছর আগেকার দরে। বাবা কাজ করতে করতে মারা

গেলেন ছেলেদের কাউকে ত উপযুক্ত চাকরি দিলই না, মাকে পেনসন দিচ্ছে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা মাসে।'

বাবা বললেন—'আমি ভাবছি মাকে আর পেনসন আনতে পাঠাবো না। ছমাস পর পর হাকিমের সামনে গিয়ে মাকে দাঁড়াতে হয়, বলতে হয়—ছেলেরা আমাকে খাওয়াতে পরাতে পারছে না। এতে আমাদের কারোই মানসম্মান বাড়ে না।' শেষে শেষ কথা বললেন, 'আর যেন কেউ কখনও ও বাড়ীতে না যায়।'

ঠাকুমার পেনসনের কথায় শবুর মনে পড়ে গেল সে যখন আরো ছোট ছিল তখন ঠাকুমা ওদের দুএক জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া গাড়ীতে করে কাছারির সামনে গিয়ে গাড়ী দাঁড় করাতে বলতেন। ঠাকুমার পরনে থাকত সাদা থান ও গায়ের চাদর, খালি পা। সেখানে গাড়ীর মধ্যে দরজা দুটো একটু ফাঁক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা। এক সময় উকিল হিতেন বাবু এসে ঠাকুমাকে নিয়ে গিয়ে হাকিমের সামনে হাজির করতেন। সেখানে কি সব কথাবার্তা হ'ত, লেখাপড়া হ'ত। পরে ঠাকুমার হাতে কিছু টাকা গুণে দিত। ঠাকুমা সেই টাকাগুলো হাতে করে নাতনীদের হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আবার গাড়ীতে এসে উঠতেন। বাড়ী ফিরে এসেও ঠাকুমার সে চোখের জল সহজে থামত না।

এখন শবুরা বড় হয়েছে, তাই নন্দু-কানাইরা সঙ্গে যায়। আর ঘোড়া গাড়ীর বদলে হয়েছে রিক্সা। শহরে ঘোড়াগাড়ীর চল প্রায় উঠেই গেছে, শুধু সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলাতে অতি মন্থর গতি এক দুটো ছ্যাকরা গাড়ী এখনও দিনে বারদুই শহর পরিক্রমা করে। শবু এখন আর হ্যাণ্ডবিল কুড়োয় না। এখন সে কাজ হয়েছে কানাইয়ের।

শোনা যাচ্ছে এবার এখানকার বারোয়ারী দুর্গাপূজা হতে পারবে কিনা ঠিক নেই। সঙ্গীত সম্মিলনী নামে ক্লাব যে বাড়ী আর মাঠ ব্যবহার করত তার মালিক বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছে। নতুন মালিক ক্লাব তুলে নিতে বলেছে। ক্লাবের ও শহরের মাতব্বর মানুষ সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—শহরে বাঙালীদের একটা মাত্র পুজো, তাও কি বন্ধ হয়ে যাবে? কোথায় একখণ্ড জমি পাওয়া যায়—হিতেনবাবু, রাখহরিবাবু, গোকুল বাবুদের মত বয়স্করা থেকে শুরু করে গিরিন, হৈম, চন্দ্রকান্ত, বংশী, যদু, সন্তোষ, জমিদারের দুই ছেলে নীলু ও হেমু (জমিদার বাবুর দেহান্ত হয়েছে), সমুদ্রের ধারের

হোটেল পাড়ার ভিক্টর ও সরকারবাবু সবাই উঠেপড়ে লেগেছেন সেই খোঁজে। একখণ্ড জমি যোগাড় করতেই হবে। শেষে সতীন্দ্র ধামের সদাশয় মালিকের বদান্যতায় তাঁরই বাড়ীর পিছনের বেশ কিছুটা জমি দান হিসেবে পাওয়া গেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গীত সম্মিলনী 'দুর্গাবাড়ী' নামে নবজন্ম লাভ করল। এতদিনে ক্লাবের একটা স্থায়ী আস্তানা হল।

এখন অনেক কিছু গড়ে তুলতে হবে, পূজামণ্ডপ, ভোগের ঘর, থিয়েটারের পাকা ষ্টেজ, মাঝখানে মাথার উপর আচ্ছাদন, চারপাশের ঘেরা দেওয়াল-গেট। সব একটু একটু করে হবে। এবারে একটা অস্থায়ী বেদী করে উপরে ছাউনি দিয়ে খুব আনন্দে ও ধুমধামের সঙ্গে ক্লাবের নিজের জমিতে প্রথম দুর্গাপূজা হল। শহরের আর সকলের সঙ্গে শবুরাও পূজায় খুব আনন্দ করল, যদিও উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে নাটক ভাল জমল না। এত ঝামেলার পর নাটকের দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? গান-বাজনা নাচের আসর কিন্তু বেশ জমেছিল—অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল।

শবু দশম শ্রেণীতে উঠতে ক্লাশের ছাত্রী সংখ্যা অনেক কমে গেছে। শুভাষিণী বিয়ের পরও এতদিন স্কুলে আসত, এবারে তার স্বামী তাকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে গেছে। অর্চনা পাত্র, মল্লিকা রথ, উষা মহান্তি, দময়ন্তী দাস, বিমলা পট্টনায়ক, পুষ্পিতা পাণ্ডা, সরস্বতী পানিগ্রাহী এরা সবাই বিয়ে হয়ে স্কুলে আসা ছেড়ে দিল। উমা মহাপাত্র, রিনা রায় ট্রান্সফার নিয়ে বাবা মার সঙ্গে অন্য শহরে চলে গেল। তপতী, ইন্দুমতী, চাঁদমণি, রূপা এরা সব সাংসারিক কারণে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ক্লাসে ছাত্রী সংখ্যা ত্রিশ থেকে পনর ষোলয় নেমে এসেছে।

হীরা অবশ্যই আছে। আর আছে উর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, লাবণ্য, সীমন্তী। এই চার পাঁচজনই ক্লাশে শবুর খুব কাছের বন্ধু। তার মধ্যে হীরাই শুধু স্কুল ও স্কুলের বাইরের সব সময়ের বন্ধু। স্কুলে যতক্ষণ থাকে ওরা পাঁচ ছ জন কাছাকাছি বসে, টিফিনে ঘেরা মাঠে গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে নানা গল্প করে। এখন বেশীরভাগ গল্প কথাবার্তা নিজেদের পড়াশুনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সামনের বছর সব ক্লাশ ইলেভেনে উঠবে—তারপরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এখন থেকে জোর পড়াশুনা না করলে সে বৈতরণী পার হওয়া মুস্কিল।

যুদ্ধ অনেকদিন থেমে গেছে—দেশ স্বাধীন হয়ে সেও পুরোনো হয়ে গেছে।

তবে মাঝে মাঝে নতুন কোন কোন সিনেমা এসেছে—অশোক কুমার, মীনা কুমারী, নার্গিস, দিলিপ কুমার এসব নিয়েও আলোচনা হয়। কোনদিন হয়ত নতুন খবর থাকে—কোন এক চেঞ্জার বাহাদুরী করে একা একা সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে! সমুদ্র অবশ্য কোন জিনিষই নেয় না—সমুদ্রের এই এক অদ্ভুত চরিত্র। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সবই আবার ফিরে আসে—বড় জিনিষ খুঁজে পেলেও ছোট জিনিষগুলি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সকালে বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া, সূর্যোদয় সূর্য্যাস্ত দেখা, দুপুরে সমুদ্রে স্নান করা এসবই বেশীর ভাগ করে বাইরের ভ্রমণার্থীরা। স্থানীয় লোক বিশেষ যায় না—বাইরে থেকে আত্মীয় স্বজন এলে তবেই যায়। সমুদ্রে ডুবে যাবার মত দুর্ঘটনা ঘটায় সাধারণতঃ ঐ বাইরের ভ্রমণকারীরা।

এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে কাল। একজন লোক সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। মাত্র তিনমাস আগে বিয়ে হওয়া তার বৌ-এর বুক ফাটা কান্না অনেকেই শুনেছে। আজ টিফিনের আলোচনায় সেই বিষয়টাই প্রাধান্য পেয়েছে।

সীমন্তী বলল—'দেখছিস ত ভাই, মেয়েদের ভাগ্য। স্বামী চলে গেল ত সব গেল।'

করুণা বলল—'সব দোষ সে মনুষ্যটির। গোটিএ তুন্নিয়াকু সঙ্গে নেলেনি কাহি কি? তেলে টঙ্কাটা লাগিথান্তা। টঙ্কাটে পাঁই জীবন দেলে!'

'যেতে সব হীরো'—উর্মিলা উর্মিমালার মতই ফুঁসে উঠল যেন—'জানি-নাহান্তি কিছি, যাইছি সমুদ্রর সঙ্গে লড়াই করিবাকু!'

শর্মিষ্ঠা বলল—'ছেলেদের বেশ মজা। যদি বউ মরত, আবার দুদিন বাদে ড্যাং ড্যাং করে আর একটা বিয়ে করতে যেত। আর যদি নিজে মরল, ত থাকো বৌ তুমি বাকি জীবন বিধবা হয়ে।'

দীপা বলল—'সেই জন্যই ত ভাই ভাল করে লেখাপড়া করা দরকার। সেরকম কিছু হলে একটা চাকরি জুটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে, পরে নিজের পছন্দ হলে আর কাউকে বিয়ে করাও যাবে।'

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল, বৌটার ভাগ্যের কথা ভেবে সকলের মনই বেদনায় ভরে উঠেছে। কিছু পরে সীমন্তী বলল—

'কিরে শ্রাবণী, তুই যে কিছু বলছিস না?'

শবু চিরকালই কম কথা বলে। জিজ্ঞেস করাতে একটু ভেবে বলল—

'ভাবছিলাম মানুষের ভাগ্যের কথা। যা চাওয়া যায় তাই কি পাওয়া

যায়? আমার মনে হয় বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে সধবা থাকতে যাওয়া ভাল।'

বন্ধুরা শুনে কেউ বলল, 'একেবারে সতী সাবিত্রীর মত কথা' কেউ বলল 'দার্শনিক'। শবুর চোখের সামনে ভাসতে লাগল বিধবা কত্তামা ঠাকুমা ও বড়মার মুখগুলি। বলল—

'মনে নেই, বড়মার সেই কথাগুলো—মেয়েদের স্বামীর ঘরই হল আসল ঘর। তাই স্বামী না থাকলে সে ঘরও আর থাকেনা।'

সীমন্তী আর শর্মিষ্ঠা শবুর সঙ্গে বড়মার স্কুলে পড়েছে—ওরা চুপ করে গেল।

শুধু বড়মাই বা কেন, বাড়ীতে মা, ঠাকুমাও এব্যাপারে তাঁদের মনের কথা যা বলেছেন তাও শবুর মনে গাঁথা হয়ে আছে। এ ধরনের ঘটনা এ শহরে প্রতি বছরই দু-একটা ঘটে—এমন বছর খুব কম যায় যে বছর একটি লোকও সমুদ্রে ডুবে মারা যায় না। তাই এ সব ঘটনা স্থানীয় লোকদের মনে খুব একটা আলোড়ন জাগায় না। খবরের কাগজের হেড লাইনের মত শুধু খবরটা শুনে যায়। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ঐ রকম একটা কচি বৌ-এর ভাগ্যের কথা ভেবে কেউ আর অন্যমনস্ক থাকতে পারে না। ঠাকুমা ত বিশেষ ভাবে অভিভূত এই ঘটনায়—এও যে জলে ডোবার ঘটনা—নিজের জীবনের সেই দুর্যোগময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিলাপের সুরে আজ সকালেই তিনি বলছিলেন—

'আহা, বেচারীর কি সর্বনাশ হয়ে গেল! ওর জীবনে আর কি রইল? এখন না পাবে স্বামীর ঘর না থাকবে বাপের ঘর। শশুরবাড়ীতে থাকলে শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণা, বাপের বাড়ী গেলে ভাইবৌদের খোঁটা আর মা বেঁচে থাকলে তার চিরস্থায়ী অন্তর্বেদনার কারণ।'

মা বলেছিলেন—'ঐ কচি বৌটার কথা ভেবে কাল রাতে আমি ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। স্বামীর সোহাগ বেশী দিন কপালে জুটলো না, সংসার করাও হল না। এখন ওর কি হবে?'

বড় কাকীমা ফস করে বলে ফেললেন—'আর একটা বিয়ে করলেই হয়।'

ঠাকুমা বলেছিলেন—'সে না হয় হল—এখন নাকি ও সবের চল হয়েছে। কিন্তু ভাঙা জিনিষ কি জোড়া লাগে, না তাতে সুখ পাবে?'

মা বলেছিলেন—'আপনার বড় ছেলে ত বলছিল, সরকারের উচিৎ জেলেদের সাহায্য ছাড়া কাউকে সমুদ্রে নামতে না দেওয়া। 'সে'-ও খুব দুঃখ করছিল মেয়েটার কথা ভেবে। আমিও একবার মিতুকে নিয়ে ডুবতে ডুবতে

অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম।'

শবু মনে মনে ভাবছে, বাবা ঠিক কথাই বলেছেন, সমুদ্রে কাউকে একা নামতে দেওয়াই উচিৎ নয়।

একটি ঘটনায় শহরের লোক চঞ্চল হয়ে উঠল।

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে কলেজের একটি মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বসেছে। সে ছিল দিদিদের বন্ধু—শর্মিলা। স্কুলে পড়ার সময় লোকটি শর্মিলার গৃহশিক্ষক ছিল।

শহরের নবীনা প্রবীণা সবাই এক বাপ বয়েসী লোকের সঙ্গে এমন কাণ্ড করায় শর্মিলার উদ্দেশ্যে ছি ছি করতে লাগল। প্রবীণারা বললেন—

'একটা বাপ বয়েসী লোককে ঐ পুঁচকে মেয়েটা পছন্দ করলো কি করে? শিক্ষক ত পিতৃতুল্য।'

নবীনারা বলল—'ও লোকের তো আর একটি সংসার আছে—জেনে শুনে শর্মিলা সতীনের ঘর করতে গেল? কথায় বলে সতীন-কাঁটা। স্বামীকে যমের হাতে দেওয়া যায় তবু সতীনের হাতে নয়। আগের বৌটার কপাল পুড়লো—সে সহ্য করবে কি করে?'

শর্মিলার মা বেঁচে নেই। বাবা তাকে ডেকে এনে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। আত্মীয় স্বজনরা অনেক উপদেশ দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শর্মিলা কারো কথা শুনল না, আবার চলে গেল সতীনের ঘর করতে।

প্রাচীনারা আবার বললেন—'আহা, মা-মরা মেয়ে ত। মা থাকলে নিশ্চয়ই এমনটি হ'ত না।'

হীরা আর শবুর একান্ত আলোচনায় সে কথা হচ্ছিল। হীরা বলল—

'জানিস, ওদের কাব্য রোগে ধরেছিল। লোকটা শর্মিলাদিকে সাহিত্য পড়াতো।'

শবু বলল—'কি জানি ভাই, কিসে কি হয়। আমার কিন্তু রীতিমত ঘেন্না লাগছে। শর্মিলাদি কি সুন্দর শান্ত শিষ্ট মার্জিত ছিল—সে-ই এমন কাজ করল।'

গরমের ছুটিতে দিদি কিন্তু এসেছে কটক থেকে। শবু তার অনেকদিনের জমানো গল্প করতে গিয়ে এক সময় বলল—

'জানিস দিদি, তোর বন্ধু শর্মিলাদি কি করেছে?...'

কিন্তু মাঝপথে বাধা দিয়ে বলল—'আমি জানি। শর্মিলা তার মনের কথা আমাকে আগেই বলেছিল। ভাল হয়েছে—না হলে শর্মিলা চিরকাল দুঃখ পেত মনে মনে।'

বিচিত্র সব মনের ব্যাপার শবুর মাথায় ঢোকে না।

চার

কমাস পরে ভুবনেশ্বর থেকে ছোটকাকীমায়া এলেন পূজোর ছুটিতে। বাড়ীতে মাত্র দুখানা ঘর, আর রাস্তার ওপারে বড়কাকার ঘর। বাড়ীটা সারাদিন ছোটদের চেঁচামেচি হৈ হট্টগোলে সরগরম। দিদিও এসেছে কটক থেকে।

দুর্গাবাড়ীতে এবার পূজোও হল বেশ জাঁকিয়ে। এক বছরে সকলের চেষ্টায় পূজোমণ্ডপ আর থিয়েটারের স্টেজ মোটামুটি পাকাপোক্ত ভাবে তৈরী হয়েছে। পূজোর প্রথম রাতে একটা গীতিনাট্য ও পরের দু রাত দুটো নাটক হল।

বিদিশা বিপাশাদিরা তাদের দলবলকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা গীতি-নাট্য উপহার দিলেন। সে রাতে বড়মাও দুর্গাবাড়ীতে এসেছিলেন—সুন্দর অনুষ্ঠানটি দেখে তিনি খুশি হলেন। আর দুর্গাবাড়ীতে বড়মাকে ঘিরে সেকি ভিড়! এখানকার অধিকাংশ ছেলে মেয়েই তাঁর স্কুলের ছাত্র—ছাত্রী, প্রাক্তন কিংবা বর্তমান। সবাই বড়মাকে খুব ভালবাসে, ভক্তি করে। বড়রা সকলে তাঁর কাছে শ্রদ্ধাবনত।

বাবা কাকারা এখন আর থিয়েটার করেন না। কিন্তু তাঁদের বন্ধু নীলু হেমু ইন্দ্রনাথ কাকারা রীতিমতো নাটক নিয়ে মেতে আছেন। তবে সব থেকে ভাল পার্ট যিনি করতেন সেই নিরঞ্জন বাবু এখন দেশের বাইরে—তাঁর মত আর কাউকে পাওয়া যায় নি।

পূজোর পর এ বাড়ী সে বাড়ী আসা যাওয়ার পালা। ঠাকুর মশাইয়ের স্ত্রী প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধা। ঠাকুমা একদিন তিন পুত্রবধূ ও নাতি নাতনীদের নিয়ে গেলেন বিজয়ার প্রণাম জানাতে। ঠাকুর মশাইকে প্রণাম করে অন্দর মহলে ঠাকুরানীকে প্রণাম করে তাঁর সামনে সবাই বসলেন। ঠাকুর মশাইয়ের দুই পুত্র বধূ ঘরে তৈরী নাড়ু বড়ি সবাইকে খেতে দিয়ে নিজেরাও বসে পড়ল

গল্প করতে। ঠাকুরানী খুব খুশী হয়ে সকলের নাম পরিচয়, কে কোন ক্লাশে পড়ছে খবর নিতে লাগলেন। কথায় কথায় ঠাকুরানী নির্ঝরিণী দেবীকে বললেন—

'তোমার মেজো বৌ-এর শরীর বেশ ভারি দেখাচ্ছে যেন, ছেলে পুলে হবে নিশ্চয়ই।'

অভিজ্ঞ চোখ, কোন ভুল নেই। নির্ঝরিণী দেবী জবাব দিলেন—

'ঠিকই বলেছেন ঠাকুরুনদি, তবে আপনি বোধ হয় এখন চোখে বেশী দেখতে পান না। আমার তিন বৌমারই প্রায় একই সময় আঁতুড় পড়বে। বড় বৌমারই আগে হবার কথা।'

ঠাকুরানী খুশি হয়ে একগাল হেসে বললেন—'বেশ বেশ। তা বড়বৌমার কটি হল?'

নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'তিন মেয়ে, তিন ছেলে—এখন একটি পেটে।'

এই সময় কিঙ্কু উঠে অন্যদিকে চলে গেল।

ঠাকুরানী বললেন—'দেখ, নাতনী লজ্জায় উঠে গেল। তা বড়বৌমাকে বল এবারে বন্ধ করতে, মেয়েরা সব বড় হচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছে।'

ঠাকুমা বললেন—'আমিও বলেছি।'

আরো কিছু কথা বার্তার পর সবাই ঠাকুরানী ও তাঁর পুত্রবধূদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীমুখো রওনা হল। শবু ভাবতে ভাবতে চলেছে—আগে ভাই বোন হবে শুনলে বেশ আনন্দ লাগত, এখন যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে, কিসের লজ্জা, কেন লজ্জা তা ঠিক বুঝতে পারে না। এই বয়সে কি ছেলে কি মেয়ে সবাই বুঝি খুব লাজুক হয়। না হলে শবুর খেলাঘরের সেই পাতানো বর, ঠাকুরমশাই এর নাতি জগু, বাড়ীর মধ্যেই এ ঘর সে ঘরে লুকিয়ে রইল, একবারও শবুদের সামনে আসতে পারল না। সে ত এখন গোঁফ দাড়ি গজিয়ে রীতিমত সাবালক হয়ে উঠেছে। খেলাঘরে তখনকার বর-বৌ পাতানো খেলার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, লজ্জাও করে।

পুজোর পর বাড়ী আবার অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। স্কুলের পড়াশুনা জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে শবু ঠাকুমা বড়-কাকীমাকে কাজে সাহায্য করে। মার সঙ্গে অবসর সময়ে একাত্ম হয়ে গল্প করে। কানাইটার দুষ্টুমি বেড়েই চলেছে। কাছেই বাবার ডিস্পেন্সারী, সুযোগ পেলেই এক ছুটে বাবার কাছে হাজির হয়। একটা দুটো পয়সা পেলে তাই

দিয়ে লজেন্স বা বাদাম কিনে খেতে খেতে বাড়ী ফেরে। কোন কোনদিন বেশী করে পয়সা চেয়ে নিয়ে দাদা দিদিদের জন্যও কিছু কিনে আনে, ছোটভাই ভাবুও বাদ পড়ে না। কখনও খেয়াল হলে দুটো পয়সা মাকে দিয়ে বলে—

'তোমার কাছে জমা থাক, পরে যখন চাইব তখন দেবে, কাউকে দিয়ে দেবে না।'

মা বলেন—'আচ্ছা'।

নন্দু কিন্তু অন্য স্বভাবের। অভাবের সংসারের কথা সে খুব ভাবে মনে হয়। কখনও বাবা মার কাছে পয়সা চায় না। যদি পায়ও তবে মার হাতে সে পয়সা দিয়ে বলে—

'মেজদির সেফটিপিন নেই, কিনে দিও,' কিম্বা 'কানাইকে একটা বেল্ট কিনে দিও' অথবা 'সেজদির স্কুলের খাতা কিনে দিও।'

সকলের জন্য তার অদ্ভুত মমতা, পারলে সংসারের অভাব অনটনের পুরো বোঝাটাই নিজের মাথায় তুলে নেয়।

অভাবের মধ্যে দিন কাটছে। মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয় ঠিকই, কিন্তু সচ্ছলতা নেই। তবু তারই মধ্যে মার সঞ্চয়ের স্বভাব কাজ করে চলে। বাবা ডিস্পেন্সারী থেকে ফিরে জামা খুলে রাখলে আড়ালে তার পকেট থেকে এক আনা দু আনা চার আনা থেকে কখন কখন টাকা পাঁচসিকেও মা পেয়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গোপন ভাণ্ডারে জমা করেন। ব্যাপারটা বাড়ীর সবাই জানে কিন্তু তাই বলে ছেলে মেয়েরা এমন কি কানাইও কখনো সে পকেটে হাত গলায় না। মা নেবে জেনেই বাবা বিশেষ করে খুচরো কিছু পয়সা বা টাকা সে পকেটে রেখে দেন। খরচের টাকা পয়সা থাকে ফতুয়ার বুক পকেটে—মা কখনো সেখানে হাত দেয় না।

টাকা জমানোতে ঠাকুমারও সায় আছে। বলেন—

'বৌদের টাকা জমানোর অভ্যেস লক্ষ্মীর স্বভাব। তবে বৌমারা, টাকা জমিয়ে শাড়ী-জামা কিনো না, সে ত দুদিনে ছিঁড়ে যাবে। সময় বুঝে বুঝে গয়না গড়াবে।'

ঠাকুমার নিজের কালে তেমন শাড়ীর দিকে নজর ছিল না, সুযোগ পেলেই কেবল ভারী ভারী গয়না গড়িয়ে নিতেন। মা পদ্মিনী দেবীরও ঠিক একই স্বভাব। এরই মধ্যে দু একটা গয়না কেনা হয়েছে পরিচিত স্যাকরার কাছ থেকে। বড়কাকীমার কেবল রং বেরংয়ের শাড়ী কেনার ঝোঁক আর সিনেমা দেখা।

আজ অনেকদিন পরে সঞ্চয়ের ভাণ্ড খুলে মা গুণতে বসেছেন। হাতে হাতে শবু মিতু নন্দু কানাই সে গণনায় সাহায্য করছে। সব গুণে দেখা গেল মোট একশ সাতান্ন টাকা চৌদ্দ আনা হয়েছে। মা বললেন—

'সোনার ভরি সত্তর বাহাত্তর টাকা। এ দিয়ে দুভরি সোনার গয়না কেনা যাবে। কিন্তুর বিয়ের জন্য একটু একটু করে জোটাতে হবে।'

নন্দু বলল—'মা, বাবা আরও বেশী করে টাকা আনতে পারে না?'

মা এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপিচুপি বললেন—

'আনবে রে, আনবে। 'সে' এক নতুন ওষুধ প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছে। দেখিসনা, এখানকার লোকে কত বাতজ্বরে ভোগে? এটা তারই ওষুধ—ইঞ্জেকশন। প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে, এখন কাগজ পত্র ঠিক করে সরকারের কাছ থেকে পেটেণ্ট নিতে পারলে লোকেরও উপকার হবে, আমাদেরও অভাব ঘুচবে।'

কথাটা ঠাকুমা, বড়কাকাও জানে, কিন্তু বাইরের লোক যাতে না জানতে পারে তার জন্য এই গোপনীয়তা। শবুরা অদৃশ্য ঠাকুরের উদ্দেশে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—হে ভগবান, ওষুধটা যেন ঠিক হয়।

শীতের শেষে বসন্তের আভাস দেখা দিয়েছে। এবারের স্কুলের সরস্বতী পূজোয় শবুদের ক্লাশ টেনের ছাত্রীদেরই দায়িত্ব—এখানকার এই নিয়ম। ঊর্মিলা হয়েছে সেক্রেটারী। যারা স্কুলের কাছাকাছি থাকে তারা যতটা সম্ভব ঊর্মিলাকে সাহায্য করছে, শবুও করছে।

কিন্তু বাড়ীতে বড় কাকীমা নেই ছেলে হবে বলে আগে থেকেই বাপের বাড়ী চলে গেছেন, মারও শরীর খারাপ তাই রান্নার ঠাকুর থাকলেও শবু মা ঠাকুমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। সকাল সকাল বড়কাকা শুভেন্দুদার অফিসের ভাত, তারপরে ভাইবোনদের স্কুলে যাবার প্রস্তুতি, কানাইলাল ভাবুলালের যত্ন আত্তি, ধোবির বাড়ীর জামাকাপড়ের হিসেব রাখা, গয়লানীর দুধের হিসেব, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ঘর গোছানো, শুকনো কাপড় চোপড় ভাঁজ করে আলনায় গুছিয়ে রাখা এ সব অনেক কাজেই এখন শবুকে হাত লাগাতে হয়। ভাবুর শরীর প্রায়ই ভাল থাকে না। তাই স্কুলের পূজোর কাজে বেশী সময় দিতে পারে না। অবশ্য অন্য ক্লাশের মেয়েদের এ কাজে উৎসাহের অভাব নেই। নীচের ক্লাশের মেয়েদের উৎসাহ ত আরও বেশী—সে সময় শবুরাও খুব খেটেছে পূজোতে।

সরস্বতী পুজো নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ভাল পরিচালনা ও কাজের জন্য উর্মিলার খুব প্রশংসা করলেন স্কুলের বড়দি। বন্ধুদের কাছে উর্মিলা ঠাট্টা করে বলল—

'সেথিয়ে কণ হেব? পরীক্ষারে কণ টিকে অধিক নম্বর দেবে কি? সে হব নি।'

শবুরও সেই একই সমস্যা—ক্লাশের অধিকাংশ মেয়ের মত তারও অঙ্কের নামে গায়ে জ্বর আসে। আগে ত বেশ ভাল নম্বরই পেত, এখন এ্যালজেব্রা জিওমেট্রি এসে যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। বড়দি নিজে নেন অঙ্ক আর ভূগোলের ক্লাশ। খুব ভাল পড়ান, ভূগোলের পাঠ শুনতে শুনতে মনে হয় যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের সব বৈচিত্র নিয়ে ওদের চোখের সামনে উপস্থিত। অঙ্কও খুব যত্ন নিয়ে শেখান, কিন্তু ওদের মাথায় যে ঢোকে না তাতে বড়দির কি দোষ?

শেষ পর্য্যন্ত শবুদের ক্লাশের সবাই ইলেভেনে উঠল—উর্মিলাও মোটামুটি ভাল নম্বরই পেয়েছে। মিতু ক্লাশ সিক্সে উঠল। নন্দ উঠেছে তৃতীয় শ্রেণীতে বড়মার স্কুলে। কিন্থুর সামনে আইএ পরীক্ষা—কটকে পড়াশুনা নিয়ে খুব ব্যস্ত।

এল বৈশাখ মাস, এল বৈশাখী পূর্ণিমা, লোকে বলে বুদ্ধ পূর্ণিমা। পদ্মিনী দেবীর সেই রাতে এক কন্যা-সন্তান হল। দেড় মাসের মধ্যে ভুবনেশ্বরে ছোট কাকীমা দীপ্তি দেবীর হল এক পুত্র-সন্তান, আরও মাসখানেক পরে উত্তরবঙ্গ থেকে টেলিগ্রাম এল, বড় কাকীমা খনা দেবীরও প্রথম সন্তান হয়েছে—পুত্র-সন্তান। এরা তিন জন মাত্র এক দেড় মাসের ছোটবড়—কে কাকে দাদা দিদি ডাকবে তাই নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল শবু মিতুরা এখন থেকেই।

প্রথম সন্তানই ছেলে হওয়াতে বড়কাকা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। অফিসের বন্ধুদের পেট ভরে মিষ্টি খাইয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলেন শ্বশুর বাড়ী ছেলেকে দেখতে। ভুবনেশ্বর থেকে চিঠি এসেছে—ছোটকাকার এ ছেলেটিও বেশ ফর্সা হয়েছে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া কোঁকড়া। আর শবুদের ছোট বোন? তার গায়ের রং মাঝামাঝি, মুখটি ভারি মিষ্টি—অনেকটা মায়ের মত। মা ঠাকুমাদের মতে এই মেয়ে খুব পয়মন্ত। ওর জন্মের কালেই গিরিনবাবুর ওষুধ আবিষ্কারে সাফল্য যার ফলে বাড়ীর আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন—

'তিন ছেলে মেয়েই বেঁচে বর্ত্তে থাকুক, সুখে স্বচ্ছন্দে বড় হয়ে উঠুক আর কি চাই?'

শবু ভাবছে—নিজেরা চার বোন তিন ভাই, শ্রীলারা দুবোন দুভাই, আর বড়কাকার ঐ ছেলেটি—সবাই যখন একখানে হবে কি মজাই হবে, দিন রাত চলবে শুধু কলরব। কিন্তু এইটুকু একটা বাসা—তাড়াতাড়ি একটা বাড়ী হলে ভাল হয়।

পাঁচ

সরকারের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। মহিম বাবুর বাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ চৌদ্দ হাজার একশত পঁচিশ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বর্গীয় মৈত্র মহাশয়ের পত্নী নির্ঝরিণী দেবী যেন স্থানীয় ট্রেজারী থেকে ঐ টাকা নিয়ে আসেন। বড় কাকা ততদিনে স্ত্রী পুত্রকে দেখে ফিরে এসেছেন। তিনি পরিহাসের সুরে বললেন—

'আবার চৌদ্দ হাজার কেন? শুধু একশ পঁচিশ হলেই হ'ত। মন্দিরে পাঁচসিকের ভোগ চড়ানোর মত সওয়াশ' টাকার পূজো দিয়ে সমুদ্রে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে আমরা বাড়ী ফিরতাম।'

গিরিনবাবুও খুব ক্ষুব্ধ, মাকে বললেন—

'মা, এই তোমার শেষ ট্রেজারী যাওয়া ঐ টাকা ক'টার জন্য। এরপর আর কখনো ওমুখো হবে না—পেনসন নিতেও না। আমার ওষুধটা পেটেন্ট হয়ে গেছে। সরকারের মুষ্টিভিক্ষায় আর আমাদের দরকার নেই।'

নির্ঝরিণী দেবী ক্ষোভে দুঃখে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ট্রেজারী থেকে টাকা তুলে পোস্ট অফিসের পাশ বইতে জমা করে দিলেন। উকিল হিতেন বাবু সর্বক্ষণ সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য করলেন। মৈত্র মহাশয়ের সাধের তৈরী ভদ্রাসনের প্রতি সকলের যে নাড়ীর টান ছিল মৈত্র গৃহিণীর শেষ স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। আর কোনদিন এ বংশের কারো সে ভিটেতে প্রবেশের অধিকার রইল না। আবার শুরু হল জমি খোঁজা—একটা মাথা গোঁজার নিজস্ব আস্তানা চাই। কিন্তু খাসমহলের জমিতে আর নয়।

কিছুদিন আগেই শবু ভাবছিল, তাদের একটা বাড়ী হওয়া দরকার। কেউ বুঝি অলক্ষ্যে থেকে সে প্রার্থনা শুনেছিল। ক্ষতিপূরণ কতটা পাওয়া গেল সে জানে না, এবার জমি কেনা হবে বাড়ী হবে সেইটাই বড় কথা।

সুখ আনন্দ চিরস্থায়ী নয়। মৈত্র পরিবারে তা একটু দীর্ঘস্থায়ীও হতে চায় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই।

দিদি কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে কটক থেকে ফিরে এসেছে মাস দুই আগে। ছোটভাই ডাবুলাল (অমু) জন্মের পর থেকেই রুগ্ন। এখন পড়েছে কঠিন অসুখে—ডাক্তাররা বলছেন জণ্ডিস্ হয়েছে। ঐ টুকু ছেলের এ অসুখে কি ওষুধ কাজ করবে আর কি পথ্যই বা দেবে! শুধু সাবু বার্লি বা ঘুঁটের আঁচে ভাত সিদ্ধ করে খাইয়ে তাকে যেন দিন দিন আরো রুগ্ন আরো দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে। দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, গাল চুপসে গেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে।

মা কোলের মেয়েকে নিয়েও যথাসাধ্য করছেন। শবুও স্কুল লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ভাইকে দেখাশোনা করছে। ওদের কারো মনে সুখ নেই, সবার আদরের ছোটভাইটা কেন এত নির্জীব হয়ে পড়ছে, কেন সে ভাল হচ্ছে না? সকলেই ওর বিছানার আশপাশে ঘুরঘুর করে আর মনে মনে প্রার্থনা করে, ভগবান, ওকে তুমি ভাল করে দাও। ডাবু শীর্ণ শরীরে বড় বড় চোখ মেলে করুণ দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকায়, মনে হয় কথা বলার শক্তি এমন কি কাঁদার ক্ষমতাটুকুও তার নেই। নন্দু আকুল হয়ে কেঁদে বলে—

'ডাবু, একটু কথা বল, আমাকে দাদা বলে ডাক'।

ডাবু কথা বলতে পারে না।

শবু ডাবুর মাথায় হাত রেখে ডাকে—'ডাবু ভাই আমার, আমার সঙ্গে কথা বল একটু।'

ডাবু করুণ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

মা কোলের মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে ডাবুকে কোলে করে গালে কপালে চুমু খেয়ে আদর করে ডাকেন—

'ডাবু, বাবা আমার তোর কি কষ্ট বল। কি খাবি বল ত।' ডাবুর মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুটে 'মা' ডাকটা শোনা যায়, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে আবার কান্নায় নিজের চোখ মোছেন, স্বামীকে বলেন—

'ওগো, তুমি ওকে ভাল ওষুধ দাও।'

বাবা গিরিনবাবু নিজের জ্ঞান বুদ্ধিমত ও অন্য ডাক্তারদের পরামর্শমত ওষুধপত্র দিচ্ছেন। মা কেঁদে ঠাকুমাকে বলেন—

'মা, এইটুকু ছেলে, প্রায় অবোধ, নিজের কষ্টটুকুও বলতে পারে না। ওর কষ্ট যে আর চোখে দেখা যায় না।'

ঠাকুমাও জন্মরুগ্ন এই নাতিটির বিছানায় পাশে বসে ঝর ঝর করে কাঁদেন আর বলেন—

'কি ভাগ্য নিয়েই ছেলেটা জন্মালো। মা বাবা দাদা দিদি ছাড়া বেশী কথা বলাই সে শিখতে পারল না, ও কি করে ওর কষ্টের কথা বলবে? বল ত দাদু—আমাকে থাম্মা বলে ডাকত দাদুভাই।'

ডাবুর মুখে কোন কথা নেই।

এমনি করে প্রায় মাসখানেক ভুগে সব ওষুধ পথ্যকে হার মানিয়ে, মা-বাবা-ঠাকুমার সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে, দিদি-দাদাদের সব আদর যত্ন ও স্নেহের মায়া কাটিয়ে রথের একদিন আগে ডাবু চোখ বুজল। ঐ টুকু মাত্র আড়াই তিন বছরের নাতির মৃত্যুতে ঠাকুমা ডুকরে কাঁদতে লাগলেন—

'হায়রে পোড়া কপাল! আমার মত বুড়ীকে ফেলে রেখে তুই দাদু কোথায় গেলিরে! ভগবান কি চোখে দেখতে পায় না?'

মা কাঁদছেন অজস্র ধারায়—এই তাঁর প্রথম পুত্রশোক। শোকে মা পাগলের মত ডাবুর দেহটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর-মশাই এর দুই পুত্রবধু, হীরার মা, নীলু—হেমুর স্ত্রীরা এসে অনেক সাধ্য সাধনা করেও পুত্রশোকাতুরাকে শান্ত করতে পারছেন না। কিস্কু শবু মিতু নন্দু কানাই কেঁদে আকুল ছোট ভাইটির জন্য। বাবা গিরিন বাবুর মত অত ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছেলের বিছানার পাশে বসে শিশুর মত কেঁদে বলতে লাগলেন—

'আমার এতদিনের ডাক্তারী করাই বৃথা। আমি রোজ কত শিশুর চিকিৎসা করি, তাদের কত কঠিন অসুখ থেকে ভাল করে তুলি। আর আজ নিজের ছেলেকেই আমি বাঁচাতে পারলাম না। কি হবে আমার ডাক্তারী করে!'

নীলুবাবুর স্ত্রী পারিজাত দেবী বললেন—

'মেজ মশাই, আপনি অধীর হবেন না, অবুঝ হবেন না। আয়ুর বড় বস্তি নেই। ভগবান ওকে কাছে টেনে নিয়েছেন, পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট ওকে বেশীদিন ভোগ করতে হলনা—ও ভাগ্যবান।'

আবার ভাগ্য, আবার ভগবান! কি নিষ্ঠুর এইসব দেবতার দল। শবু কিস্কুরা এই প্রথম একটা সত্যিকারের মৃত্যু চোখের সামনে দেখল, হৃদয়

দিয়ে অনুভব করল। দাদুর মৃত্যু ওরা চোখে দেখেনি শুধু কানে শুনেছে—সংসারটা তখন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। কত্তামার পরিণত বয়সের যাওয়া চোখে দেখেছে, সবার সাথে কেঁদেছেও—কিন্তু সে ছিল যেন উৎসবের চলে যাওয়া। আজ যে ওদের বড় আদরের চিররুগ্ন ছোটভাইকে ভগবান নিয়ে গেল তার সঙ্গে কার তুলনা? নন্দু ছেলে হলেও ভাই বোনদের প্রতি মায়া মমতায় ওর মন মেয়েদের চাইতেও কোমল। সে শোকে বিহ্বল হয়ে কেঁদে মেঝেতে পড়ে লুটোপুটি করতে লাগল। ঠাকুর মশাইয়ের দুই পুত্রবধূ মিলে কিছুতে তাকে সামলাতে পারছে না। বড় কাকীমা খনা দেবী এখনও বাপের বাড়ীতে। বড়কাকা হৈমবাবুও শোকবিহ্বল।

বেশীক্ষণ এই দৃশ্য সহ্য করা যায়না। শেষে হৈমবাবু নীলুবাবু হেমুবাবু ও অন্যসকলে মিলে মার কোল থেকে ভাবুর দেহকে যত্ন করে তুলে নিলেন। মহিলারা ভাবুর চোখে কাজল মুখে চন্দনের সাজ পরিয়ে দিলেন। হৈমর কোল থেকে নীলুবাবু ভাবুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে শ্মশানের পথে পা বাড়ালেন, হৈমবাবু কিছু লোকজন নিয়ে তাঁর সঙ্গে চললেন। সারা বাড়ীতে হৃদয়বিদারী কান্নার রোল উঠল। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিতে এসে নিজেরাই কেঁদে আকুল। ভাই বোনেরা কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। নন্দু কেঁদে রাস্তার ধুলায় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এক সময় ধীরে ধীরে কান্না কমে এল—প্রতিবেশিনীরা ছোটদেরকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এলেন। মা উদ্‌ভ্রান্তের মত শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে অঝোরে কাঁদছেন। বাবা মাথায় হাত রেখে বাইরের বারান্দায় পাষাণের মত বসে রইলেন। যা করবার হৈমরাই করবে। ঠাকুমা বারবার কপাল চাপড়ে কাঁদছেন আর বলছেন—

'এই বয়সে আমাকে শিশুমৃত্যু দেখতে হল! তার আগে আমার মরণ হল না কেন?'

খবর পেয়ে ছোটকাকা অবিনাশবাবু সপরিবারে ভুবনেশ্বর থেকে এলেন। বাড়ীতে আবার কান্নার রোল উঠল। দু একদিনের মধ্যে বড়কাকীমাও বাপের বাড়ী থেকে শিশুপুত্র কোলে এসে পড়লেন। ততদিনে কান্নার বেগ অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বাড়ীতে এখন অনেকগুলি শিশু। এতগুলো ভাইবোন একখানে থাকাতে সব সময় কিছু কান্নাকাটি চেঁচামেচি লেগেই থাকে। কিন্তু সে সবের

মধ্যেও একটা করুণ সুর যেন সব সময় বেজে চলে—বুঝি একটু কান পাতলে তা শোনা যায়—ভাবু নেই, সকলের আদরের ছোটভাই ভাবু চলে গেছে।

কয়েকমাস আগে শবু কল্পনায় মনে মনে যে ছবি এঁকেছিল, সব ভাই-বোন একখানে হবে, আনন্দের মেলা বসে যাবে—সে কি এই মেলা? দিদির পাশের খবর এসেছে, কদিন বাদে আসছে দুর্গা পূজা। সে সবই এখন বিস্বাদ লাগে আনন্দ জাগায় না। শবুর মনে হয় তার জীবনে বুঝি চাওয়া পাওয়ার মিল নেই। দাদু গেল কর্তামা গেল দাদুর বাড়ী গেল—তবু ভেবেছিল বাবার চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে যখন তাদের দিন একটু ফিরতে লেগেছে তখন সবকটি ভাইবোন মিলে মা বাবা ঠাকুমা কাকা-কাকীমাদের সঙ্গে আনন্দে থাকতে পারবে। সে চাওয়া পাওয়ায় গরমিল ঘটিয়ে ভগবান ভাবুকে নিয়ে গেল। ভগবানকে যেন আর ভগবানের মত মনে হয় না। দাদুর বাড়ীর ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও জমি খোঁজার ব্যাপারটা ঠাকুমার ঝুলির নাকের বদলে নরুন পাওয়ার গল্পের মত লাগে।

ভাবু চলে যাওয়াতে মা মূর্তিমতী শোকের মত অন্য শিশুসন্তানদের মুখ চেয়ে প্রাণ ধারণ করছেন। জীবনের তাগিদে বাবাকেও ডিসপেন্সারীতে যেতে হচ্ছে।

ছোটকাকীমারা আসাতে, প্রথম কিছুদিনের শোক-বিহ্বলতা কেটে যাবার পর, অপর রুগ্ন সন্তান বাবুলালের দিকে সবার নজর গেল। তার কথায় আছে জড়তা, ঘটেনি এতটুকু বুদ্ধির বিকাশ। বোধশক্তির খুবই অভাব। ঠাকুমার অভিজ্ঞ চোখে নেমে এল শঙ্কার ছায়া। ছোটছেলে অবিনাশকে ডেকে বললেন—

'অবিনাশ, ওকে বড় ডাক্তার দিয়ে দেখা।'

অবিনাশ বলল—'দেখিয়েছি মা। তারা বিশেষ ভরসা দিতে পারেনি।'

ঠাকুমা বললেন—'এ যে বড় বিপদের কথা। এ ছেলের জন্য তোরা সারা জীবন সুখ পাবিনা। ভগবানের কি অসীম করুণা! প্রায় একই সঙ্গে দুটি ছেলে হল। একটি সেদিন তিন বছর পুরো না হতেই চলে গেল আর একজন চিরজীবন অবোধ থাকবে? কী কুক্ষণে যে সেই বাড়ী ছাড়ার নোটিশ এসেছিল।'

বাবুলালের জন্য তার দিদি শ্রীলাও মনের মধ্যে গুমরে মরে। শবুদের অত স্নেহময়ী হাসিখুশি ছোটকাকীমার মুখের হাসি নিভে গেছে। বড়জার

পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

'দিদি, দুঃখ করবেন না। যে গেছে ভালই গেছে—কেঁদে ত আর তাকে ফেরান যাবে না। আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমার এ ছেলে বুঝি সারাজীবন আমাদের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে।'

বড়জা পদ্মিনী দেবী দ্বিগুণ বেদনায় কেঁদে ছোট জা ও বাবুলালের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—

'তুইও মনে দুঃখ রাখিসনা, দীপু। ছেলে যেমনই হোক নিজের পেটের সন্তান। একে যেন কেউ কখনো অনাদর অবহেলা না করে।'

বাবুলালকে দেখে শবুর মনে জাগে গভীর বেদনা ও মমতা। সে তার মায়ের পেটের ভাই নয় তবু সবাই এক পরিবারের সন্তান। তাই বাবু শ্রীলাগা-ও শবুদের কাছে আপন ভাই বোন। একই বংশের রক্তধারা বইছে সকলের ধমনীতে—দেহের অণু পরমাণুতে তাদের মধ্যে রয়েছে মিল। সেই কারণেই বাবুলালের জন্য তার মন কাঁদে—দুঃখ পায় কাকা কাকীমার মনঃকষ্টের কথা ভেবে। বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় পাঠ্যবই পঞ্চতন্ত্রের সংস্কৃত শ্লোকটি—

অজাত মৃত মূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্
যতস্তৌ স্বল্প দুঃখায় যাবজ্জীবন জড়োহ দহেৎ॥

নিঃসন্তান ও সন্তান বিয়োগের দুঃখ বেদনা সমধিক কিন্তু ততটা দীর্ঘস্থায়ী হয়না, ফল্গুনদীর জলধারার মত বালির নীচে অন্তঃসলিলা থেকে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু অবোধ নির্বোধ আর জড়বুদ্ধি সন্তান চিরকাল চোখের সামনে থেকে মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের মনোবেদনার সৃষ্টি করে যার হাত থেকে সহজে পরিত্রাণ নাই। বাবুলাল কি কোনদিন দেহে মনে ওদের মত স্বাভাবিক হতে পারবে না—কাকা কাকীমার দুঃখ কি ঘুচবে না? এ সব কথা ভেবে শবু শান্তি পায় না।

দু ধরনের শোক দুঃখের প্রভাব একটু কমে আসতে এবার সকলের দৃষ্টি পড়ল নবাগতকদের প্রতি। ঘরে এখন তিন তিনটি প্রায় সমবয়সী শিশু। ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন পড়েছে। আশ্বিন-কার্ত্তিকের মিঠে রোদে তেল মাখিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় তাদের শুইয়ে দিলে তারা কেউ শুয়ে হাত পা ছুড়ে, কেউ হামাগুড়ি, কেউ বসার চেষ্টায় নানা কসরৎ দেখায়।

বড়কাকার ছেলেটি বেশ কালো, সুন্দর স্বাস্থ্য, মোটাসোটা নাদুসনুদুস, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। ঠাকুমা বলেন 'ঠিক যেন শিশু হৈম।'

ছোটকাকার ছোটছেলেটি একটু রোগা পাতলা, ফুটফুটে গায়ের রং, মাথায় থোকা থোকা কোঁকড়া চুল। যখন কাঁদে মুখটা তার ভারি করুণ দেখায়। আর এদের মধ্যে যে সবার বড়, এক দেড় মাসের বড় হলেও অবশ্যই সে বড়ত্বের দাবি করতে পারে, শবুদের সেই বোনটি? স্বাস্থ্য মাঝারি ধরনের গায়ের রং মোটামুটি গৌরবর্ণ—গৌরীই বলা যায়। যখন হাসে—মনে হয় যেন চাঁদের হাসি। তার জন্মই যে পূর্ণিমা রাতে, হাসিটাও তাই পূর্ণিমার চাঁদের মত।

সব চাইতে মজা হয় যখন মেয়েটাকে মাঝে রেখে তিন ভাইবোনকে পাশাপাশি শোয়ান হয়—ঠিক যেন জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রা। বড়কাকার ছেলে কালো—জগন্নাথের মত কৃষ্ণবর্ণ, ছোটকাকারটি বলরামের মত ফর্সা আর মেয়েটি গৌরবর্ণা, সুভদ্রা। সুভদ্রা ত জগন্নাথ বলরামের বোন—এরাও তিন ভাইবোন।

অন্য ভাইবোনেরা শিশু তিনটিকে ঘিরে গোল হয়ে বসে নানা কসরৎ দেখে তাদের নিয়ে খেলা করে আর মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য করে। বাবা-কাকারা-ও পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই শিশুমেলার দিকে একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত না করে পারেন না।

দুর্গা পূজা কালী পূজা ভাই ফোঁটার শেষে ছোটকাকীমারা ভুবনেশ্বরে চলে গেলেন। শবুরা পাঁচ ভাইকে ভাই ফোঁটা দিল—ছয় ভাই হ'ত, কিন্তু ভাবু নেই। অবশ্য শুভেন্দুদা বাদ পড়েনি।

ছয়

দিদি কিন্তু আই এ পাশ করে বাড়ীতে বসে আছে। মেয়েকে আর পড়িয়ে কি হবে? বাবা-মা এবারে কিন্তুর বিয়ের জন্য সচেষ্ট হলেন। সম্বন্ধ একটা দুটো করে আসতে লাগল। মেয়ে দেখানও হল কয়েকবার। মেয়ে দেখতে আসার আগেই ঠাকুমা শবুকে ভিতরের ঘরে পাঠিয়ে দেন, একদম বের হতে দেন না, পাছে পাত্রপক্ষ তাকে দেখে ফেলে। মেয়ে দেখতে এসে লোকে নাকি আগেই মেয়ের গায়ের রং দেখে।

পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথায় বার্তায় বাবা প্রায়ই বলেন, 'আমাদের একান্নবর্তী পরিবার।' এ কথায় যে কি অর্থ শবু বুঝতে পারে না। বাড়ীতে বাবা মা

ঠাকুমা কাকা কাকীমা সব ত থাকবেই, এতে বলার কি আছে? যাই হোক পাত্রপক্ষ আসে, মেয়ে দেখে, চা মিষ্টি খেয়ে মিষ্টি হাসি কথাবার্তায় বিদায় নেয়। পরে সবার সঙ্গে আলোচনা করে চিঠি দেবে।

দেখে দেখে ব্যাপারটা শবুও বুঝতে পারে। আসলে বাবার ত পাত্রপক্ষের খাঁই মেটাবার মত টাকা নাই। তাই সুন্দর গান গাইতে পারা, মিষ্টি মুখশ্রী, লেখাপড়ার সার্টিফিকেট, গৃহকর্ম নিপুণতার নমুনা—কিছুতেই মেয়ের কালো রং ঢাকা পড়ে না। কখনো 'ছেলের এখন বিয়েতে মত নেই', কখনও 'মেয়ের বয়সটা একটু বেশী বা কম' কখনো 'কোষ্ঠির মিল হচ্ছেনা'—এইসব অসার অজুহাত দিয়ে চিঠি আসে। কেউ কেউ আবার একটা চিঠি লেখার ভদ্রতাটুকুও করে না।

দেখে শুনে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য কিস্কুর মনে ধিক্কার জন্মে গেছে—শবুর মনেও তা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হতে থাকে। নিজেকে সে নিজের মধ্যে আরও গুটিয়ে নিতে চায়—সকলের চোখের সামনে থেকে আড়াল করতে চায়। ঠাকুমা বলতেন 'এ বংশে মেয়েরাই লক্ষ্মী'। লক্ষ্মীর যে নমুনা দেখা যাচ্ছে সেটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি?

হঠাৎ করে শুভেন্দুদার পূজনীয় মা—শবুদের বড়মাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে পড়লেন, এই শহরেই এখন থাকবেন। দেশে জমিদারীর সাধ প্রায় ঘুচে গেছে—পাকিস্তানে ধন মান সম্পত্তি নিরাপদ নয়। একমাত্র বড় ছেলের রোজগারের উপর নির্ভর করে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ও দুটি নাবালক ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। স্বামী একটা স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে উত্তরবঙ্গে কোথায় গেছেন—সেখান থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠাবেন। জমিদারী প্রায় বেহাত। তাড়াতাড়ি একটা বাসা ঠিক করে শুভেন্দু মা ভাই বোনদের নিয়ে সেখানে উঠল।

এদের ত এই হাল, মামাদের কি অবস্থা হল মা জানতে উদগ্রীব। জানা গেল বড়মামাও একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে নাটোরে বাসা বেঁধেছেন, ছোটমামা গ্রামেই টিকে থাকার চেষ্টা করছেন অন্য উপায় নাই দেখে। শুভদা বহরমপুরে তার শশুরের দেওয়া বাড়ীতে বৌ নিয়ে আছে। শুভদার বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই দিদিমা মারা গেছেন পাকিস্তানে থাকতে, সে কথা আগেই জানা ছিল দিদিমা মারা যাবার সময় দেখতে পাননি, সময়মত একটা খবরও পাননি বলে মা কতদিন কান্নাকাটি করেছেন। বড়মামীমাও আর বেঁচে নেই, ছোটমামার

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছোটমামীর শরীর ভেঙে পড়েছে। ছোট দু একটি শিশু ছাড়া অন্যগুলোকে মামারা হিন্দুস্থানে নানা আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মামাদেরও জমিদারীর সাধ প্রায় মিটে গেছে, হিন্দুস্থানেও তাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই। দেশ বিভাগের গুণে এক একটা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার একেবারে চূড়ান্ত দুর্দশায় পড়েছে।

পৌষ সংক্রান্তির পরে শুভদিন দেখে বাড়ীতে তিন ভাইবোনের মুখে ভাত দেওয়া ঠিক হল। বিশেষ কিছু ঘটাপটা করার ইচ্ছে কারো ছিল না। তবু বড়কাকা হৈমবাবুর প্রথম ছেলে—তার অন্নপ্রাশন হওয়াই রীতি। তাইতে একটু বড়সড় আকারের অনুষ্ঠান করতে হল। শবুদের ছোটবোনের নামকরণ হল—তাপসী মৈত্র—সংক্ষেপে তপু। এমনিতে ওকে পূর্ণিমা, গৌরী নানা জনে নানা নামে ডাকে। ছোটকাকার দ্বিতীয় ছেলের নাম হল প্রভাত মৈত্র ওরফে পটু। বড়কাকার ছেলেটির নাম রাখা হল প্রবীর মৈত্র—ডাক নাম হল শঙ্খ।

শবু ক্লাশ ইলেভেন-এ উঠেছে—পড়াশুনার প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। এমনিতে সে কোনদিন কোন পরীক্ষায় ফেল করেনি। তবু সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, ভয়ে বুক দুরু দুরু করে এখন থেকেই—বিশেষ ভয় অঙ্ক নিয়ে।

দিদি কিন্তু শবুকে ভরসা দিয়ে বলে—'অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? দেখনা, আমিও ত পরীক্ষা দিয়েছিলাম পাশও করে গেলাম ত দুটো।'

শবু বলল—'তুই তো অঙ্কে ভাল ছিলি। আমি অঙ্ক নিয়ে যে কি করি।'

দিদি বলল—'ভাবিস না, ঠিক পাশ করে যাবি।'

দিদির কথায় শবু দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশুনায় লেগে পড়েছে।

দিদি কিন্তু এখন অফুরন্ত অবসর, পাড়ার বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে চায়। কিন্তু তার সমবয়সী বান্ধবীদের প্রায় সবারই বিয়ে হয়ে গেছে; বড়মামীর মেয়ে বেবী দিদির সমবয়সী—তারও বিয়ের চেষ্টা চলছে। তারা দুজনেই অধিকাংশ সময় গল্প করে কাটায়।

দিদির মনে সুখ নেই—বিয়ের কথা কোথাও পাকা হচ্ছে না। দিদি যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। নিজের মনে সারাদিন কি যেন ভাবে কোন কাজে উৎসাহ দেখায় না। মা ঠাকুমা বিরক্ত হন। নানান ব্যাপারে খিটিমিটি লাগে। একটা অশান্তির পরিবেশ ধীরে ধীরে দেখা দেয় যা এই পরিবারে কোনদিন ছিল না।

মা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—'কিন্তু ত আগে এমন ছিল না। দু বছর হোষ্টেলে থেকে যেন বেশী বিগড়ে গেছে।'

ঠাকুমা বলেন—'মেয়ের কুড়ি একুশ বছর বয়স হল, বয়সকালে বিয়ে দিতে পারলে এমনটি হতে পারত না।'

মা বললেন—'কথাটা ত ঠিকই। কিন্তু মেয়ে কালো বলে কেউ পছন্দ করে না, আমাদেরও টাকার জোর নেই। না হলে কে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কলেজ—হোষ্টেলে দিয়ে মেয়েকে আরো ধিঙ্গী করে আনে? ইচ্ছে করে ত আর মেয়েকে ঘরে পুষে রাখিনি।'

কিন্তু বাঁকা মন্তব্য করে—'তোমরা না বলতে—আমরা নাকি ঘরের লক্ষ্মী! এখন সে লক্ষ্মীকে পছন্দ হচ্ছে না?'

মা বিরক্ত হয়ে বলেন—'সে তোমার গুণে।'

দেখে শুনে শবু নিজেকে আরো নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, বেশী করে পড়াশুনায় মন দেয়।

মামাবাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—ছোটমামীমা এক শিশুপুত্রের জন্ম দিয়ে চোখ বুজেছেন মাসখানেক আগে। মা পদ্মিনীদেবীর চোখের জল শুকোবার অবকাশটুকুও বুঝি ভগবান দেবে না। এই সেদিন এক ছেলে কোল ছাড়া হল অকালে, আবার এসেছে ছোটবৌদির মৃত্যু সংবাদ। এদিকে শরৎ হেমন্ত গিয়ে শীত এসে গেছে।'

শবু টেস্টে এলাউ হয়ে গেল সহজেই। সব চাইতে ভালো নম্বর পেল ইতিহাস, সংস্কৃত ও ডোমেষ্টিকে। ইতিহাস শবুর খুব ভাল লাগে, মন চায় সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে। সব চাইতে কম নম্বর হল অঙ্কেই। এখন আর কোনদিকে তাকানো নয়, দিনরাত কেবল পড়াশুনা, কোচিং ক্লাশ। তার নিকটতর সব বন্ধু হীরা, ঊর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, সীমন্তী, লাবণ্য সবাই এলাউ হয়েছে, ক্লাশের পনরো জনের মধ্যে বারোজনই। কোচিং ক্লাশে, পথে ঘাটে, বাড়ীতে তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলে আলোচনার বিষয়বস্তু শুধু একটাই—টেষ্ট পেপার সল্‌ভ করা, কোশ্চেন পেপার, পাশের নম্বর, মেড্‌ইজি ও সাজেস্‌শানের কার্য্যকরী কথা।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই বহুপ্রতীক্ষিত উদ্বেগ-কণ্টকিত ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিনগুলি। কোথা দিয়ে যে তিনটে মাস কেটে গেল শবু টেরই পেল না। এখন সামনের দশটা দিন অগ্নিপরীক্ষা। সকালে নাকে মুখে

গুজে মা বাবা ঠাকুমা দিদি ও অন্য গুরুজনদের প্রণাম করে পরীক্ষায় হলে যাওয়া—দুই পেপারের মাঝখানে টিফিন খেতে খেতে বন্ধুদের সঙ্গে কে কেমন পরীক্ষা দিল তার আলোচনা। পরীক্ষা শেষে বাড়ী ফিরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আবার পড়া—আবার পরদিনের প্রস্তুতি। দশটা দিন যেন দশ মিনিটে পার হয়ে গেল। এখন একেবারেই নিশ্চিন্ত আর প্রতীক্ষা। অখণ্ড অবসর বেড়ানো ও গল্প করার। পরীক্ষার সময় রোজ রোজ সন্ধ্যের সময় এত ঘুম পেত, ভেবেছিল পরীক্ষা হয়ে গেলে খুব একচোট ঘুমিয়ে নেবে। এখন আর অত ঘুম পায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

দিদি কিঙ্কু আই এ পাশ করে এক বছর হল বসে আছে। বিয়ের ব্যাপারে সবাই উঠে পড়ে লেগেও কিছু করা যাচ্ছে না। সব থেকে বেশী চিন্তা মা ঠাকুমার—মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে? বয়স কত হয়ে গেল আর যে ঘরে রাখা যায় না।

ঠাকুমার বয়সের হিসেব আবার একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সাড়ে উনিশ হলে বলবে কুড়ি. আর কুড়ির উপর একদিন হলেই বলবে একুশ। কিঙ্কুর জন্ম পঁচিশে ডিসেম্বর মাঝখানে কুড়িটা ইংরেজী বছর গিয়ে জানুয়ারী মাস পড়েছে তো তাঁর হিসেবে ওর বয়স হয়েছে বাইশ বছর। জন্মের সন আর নতুন সন ধরে হল দু'বছর যদিও সময় হিসেবে এক সপ্তাহও নয়। তার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? তাছাড়া কথায়ও আছে—

'মেয়ের বয়স কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।'

যাই হোক, ঘরে বয়স্থা মেয়ে রেখে মা ঠাকুমা নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কি করে আর খাবারের গ্রাসই বা মুখে তোলে কি করে? নানান অশান্তিও দেখা দিচ্ছে সে মেয়েকে নিয়ে।

এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ বড়মা হেমলতা দেবী গিরিনবাবুকে ডেকে পাঠালেন। সবাই ভাবল নন্দ কানাইদের পড়াশুনার কোন ব্যাপার হবে বুঝি।

গিরিনবাবু যেতে বড়মা তাঁকে বসতে বলে প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর বললেন—

গিরিন, তোমাদের বড় মেয়ে কিঙ্কিণীর বিয়ের জন্য শুনলুম অনেক চেষ্টা-চরিত্র করছো। কোথাও কিছু ঠিক হ'ল কি?'

গিরিনবাবু মাথা নীচু করে বললেন—

'আজ্ঞে না। অনেক জায়গায় তো মেয়ে দেখানো হল, কিন্তু মেয়ে কালো আর টাকারও জোর নেই—তাই কিছুই হয়ে উঠছে না।'

বড়মা এক মুহূর্ত কন্যাদায়গ্রস্ত গিরিনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—

'শোনো গিরিন। আমার এই আশ্রমের পাশে এক চাটুয্যে মশাই থাকেন। এককালে প্রফেসারী করতেন পরে এক দুর্ঘটনায় পায়ের দিক থেকে অচল হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্ত্রীও একটি মাত্র পুত্রের জন্মের 'পর মারা যান। সে হল গে ধর ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের কথা। সে ছেলেটি কলকাতায় মামাবাড়ীতে মানুষ—বি এ পাশ—সরকারী চাকরি করছে। চাটুয্যে মশাই একদিন সেই ছেলের জন্য একটি মেয়ের কথা আমায় বলছিলেন। আমিও কিঙ্কীণীর কথা মনে করে তাঁকে বলেছি, মেয়ের সন্ধান আমি দোব। তা আমরা হলুম গে ব্রাহ্ম তোমরা হলে বারেন্দ্র আর চাটুয্যে মশাইরা ঢাকার লোক, রাঢ়ী!'

গিরিনবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বড়মার কথার মাঝখানেই অনুনয়ের সুরে বললেন—

'আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন, রাঢ়া-বারেন্দ্র দিয়ে আর কি হবে?'

'তবু'—বড়মা তাঁর কথার রেশ ধরলেন, 'তোমার মা নির্ঝরিণী দেবী মাথার ওপরে আছেন, প্রাচীন মানুষ, তাঁর মতামতটা অবশ্যই নেয়া দরকার। যদি সবার মত হয় তবে সোজা চাটুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কথা বলবে আমার নাম করে, মেয়েও দেখাবে। ওনার টাকা পয়সার কোন খাঁই নেই, খুব উদার প্রকৃতির।'

গিরিনবাবু কৃতজ্ঞতায় গলে নীচু হয়ে বড়মার পায়ের ধুলো নিতে নিতে বললেন—'কি যে উপকার করলেন, আপনাকে আর কি বলব।'

বড়মার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, বললেন—

'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বে থা হয়ে যাক তার পর মিষ্টি খাইয়ে আমাকে ঘটক বিদেয় কোরো।'

গিরিনবাবু বড়মার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাড়ীতে এসে কথাটা পাড়তেই সব শুনে নির্ঝরিণী দেবী হেমলতা দেবীর নামে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বললেন—

'এঁরাই হলেন সত্যিকারের মানুষ, বিরাট মানুষ। কাকচিলের মুখে খবর পেয়ে যাঁরা পরের উপকারের জন্য এগিয়ে আসেন তাঁরা মহৎ। হেমলতা দেবীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র। উনি এ শহরের গর্ব, সারা নারীসমাজের গর্ব।'

ঠাকুমা মা দুজনের চোখেই আনন্দাশ্রু বইছে। বড়মা শুধু বসে সে স্কুল আর আশ্রমই চালান না, কোথায় কোন মেয়ের কপাল পুড়লো, তার খবর

তার ব্যবস্থা সবই বড়মার। কোন মেয়ে অভাবের তাড়নায় কিছু করতে পারছে না তার ভাবনা বড়মার. কোন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না সে দায়ও যেন তাঁর। সব ব্যাপারেই আছেন তিনি। একজন মানুষের এত গুণ, এতখানি দরদী মন আর কোথায় দেখা যায়? বড়মা কিন্তু শবুদেরও গর্ব। ওদের গর্ব ওরা বড়মার মত মানুষের স্নেহচ্ছায়ায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছে, বড়মার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করেছে। এমনটা কজনের ভাগ্যে ঘটে?

আর দেরী করা নয়। পরদিনই গিরিনবাবু গিয়ে দেখা করলেন চাটুয্যে মশাইএর সঙ্গে। ভদ্রলোক বেশ অসুবিধার মধ্যে আছেন। বাড়ীতে একাই থাকেন, বিশেষ চলা ফেরা করতে পারেন না। একটি রাঁধুনী মেয়ে আছে, রেঁধে বা মন্দিরের প্রসাদ কিনে খাওয়ায়, ঘরদোর বাসন পত্তর সব সে-ই দু বেলা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। বড়মা পাঠিয়েছেন শুনে ভদ্রলোক খুব সমাদরের সঙ্গে গিরিনবাবুকে বসালেন। বললেন—

'হাঁ, ছেলের বিয়ে আমি এখনই দিতে চাই, আমার ত এই অবস্থা, কতদিন বাঁচব তার ঠিক নেই। ছেলেকে সংসারী দেখে যেতে চাই। তবে আমার ছেলের বৌকে এখানে থাকতে হবে না। ছেলের সঙ্গে তার কর্মস্থলেই থাকবে। মাঝে মাঝে এখানে এসে আমাকে দেখে যাবে।'

গিরিনবাবু বললেন—'বড়মার কথামতই আপনার কাছে এসেছি। তাহলে একদিন আমার বড় মেয়েকে দেখুন, যদি পছন্দ হয়....'

বাধা দিয়ে চাটুয্যে মশাই বললেন—'বড়মা নিজে পছন্দ করে যে সম্বন্ধ পাঠিয়েছেন সেখানে কি আমি অন্যথা করতে পারি? তাছাড়া বুঝতেই ত পারছেন, আমার পক্ষে কোথাও গিয়ে মেয়ে দেখা একেবারেই অসম্ভব। না হলে আপনাদের মত সজ্জনের বাড়ীতে যেতে পারা ত সৌভাগ্যের বিষয়।'

গিরিনবাবু বললেন—'ঠিক আছে, আমিই একদিন সাদামাটা ভাবে মেয়েকে নিয়ে এসে দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

আর কিছু কথা বার্তার পর গিরিনবাবু বিদায় নিয়ে এলেন।

এক দুদিন পর কিন্নুকে সঙ্গে নিয়ে গিরিনবাবু হাজির হলেন চাটুয্যে মশাই এর কাছে।

তিনি মেয়ে দেখে খুব খুশি, বললেন—'ভারি মিষ্টি মা-য়ের মুখখানি, এমন একটি শান্ত সুশ্রী মুখের ছবিই আমার পুত্রবধূরূপে কল্পনা করেছিলাম। বড়মা ঠিক আমার মনের কথাটি বুঝেছিলেন। এই মেয়েকেই আমি নেব।'

পরে দেনা পাওনার কথা তুলতেই তিনি বললেন—'দেনা পাওনা আবার

কি ? মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গান বাজনা জানে, ঘরের কাজের শিক্ষা দিয়েছেন—একজনের চলার পথের পাথেয় এই ত যথেষ্ট। তারপর আমার ছেলে ও আপনার মেয়ের ভাগ্য। এর বেশী পাওনা দিয়ে আমরা কি করব ?'

কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। চাটুয্যে মশাইএর একমাত্র পুত্র—অতএব জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সে-ই সব আর গিরিনবাবুরও জ্যেষ্ঠা কন্যা। সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে লোকাচারে বাধে। আষাঢ়েই বিয়ের দিন ঠিক হল। বাবা মা ঠাকুমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—কিন্নুর বিয়ে যেন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল।

দুই

চাটুয্যে মশাইএর ব্যবহারে গিরিনবাবু মুগ্ধ। মুগ্ধ মৈত্র পরিবারের প্রতিটি মানুষ। দ্রুত গতিতে শুরু হয়ে গেল বিয়ের প্রস্তুতি—হাতে সময় খুব কম। দেনা পাওনা না থাকলেও বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচ আছে, সামাজিকতা, লৌকিকতা আছে। পদ্মিনী দেবীর নিজের গয়না থেকে কিছুটা, কিছুটা টাকা জমিয়ে কেনা গয়না আর ঠাকুমার দান হিসেবে একটু গয়না সব মিলিয়ে সাত আট ভরি হচ্ছে। মা বললেন—

'দিতে ইচ্ছে করে, নিজেরই মেয়েত—কিন্তু সাধ্য আর কতটুকু।'

বড়কাকীমা ধনা দেবী আবার এরই মধ্যে শাশুড়ী ঠাকরুনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'মা, আপনার কিন্তু আরো নাতনী আছে, নাতবৌরা আসবে।'

ঠাকুমা বললেন—'যতক্ষণ আছে দেব বৈ কি। হাজার হোক কিন্নু আমার বড় নাতনী, বংশের বড় মেয়ে। ওর দাদু শেষ কথা বলে গিয়েছিল. ফিরে এসে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ফিরে এলে এ বিয়ে কত ধুমধাম করে কবেই হয়ে যেত। আমার যেটুকু সাধ্য আমি অবশ্যই করব।'

কিন্নুর বিয়ের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। দিদির মন এখন খুশিতে ভরপুর। পরীক্ষার ফল বের হতে আর অল্পদিন বাকি আছে। শবু হীরাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বিকেলে যায়—সমুদ্রের ধারেও এক আধবার ঘুরে আসে, উভয়েরই সঙ্গে ছোট ভাইবোন দু একজন করে থাকে। তারা সমুদ্রের ধারে

বসে বালি নিয়ে খেলা করে, ঝিনুক খোঁজে, বালির ঘর বানায়। শবু আর হীরা সমুদ্রের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে গল্প করে। গ্রীষ্মের শেষ, সমুদ্রের ধারে ভ্রমনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। দুরন্ত সমুদ্রের হাওয়ায় ওদের শাড়ীর আঁচল উড়তে থাকে, আটোসাঁটো করে কোমরে জড়িয়ে তবে নিশ্চিন্তে বসা যায় বালির উপরে। মাঝে মাঝে ভাইবোনদের সামলাতে উঠে যেতে হয় আবার ফিরে এসে পাশাপাশি বসে। হীরা বলে—

'তুই এখন আমাদের বাড়ীতে খুব কম আসিস, আমি ত এক দু'দিন অন্তরই তোদের বাড়ী যাই।'

শবু বলল—'কি করব, সামনে দিদির বিয়ে। তাই নিয়ে নানা কাজ সব সময় লেগে আছে। সে জন্য মাঝে মাঝে আসা হয়ে ওঠে না।'

হীরা কপট ঈর্ষার সুরে বলল—'তোর ভাই বেশ মজা। কিস্কুদির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এর পরেই তোর পালা। আমার যে কবে সে ভাগ্য হবে।'

শবু জানে হীরার মনোবেদনার কথা, ওর দিদি জন্মরুগ্ন, কবে কি ভাবে তার বিয়ে হবে কে জানে, তারপরে ত হীরার বিয়ের কথা ভাববে তার মা বাবা। শবু গম্ভীর ভাবে বলল—

'বিয়ে অত সহজ কিনা? ওদের কোন দাবিদাওয়া নেই তবু বাবার কত ধার দেনা হচ্ছে এই বিয়েতে—সব ত জানিনা, মা বাবার কথায় মাঝে মাঝে কিছু জানতে পারি। তোর দিদির বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে না?'

হীরা বলল—'চেষ্টা করেই বা কি হবে বল? অসুস্থ মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া বাবার ত আর সে রোজগার নেই, দোকানত করেই উঠে গেছে। নানা কোম্পানীর এজেন্টগিরি করে কোন রকমে সংসার চলছে। খুব টাকা খরচ করতে পারলে হয়ত দিদির বিয়ে হ'ত। আমাকে ভাই পড়াশুনাই চালিয়ে যেতে হবে।'

শবু বলল—'ভাল কথা, কবে আমাদের পরীক্ষার ফল বের হবেরে?'

হীরা বলল—'বোধ হয় আর দিন দশেকের মধ্যেই। তুইও কি কিস্কুদির মত কটকে পড়তে যাবি? আমি ত ভাবছি এখানকার কলেজেই পড়ব। কটকে থেকে পড়তে গেলে অনেক খরচ, জ্যেঠাদের বাড়ী থাকা যাবে না—তারা খুব বড়োলোক আর আমরা এখন গরিব হয়ে পড়েছি।'

শবু বলল—'আগে পাশ করি কিনা দেখ, তারপরে পড়ার কথা। তবে তুই যদি এই কলেজে পড়িস আমরা তাহলে দুজনে একসঙ্গে এখানেই পড়তে পারব।'

হীরা আশা প্রকাশ করল—'আমরা নিশ্চয়ই পাশ করে যাব। আমরা ত কেউ লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না। কি বলিস ?'

শবু বলল—'আমারও সেই আশা। না হলে কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।' বলতে বলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে—'সূর্য্য কখন ডুবে গেছে—অন্ধকার হয়ে আসছে, চল চল তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই না হলে সব কি ভাববে।'

দুজনে ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে দ্রুত চলতে থাকে।

বিয়ে যত এগিয়ে আসছে মা ঠাকুমা তত বিব্রত বোধ করছেন। এবংশে তিন পুরুষে কোন মেয়ে ছিলনা, মেয়ের বিয়ের অভিজ্ঞতা তাই কারো নেই। কর্ত্তামা বেঁচে থাকলেও কোন সুবিধে হ'ত বিনা সন্দেহ। বিয়ের যা যা অনুষ্ঠান সে সব ত ঠাকুরমশাই বলে দেবেন। কিন্তু নানা রকমের স্ত্রী-আচার আছে সেগুলো ঠিক ঠিক মত করতে হবে ত। ঠাকুমা নির্ঝরিণী দেবীর নিজের বিয়ে হয়েছিল সে কোন আদ্যিকালে কৈশোরের শেষাশেষি। মা পদ্মিনী দেবীও প্রায় পঁচিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন এ সংসারে। সে সব স্ত্রীআচার লোকাচারের কথা এতদিন কারো মনে নেই।

পদ্মিনী দেবীর মনটা খুঁত খুঁত করে—কোন অনুষ্ঠানে যেন ত্রুটি না হয়। শাশুড়ী বৌতে নানা আলোচনা হয়। নতুন বিয়ে হয়ে আসা খনা দেবী কিছু পরামর্শ দেন। কাছেই আছেন পদ্মিনী দেবীর দিদি, শবুদের বড়মাসী, তাঁর মতামতও নেওয়া হল। ভুবনেশ্বর থেকে ছোটকাকীমা দীপ্তি দেবী এসে পড়লেন ছেলে মেয়েদের নিয়ে সঙ্গে ছোটকাকা—দীপ্তি দেবীও কিছু অনুষ্ঠান সংযোজন করলেন। হীরার মা, পারিজাত দেবী, ঠাকুর মশাইএর পুত্রবধূরা যা বলেন, মা পদ্মিনী দেবী তাও ফেলতে পারেন না। শেষে তিল তিল করে তিলোত্তমার মত গড়ে উঠল লোকাচার স্ত্রীআচারের এক বিশাল নির্ঘণ্ট—সেখানে পাওয়া যাবে উত্তর-বঙ্গ দক্ষিণ-বঙ্গ, হাওড়া হুগলী পাবনা নানা জায়গার সব প্রথা প্রকরণ। এত সব আচার অনুষ্ঠানের কথা শুনে বড়কাকা হেম ঠাট্টা করে বললেন—

'কাছেই গীর্জা আছে, খানিক দূরে একটা মসজিদও—ফাদার আর মৌলবীদের মতামতটাই বা বাদ যায় কেন ?'

ছোটকাকা বললেন পরিহাস করে—'না, সে সব জায়গায় যাওয়া চলবে না—ওরা তো ম্লেচ্ছ কিম্বা যবন। সমস্ত অনুষ্ঠান অপবিত্র হয়ে যাবে।'

গিরিনবাবু কপট বিরক্তি দেখিয়ে বললেন—

'তোরা আর ফর্দ বাড়াসনি। এই যোগাড় করতেই আমাকে রোজ দু-বেলা লক্ষ্মী বাজার থেকে বড়বাজার পর্য্যন্ত ছুটতে হচ্ছে। চন্দন পুকুরের জল, ইন্দ্রদ্যুম্ন পুকুরের কাদা, বিদুরের খুদ, ইঁদুরের মাটি, মন্দিরের ধুলো—সবই নাকি লাগবে। ডাক্তারী করা আমার মাথায় উঠেছে!'

ঠাকুমা বললেন—'সে সব তোমরা বুঝবে না। মেয়েদের অনেক কিছু লাগে, না হলে কোন দেবতা কখন রুষ্ট হন কে জানে?'

বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকি। কথাবার্ত্তা, হৈ হট্টগোল, চেঁচামেচিতে বাড়ীটা গমগম করছে। এষ্টেটের ম্যানেজারবাবুকে বলে পাশের দু খানা খালি ঘর পাওয়া গেছে, ছাদে টাঙানো হবে সামিয়ানা—সেখানেই হবে বিয়ে। বড়রা কথা বলেন, কাজ করেন, ছোটাছুটি করে জিনিষপত্তর আনান। ছোটদের দল করছে শুধু কলরব আর উপর নীচ। ছাদে সামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে।

বিয়ের আগের দিন সকালে কলকাতা থেকে বর সহ বরযাত্রীরা এসে গেল। সমুদ্রের ধারে চাটুয্যে মশাইয়ের বাসার কাছে একটা ভাড়া বাড়ীতে উঠেছে। বড়মাসীর মেয়ে বেবীদির উৎসাহে সব ভাইবোন গিয়ে বর দেখে এল, সে দলে শবুও ছিল।

বাড়ী ফিরতে মা ঠাকুমা কাকীমারা ওদের নিয়ে পড়লেন—বর কেমন দেখে এলি বল, তোদের সঙ্গে কথা বলল কিনা, হাসি খুশি কিনা?

মিতু বলল—'খুব হাসি খুশি, আমাদের সঙ্গে কত গল্প করল। আর মেজদির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। বরযাত্রীরা বলাবলি করছিল—কনেও নিশ্চয় ঐ রকম সুন্দরী হবে। সুশীলের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।'

মা চিন্তিত ভাবে বললেন—'শবুকে যেতে দেয়া বোধ হয় ঠিক হয়নি। ছেলে তো আগে কিন্নুকে দেখেনি, পরে যদি কালো মেয়ে মনে না ধরে।'

ঠাকুমা বললেন—'আমরা তো কিছু মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে দিচ্ছি না। ছেলের বাপকে মেয়ে দেখানো হয়েছে, আর পছন্দও হয়েছে। এখন মেয়ের কপাল।'

বেবী বলল—'বরও তো রীতিমত কালো। জানিস কিন্নুদি, বর সুশীল কুমার ঠিক অশোক কুমারের মত দেখতে—সেই যে সেদিন সিনেমায় দেখলাম।'

শবু বলল—'আমারও ঠিক ঐ কথা মনে হচ্ছিল।' ভাবনায় এগিয়ে থাকলেও শবু কথা বলায় সবার পিছনে।

বিয়ের দিন দুপুরে খবর পাওয়া গেল—ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। শবু আর হীরা—দু জনই পাশ করেছে। ক্লাশের বারো জনের মধ্যে ন'জন পাশ। ওদের ছয়জনের গ্রুপের সবাই পাশ করেছে। উর্মিলা যে পাশ করতে পারবে সে নিজেও হয়তো ভাবতে পারে নি। গত বছর অত উৎসাহ নিয়ে সরস্বতী পুজো করেছিল বলেই বুঝি সে উৎরে গেল।

দিদির বিয়ে, বাসি বিয়ে বেশ ভালভাবে মিটে গেল। বাড়ীতে প্রথম মেয়ের বিয়ে। ফাইফরমায়েস খাটার ফাঁকে ফাঁকে শবু দেখল, মা সাধ্যমত কোন অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকতে দিলেন না। সব সময়ই তাঁর মনে ভয়—এই বুঝি কোন ত্রুটি হয়ে গেল।

শুভ দৃষ্টির সময় নতুন বর সুশীল বোধ হয় মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গিয়েছিল। আগের দিন দেখা সুন্দরী শালীর সঙ্গে বিয়ের কনের মিল খুঁজে পায়নি হয়ত। বাসর ঘরে কনের গলায় মিষ্টি গান শুনে তার আশাভঙ্গ অনেকটা দূর হয়েছে। বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে—

'আমি জিতে গেছি। এমন সুন্দর মিষ্টি গলার গান—ভাবতেই পারিনি।'

কারণ, শবুকে গান গাইতে বলাতে সে বাসর ছেড়ে পালিয়েছে। শবু গাইবে গান—তবেই হয়েছে!

মা পদ্মিনী দেবীর ছেলেমানুষী স্বভাব যাবার নয়, মেয়ের বাসরেও আড়ি পেতে বসেছিলেন। জামাই এর মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনে খুশিতে ডগমগ হয়ে নীচে নেমে এসে ছোট জা এর গলা জড়িয়ে বলেছিলেন—

'ওগো দীপু, জামাইয়ের আমার কালো মেয়েকে খুব পছন্দ হয়েছে, আমি নিজে কানে শুনে এলাম।'

শবুরাও এ ব্যাপারে একমত, জামাইবাবু খুব ভাল। নিজে মেয়ে দেখেনি বাবার কথায় তাঁর পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করল, কি সুন্দর কথাবার্তা বলছে, এখনকার দিনে এমন কজন হয়? খুশি হয়ে বিয়ের বাসরেই শবু একসময় বলেছিল—

'জামাইবাবু, আপনাকে একটা সুখবর দেবো। আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আজই খবর এসেছে।'

সুশীলও খুশি হয়ে বলেছে—'তাই নাকি? তাহলে এখনই একবার মিষ্টিমুখ করতে হয়।'

লাজুক শবু পাশের খবর দিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল।

হৈ হট্টগোল কমে গিয়ে একটা করুণ পরিবেশ নেমে এসেছে সারা বাড়ীতে। ঘোড়া গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। বরকনে সহ সকলে এসে পৌঁছল সেখানে। মা পদ্মিনী দেবী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

'বাপ মায়ের ঘরে দুঃখ কষ্টের কথা মনে রাখিসনা। পরে যখন সে সব কথা মনে পড়বে দেখবি সেটাই মনে হবে আনন্দের। এখানে পড়ে থাকবেন তোর শ্বশুরমশাই তাঁর কথা মনে রাখিস সর্বদা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবি। সুশীলকে সেবা যত্ন করিস, ভক্তি ভালবাসা দিস।'

জামাইকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—'আমার এই অযোগ্য কালো মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওর রং কালো হলেও ওর মধ্যে পাবে এক কোমল দরদী মন। আশা করি সেবা যত্নে সে তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে।'

আর সব শেষে সেই মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান—কুলোয় করে কিছু ইঁদুরের মাটি পিছন ফিরে মাথার উপর দিয়ে বাপ মায়ের প্রসারিত আঁচলে ঢেলে দেওয়া—পিতৃঋণ মাতৃঋণ পরিশোধ চিরকালের জন্য। কান্নায় মা মেয়ের বুক ভেসে যাচ্ছে—বাবা গিরিনবাবুর মুখখানিও বেদনায় করুণ।

অদ্ভুত স্নেহের টান—মায়ার বন্ধন। সুখেও কাঁদায় দুঃখেও কাঁদায়—কাঁদে মিলনে কাঁদে বিরহে। শবুর মনে হচ্ছে, একদিনেই বুঝি বাড়ীটা ফাঁকা হয়ে গেল। এত লোক জনের মধ্যেও সে তার আজন্ম সাথী মায়ের মত স্নেহশীলা দিদির অভাবে চারদিক শূন্য দেখছে। দিদি নিশ্চয়ই সুখী হবে। জামাইবাবু খুব ভাল।

দিদি ছিল শবুর থেকে সাড়ে তিন না সাড়ে চার বছরের বড়। ছোট বেলা থেকেই দিদি শবুকে আগলে রাখত। শবু তো চিরকালের বোকা—সেই বড়মার স্কুলে পড়ার সময় স্পোর্টসে কমলালেবুর কোয়া মুখে ধরা, গানের কম্পিটিশনে নাম দেওয়া—এমন কত বোকামিই সে করে এসেছে। দিদি তাকে বারবারই বোকামির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে।

'মোদের গরব মোদের আশা—আ মরি বাংলা ভাষা' কবিতাটি মুখস্থ করার সময় এমন একটা বোকার মত প্রশ্ন সে করে বসেছিল যা ভাবলে এখনো হাসি পায়—

'দিদি, আমরি বাংলা ভাষা কেন রে, আমরি ওড়িয়া ভাষা হবে তো?' ওড়িয়াতে আমরি মানে আমাদের।

দিদি বলেছিল—'বোকার মত কি বলছিস? আমরা তো বাঙালী—বাংলা ভাষাই ত হবে। আ মরি মানে আহা মরি।'

কথাটা এখনও শবুর ঠিক মনঃপূত মনে হয় না। বাঙালী ঠিকই, কিন্তু ওরা জন্মেছে উড়িষ্যার মাটিতে। জন্মভূমিও ত মা, সেখানকার ভাষাও ত মাতৃভাষা। বাংলা কবিতাটিকে একটু পাল্টে আ মরি ওড়িয়া ভাষা বললেই বা ক্ষতি কি?

তিন

কলেজ খুলে গেছে, নতুন সেশন শুরু হচ্ছে। বিয়ের পর দুদিন পার না হতেই বাড়ীতে কথা উঠল শবুকে কলেজে ভর্তি করা নিয়ে। বড়কাকা বললেন—

'এখানে এখনও মেয়েদের একটা আলাদা কলেজ হল না। কো-এডুকেশনের ছেলেগুলো এক একটা বাঁদর হয়।'

ছোটকাকা বললেন—'সে কথা বলা ঠিক না, মেজদা। তুমি আমি যে কলেজে আই এস সি পড়েছি সেখানেও কো-এডুকেশন ছিল। আমরা ত বাঁদর হইনি। তবে দু একটা খারাপ ছেলে সব জায়গাতেই থাকে।'

বাবা বললেন—'আমিও কো-এডুকেশন বিশেষ পছন্দ করিনা তবে এখানে ত অন্য ব্যবস্থা নেই। বারবার কলেজে পড়ার জন্য মেয়েদের হোস্টেলে পাঠানো এক ঝকমারি। আর শবুর উপর আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে, কোন ছেলেই ওর নাগাল পাবে না।'

ঠাকুমা বললেন—'সেই ভাল—তাছাড়া হীরাও নাকি শুনলাম এই কলেজেই ভর্ত্তি হচ্ছে, দুটিতে বেশ একসঙ্গে যাবে আসবে।'

মা বললেন—'হ্যাঁ মা, আপনি ঠিক বলেছেন। ঘরের মেয়ে ঘরের থেয়ে স্কুল কলেজে পড়বে—কেন শুধু শুধু কটক-কলকাতা করতে যাবে?'

আসলে বাবা মা কেউ শবুকে চোখের আড়াল করতে চান না। আর আছে শবুর প্রতি সকলের অগাধ বিশ্বাস। যখন বিয়ে হয়ে ম.:ব .স অন্য-কথা, তখন ত সহ্য করতেই হবে। কিন্তুর বিয়ের পর থেকেই পদ্মিনা দেবী অবশ্য স্বামীকে আড়ালে বলতে আরম্ভ করেছেন, শবুর বিয়ের জন্য চোখ কান খোলা রাখতে। সুযোগ পেলেই হাতছাড়া করা নয়। এক মেয়ের জন্য

এক দেড় বছর কি নাকানি চুবানিটা খেতে হয়েছে। আশা করা যায় এ মেয়ের বেলায় তেমন হবে না।

ঘাসউলী হোতার মা গ্রামে ফিরে যাবার আগে খুশি হয়ে শুনে গেল তার আদরের মেয়ে শবু এবার কলেজে পড়বে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করে গেল। রামুদাও সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। সে গ্রাম থেকে এক জোড়া ছাগলছানা—একটা পাঁঠা একটা পাঁঠী—এনে দিয়ে গেছে, শবু তাদের সেবার ভার নিয়েছে।

রামুদা, হোতার মা চলে গেল আর সব শেষে গেলেন ছোটকাকা কাকীমা ভুবনেশ্বরে. সঙ্গে শ্রীলা. এলা, বাবু, পুটু।

অরক্ষণীয়াকে পাত্রস্থ করা গেছে যাঁর চেষ্টায় তাঁর কথা ভেবে ঠাকুমা একদিন বললেন—

'ওরে গিরিন. কিঙ্কুর বিয়ে হয়ে গেল, শবুকেও কলেজে ভর্তি করা ঠিক হল। কিন্তু কিঙ্কুর বিয়ের মূলে যিনি সেই হেমলতা দেবীর কাছে যে তোদের একবার যাওয়া দরকার। তাঁর উপকারের ঋণ আমরা কোন দিন শোধ করতে পারব না।'

গিরিনবাবু বললেন—'হাঁ মা, এবারে যাব। এই ত সবে কাজ কাম মিটল, বাড়ীতে লোকজন। এখন সব মিটে গেছে, এবারে যাব। চাটুয্যে মশাইকেও দেখে আসব।'

পরদিন বিকেলে এক ঝুড়ি মিষ্টি নিয়ে গিরিনবাবু ও পদ্মিনী দেবী দুজনে এক সঙ্গে রওনা হলেন বড়মার আশ্রমের উদ্দেশ্যে। বড়মার সামনে ঝুড়ি নামিয়ে রেখে দুজনে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি খুশি হয়ে বললেন—

'করেছ কি গিরিন, আমি বুড়ীমানুষ এত মিষ্টি খেতে পারি? বস, বস তোমরা।'

গিরিনবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'আমি জানি, আপনি একটি দুটির বেশী খেতে পারেন না। এনেছি আপনার আশ্রমের মেয়েদের জন্য।'

বড়মা গিরিন-জায়াকে লক্ষ্য করে বললেন—

'তোমার এই রূপবতী বৌ পদ্মিনীকে আমার খুব ভাল লাগে। আগেকার দিনে হলে আর একবার রাজস্থান ছারখার হয়ে যেত।'

পদ্মিনী দেবী লজ্জা পেয়ে বললেন—'আপনার যে রূপের খ্যাতি, এই বয়সেও আপনার যা চেহারা—আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।'

বড়মা পরিহাস করে বললেন—

'চুপ চুপ, কে কোথায় শুনে ফেলবে। তা জামাই ভাল হয়েছে ত? আমি সেদিন দেখলুম, প্রণাম করতে এয়েছিল মেয়ে জামাই এক সঙ্গে, ছেলেটি ত ভালই মনে হল।'

পদ্মিনী দেবী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন 'জামাই খুব ভাল হয়েছে বড়মা, যেমন দেখতে, তেমন সুন্দর স্বভাব, হাসি খুশি।'

'মেয়ের মায়ের পছন্দ হলেই হল।' বলে খুশিতে বড়মা শিশুর মত হাসতে লাগলেন। পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন 'মেয়ের ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর নাতজামাই পছন্দ হয়েছে ত? তাঁর শরীর কেমন আছে? ছেলে মেয়েরা সব ভাল আছে ত? এখন ত তোমাদের দুটি ছেলে অনিন্দ্য আর অমিত আমার স্কুলে পড়ছে। কোলেরটি ত শুনলুম মেয়ে হয়েছে—কি নাম রেখেছ তার? তাকেও এই স্কুলে ভর্তি কোরো—তোমাদের সংসার বাড়লে আমার স্কুলেরও বাড়-বাড়ন্ত হয়।'

মৃদু হাস্য পরিহাস ও কুশলাদি বিনিময়ের পর মৈত্র দম্পতি বড়মার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ফেরার পথে কিছু মিষ্টি কিনে তাঁরা চাটুয্যে মশাই-এর সঙ্গে দেখা করে বয়াই-সুলভ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করে এলেন। ঠাকুমা পুত্রবধূর মুখে সব শুনে খুব খুশি হলেন আর চাটুয্যের শারীরিক দুর-বস্থার বর্ণনা শুনে আন্তরিক দুঃখিত হলেন। শম্ভুও শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে শুধু বড়মার কথাই ভাবতে লাগল, কি অদ্ভুত তাঁর স্মৃতি শক্তি, সকলের কথাই তাঁর মনে থাকে।

শবু ও হীরা এক সঙ্গেই কলেজে আই এ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হল। ক্লাশ আরম্ভ হয়ে গেছে। উর্মিলা, লাবণ্য, শর্মিষ্ঠা ও সীমন্তীও ভর্তি হয়েছে। উর্মিলা বেশ কথা বার্তা বলতে পারে, যাকে বলে বলিয়ে কইয়ে—শবুর ওকে খুব ভাল লাগে। নিজে বেশী কথা বলতে পারে না তাই বিপরীত স্বভাবের উর্মিলার প্রতি তার এত আকর্ষণ।

কলেজ এক নতুন জগৎ, নতুন রোমাঞ্চ নতুন অভিজ্ঞতা। প্রফেসররা ইংরাজীতে লেকচার দেন যার অর্ধেক কথা প্রথম প্রথম ওরা বুঝতে পারে না। পিরিয়ডে পিরিয়ডে ক্লাশের ঘর বদল। ক্লাশ আরম্ভ হবার আগে প্রফেসর মেয়েদের কমনরুমের পাশ দিয়ে যান। মেয়েরা দল বেঁধে তাঁর পিছনে পিছনে ক্লাশে ঢোকে। সেখানে তাদের জন্য আলাদা দুসারি বসার

বেঞ্চ প্রফেসরের ডায়াসের পাশে। লেকচার শেষে আগে মেয়েদের বের হতে দিয়ে প্রফেসর কমনরুম পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান। স্কুলের মত বই হাতে কেউ কলেজে আসেনা—সবার হাতে একটি কি দুটি খাতা ক্লাশে নোট নেবার জন্য। দূরের বেঞ্চগুলো থেকে মৃদু মন্তব্য ভেসে আসে—'কেতে স্নো পাউডার লগাউছি' 'বিউটি কুইন' 'আজি কণ সিনেমা দেখিবাকু যিবে ম্যাটিনী শোরে' 'শাড়ীর কি বাহার' এই রকম সব। মেয়েরা কারো দিকে তাকায় না, চোখ মাটিতে রেখে হাঁটে। পথে দেখলেও বলতে পারবে না সে ছেলেটি তাদের ক্লাশে সত্যিই পড়ে কিনা। তবে হঠাৎ হঠাৎ দু চারটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসরকে নানা প্রশ্ন করে। তখন স্বভাবতই মেয়েদের আড়চোখের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ে।

উর্মিলা খুব কড়া মেজাজের মেয়ে। বলে—'বুঝিল, এ সব হউছি হীরো, দেখাউটি হউছি, নিজকু জাহির করুছি। যেতে ফুলাই হউ আমার কিছি দরকার নাহি।'

উর্মিলা ঠিকই বলে, ওরা যত নাচা কুঁদাই করুক শবুদের তাতে বয়েই গেছে। শবু আর হীরা দুজনেই কম্বিনেশন নিয়েছে হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স আর সংস্কৃত। মর্নিং কলেজ—আবার মাঝে মাঝে দু একটা অফ্ পিরিয়ড থাকে।

এতদিনে একখানি জমি পাওয়া গেল, শহরের আর একটু ভিতরের দিকে। আসতে যেতে পথে একটা সিনেমা হল পড়ে। তা থাক, কি আর করা যাবে। খাসমহলের জমি নয়—সে দিক থেকে নিশ্চিন্ত. দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হতে কেউ রাজী নয়। সমুদ্র আরো দু তিন মিনিটের পথ দূরে হয়ে গেল, সেটা এমন কিছু নয়; এই শহরের লোক দিনান্তে কেন মাসান্তেও কেউ একবার সমুদ্রের দিকে যায় কিনা সন্দেহ নেহাৎ কোন কাজ না থাকলে। আর সমুদ্রের হাওয়া? সমুদ্রের ঐ ঝড়ের মত হওয়া শহরের কোন কোণে না পৌঁচচ্ছে?

জমি কিনতেই আট ন হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। ক্ষতি পূরণের টাকার বাকি রইল মাত্র পাঁচ ছ হাজার। এ টাকা দিয়ে কি বাড়ী হবে? ইঞ্জিনীয়ার অবিনাশবাবু পরামর্শ দিলেন—

'কিছু কোম্পানীর কাগজ বিক্রি করে দাও। আর ধানী জমি সব বিক্রি করে দাও—ফসল ত বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, সরকারও নাকি অচাষীদের হাত থেকে সব চাষের জমি কেড়ে নেবে। আমাদের জমি সব খুরদা

ভুবনেশ্বরের দিকে, আমি ওখান থেকে যোগাযোগ করে জমির খদ্দের যোগাড় করব। তারপর যখন যেমন টাকার আমদানি হবে তেমন তেমন একটু একটু করে বাড়ীর কাজ হবে।'

নির্ঝরিণী দেবী গিরিনবাবু ও হৈমবাবু বুঝলেন, এ ছাড়া আর উপায় নেই একসঙ্গে সম্পূর্ণ বাড়ী করা সম্ভব নয়। অবশেষে অবিনাশের কথা মত ধীরে ধীরে কাজ এগোতে লাগল।

চার

বর্ষা গিয়ে আবার শরৎ এসেছে। পূজোও প্রায় এসে গেল—মাসখানেক বাকি। গিরিনবাবু একদিন দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে করতে স্ত্রীকে বললেন—

'শুনছো, আজ কয়েক দিন হল এক লাহিড়ী মশাই আমার ডিসপেন্সারীতে আসছেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে। বেশ সজ্জন ব্যক্তি, এককালে দেশে থাকতে ওকালতি করতেন। ভদ্রলোককে ওষুধ দিয়ে সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না—তাঁর নাকি নানা উপসর্গ বিশেষ করে পেটে হজমের ব্যাপারে।'

পদ্মিনী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—'কি বললে? লাহিড়ী? বারেন্দ্র?'

'নিশ্চয়ই, পদবীতেই ত বোঝা যায়। তাতে কি হয়েছে?' গিরিনবাবু আশ্চর্য হলেন।

স্ত্রী বললেন—'এখানে কোথায় উঠেছেন?'

'তা তো জানিনা। বোধ হয় বলেছিলেন তাঁর এক ছেলে এখানে দিল্লীর সরকারী অফিসে কাজ করে। সমুদ্রের ধারে হোটেল পাড়ায় তাদের অফিস আছে।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'সে ছেলেটির বিয়ে হয়েছে কিনা বা লাহিড়ী-মশাই এর কোন বিবাহযোগ্য ছেলে আছে কিনা জিজ্ঞেস করনি? আমরা মৈত্র—তারা লাহিড়ী, পাল্টি ঘর ত।'

গিরিনবাবু বললেন—'তুমি দেখছি উঠে পড়ে লেগেছ। আবার এলো জিজ্ঞেস করব।' বলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন দুপুরে পদ্মিনী দেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন—

'ওগো শুনছো, কিছু খবর পেলে?'

'কিসের খবর ?'

'তোমার দেখি কিছুই মনে থাকেনা। সেই লাহিড়ী মশাই এর কথা বলছি। তিনি কি এসেছিলেন ? কি কথা হল ?'

গিরিনবাবু বললেন—'হাঁ এসেছিলেন আজ। বললেন এ ছেলের বিয়ে হয়নি তার উপরের এক ভাইয়েরও বিয়ে হয়নি। তিনি এ ছেলের বিয়ের কথা ভাবছেনই না, আগে উপরেরটার বিয়ে হোক। এ দিকে মেয়ের মা যে দিনরাত আমাকে তাগাদা দিচ্ছে সেকথা তাঁকে জানিয়েছি।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তা যাই বল, তুমি কিন্তু সব সময় কথাটা খেয়াল রেখো, শবুরও বিয়ে দিতে হবে।'

ঠাকুমা কাকীমার সঙ্গে কথা বার্তায়ও পদ্মিনী দেবী শবুর বিয়ের জন্য ব্যস্ততা দেখান। ঠাকুমা বললেন—

'দাঁড়াও, ছেলেকে আমার হাঁফ ফেলতে দাও। এই সবে দু মাস হল এক মেয়ের বিয়ে দিল—তার জের মিটতে দাও। ধার দেনা শোধ হোক।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তা ঠিক, আপনার বড় ছেলে বলছিল এ বিয়েতে তার দেড় হাজার টাকা মত ধার দেনা হয়ে গেছে।'

পাশ থেকে কানাই বলে উঠল—'মা, আমার দশ আনা পয়সা তোমার কাছে রাখতে দিয়েছিলাম, আছে ত ?'

মা বললেন—'নেইতো, বড়দির বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে।'

সবাই হেসে উঠল। কানাই সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে মা তার দশআনা পয়সা বড়দির বিয়েতে খরচ করে ফেলেছে। শেষে কি ভেবে কানাই বলল—

'ঠিক আছে, পরে হাতে পয়সা এলে আমাকে দিয়ে দিও' আবার সবাই হাসাহাসি করে।

পাঁচ

দুর্গাবাড়ীতে আসন্ন পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে নাটক ও নাচগানের রিহার্সাল। এবারে প্রথম রাতে হবে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ভানুসিংহের পদাবলী—পরিচালনায় বিপাশা বিদিশাদি। মিতুদের থেকে একটু বড় ফ্যান্সী, রুবী, মঞ্জরী, কণাদের গ্রুপ এতে নাচবে। দ্বিতীয় রাতে হবে সামাজিক নাটক দুই পুরুষ। অনেক বছর আগে এই নাটকে

ঝুটবিহারীর ভূমিকায় নিরঞ্জন বাবুর অভিনয় এখনও সকলের চোখের সামনে ভাসে। অবিনাশবাবু কল্যাণীর পার্ট করেছিলেন সেবার। এবারে করবে বলরাম কাকাদের মাঝবয়সী গ্রুপ—কেমন হবে কে জানে। তৃতীয় অর্থাৎ নবমীর রাতে হবে সাজাহান। হেমুকাকা সাজাহান, নীলুকাকা ঔরংজেব, ষ্টেশন পাড়ার নাড়ুদা হবে জাহানারা—আর সব কে কে।

বহুদিন মৈত্র পরিবার থেকে নাটকে কেউ নামেনি। এবারে একটা ব্যতিক্রম হতে চলেছে। ছেলেরা এখনও মেয়েদের পার্ট করে। কিন্তু দাদার ছেলে সিপার এর পার্টে এবারে নামবে মিতু, মেয়ে হয়ে ছেলে সাজবে—উল্টো ব্যাপার। মিতু রোজ রিহার্সালে যাচ্ছে।

পূজো এসে গেল। সপ্তমীর রাতে নাচগান বেশ ভাল হল। বড়মার শরীরটা ভাল নেই তাই আসতে পারেন নি। পরদিন হবে দুই পুরুষ। হঠাৎ শোনা গেল সাজাহান নাটকে জাহানারার পার্ট নিয়ে নাড়ুদার সঙ্গে সবার ঝগড়া হয়ে গেছে। সবাই বলছে ওকে দিয়ে জাহানারা চলবে না, ও নাদিরা করুক। এই অল্প সময়ে নতুন করে জাহানারা পাওয়া যাবে কোথায়? হোটেল পাড়ার সরকারবাবু বলেছেন—

'সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কাল দুপুরে ষ্টেজ রিহার্সাল হবে, আমি সেখানে জাহানারাকে হাজির করব।'

পরদিন বিকেলে রিহার্সাল সেরে ফিরে এসে মিতু বলল—'জান মা, সরকার কাকা হোটেলের এক বোর্ডারকে ধরে এনে ষ্টেজে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও জাহানারা। আশ্চর্য, লোকটা ঠিক ভুবনেশ্বরে সাইকেল ঠেলা সেই লোকটি। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি, কিন্তু লোকটা মনে হয় আমাকে চিনতে পারে নি।'

মা শুনে বললেন—'ওমা তাই নাকি? আমিও ত সে ছেলেটিকে দেখেছি। কাল গিয়ে দেখতে হচ্ছে ত।'

দুই পুরুষ একরকম ভালই হল। বলরামকাকার ঝুটবিহারী মোটামুটি চলনসই, কিন্তু কল্যাণীর পরচুলা দেখে মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল—বড়ই বেমানান।

শেষদিন বড়দের নাটক—পূজোরও শেষরাত, কাল পূজা শেষ—বিসর্জন। সেই বিসর্জনের দিন না আসা পর্যান্ত সকলেই যতটা পারে আমোদ অহ্লাদ করে নিচ্ছে। সাজাহান নাটক শুরু হল—হেমুকাকা সাজাহান সেজে বেশ ভাল অভিনয় করে চলেছেন, ঔরংজেবরূপী নিলুকাকাও সমানে তাল রেখে

চলেছেন। আরে হ্যাতো, সেই ছেলেটিই ত জাহানারা হয়েছে। নাটকের মাঝখানে স্থানীয় এক ধনী ব্যক্তি হেমুকাকাকে তার অভিনয়ের জন্ত সোনার মেডেল ডিক্লেয়ার করলেন, সেই সঙ্গে ঔরংজেবরূপী নীলু কাকাকেও। চারদিকে খুব হাততালি পড়ল। নাটক এগিয়ে চলেছে। আবার একটা সীন শেষ হতে ঘোষণা শোনা গেল—জাহানারার পার্টের জন্ত নবাগতকেও একটা সোনার মেডেল দেওয়া হবে। এসব ডিক্লেয়ার শুধু প্রতিশ্রুতি মাত্র—সত্য সত্য দেওয়া নয়। তবু আবার কিছু হাততালি পড়ল।

দর্শকের আসনে মহিলারা হেসে খুন—জাহানারাকে আবার মেডেল কেন? কেমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে—মেয়েদের মত চলাফেরাই নয়! আর মাথায় এত লম্বা যে অনেক অভিনেতার মাথাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—মোটে মানায়নি।

যারা ভিতরের খবর জানে তারা বলাবলি করল—মাত্র একদিনের রিহার্সালে স্টেজে নামার কৃতিত্বের জন্ত সরকাবাবু ধনী ব্যক্তিকে বলেকয়ে জাহানারার নামেও মেডেল ডিক্লেয়ার করিয়েছে, আসলে নিজের কৃতিত্ব জাহির করা। একটা মজার ব্যাপার, হাসির ব্যাপারই বটে। পাড়ার ক্লাবের থিয়েটারে এরকমটা হয়েই থাকে।

পূজোর অল্পকিছুদিন পরে একটি ঘটনায় সারা শহর আলোড়িত হল। স্থানীয় কলেজের এক প্রফেসরের স্ত্রী শেষ রাতে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। প্রফেসর রাত জেগে কলেজের খাতা পত্র দেখছিলেন, স্ত্রীকে বলে ছিলেন এক কাপ চা করে দিতে—তাইতেই আগুন লেগে এ্যাক্সিডেন্ট, প্রফেসরও আগুন নেভাতে গিয়ে সামান্ত পুড়ে গেছেন নাকি। লোকে বলাবলি করতে লাগল দুর্ঘটনা নয়—আত্মহত্যা, কিছুদিন থেকেই স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া মন কষাকষি চলছিল কলেজের একটি ছাত্রীকে কেন্দ্র করে। এটা তারই পরিণতি।

কলেজে মেয়েদের কমনরুমে জোর আলোচনা হচ্ছে। সবার কৌতূহল, কে সেই মেয়েটি?

শর্মিষ্ঠা বলল—'কে আবার? সেকেণ্ড ইয়ারের জ্যোৎস্নাদি। সে ত এ দুদিন কলেজেই আসছে না।'

হীরা বলল—'তারা দুজনেই ত বিজ্ঞান বিভাগের। এদেরও কাব্য রোগে ধরল?'

সীমন্তী বলল—'জ্যোৎস্নাদি নিজে ত যে রূপের ডালি। ওকে আবার

প্রফেসর কি করে ভালবাসে বুঝিনা।'

লাবণ্য বলল—'আজি কালি দুনিয়াটা কন হেলা, গুরু শিষ্য সম্পর্ক মধ্যে মাসুনাহাস্তি।'

উর্মিলা প্রফেসরের উপর খড়্গহস্ত। বলল—'এ সব পুরুষমানে বদমাস, তাঙ্কু জেলরে পুরিবা দরকার। এমানে গাছরু কাড়িব, ফুনি তলকু উঠাইব।'

শ্রাবণী শেষে বলল—শর্মিলাদির মত বোকা মেয়েও আছে দেখ। এরা কি করে আর একজনের ঘর ভাঙে বুঝিনা।'

তারা বুঝুক আর না-ই বুঝুক—মৃত্যুর ব্যাপারটা দুর্ঘটনা বলেই চলে গেল, প্রফেসরের হাতে হাতকড়িও পড়ল না, জেলও হল না। বরঞ্চ এত-দিন জ্যোৎস্নাদি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল, এখন জলের উপরে ভেসে উঠল।

বাড়ীতে মেয়েমহলের আলোচনায় ঠাকুমা বললেন—

'কি যে সব দিনকাল হল। কলেজটা হয়ে কোথায় ভাল হবে তা নয় এই সব কেচ্ছা কাণ্ড। তবে ত কলেজ না থাকলে ভাল ছিল।'

মা বললেন—'দোষ কলেজের নয় মা। আপনার মনে নেই সেই খগেন দাসের কথা। অসুস্থ স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে বিধবা শালীকে নিয়ে ঘর করছে।'

ঠাকুমা বললেন—'তা সে বৌও ছেড়ে কথা বলেনি, এখানে এসে কোর্টে মামলা লড়ে খোরপোষ আদায় করে নিয়ে গেছে। হিতেনবাবুই ত বিনে পয়সায় মামলা লড়েছিলেন বৌটির হয়ে।'

এতদিনে শবু ব্যাপারটা একটু একটু বুঝতে পারছে। খগেন কাকার মেয়ে ছন্দাদি দিদির বন্ধু—আগে তাদের বাড়ীতে কিস্তু আর শবু কত বেড়াতে গেছে। সেখানে ওরা এককালে ছন্দাদির মাকে দেখেছে, পরে বিধবা মাসীকেও দেখেছে। পরে আর মা কে দেখতে পেতনা। দেখত ছন্দাদি মাসীকে মা বলে ডাকে। এক সময় মা ঠাকুমা বারণ করাতে শবুদের সে বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শবুর মনে হচ্ছে, ভাল মানুষের-আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে।

তাই বা হবে কেন? ঐ যে ফুলঠাকুমা যিনি এর ওর বাড়ীর গাছ থেকে ফুল তুলে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে নিত্য যোগান দিয়ে কিছু আয় করেন। শবুরা তাঁকে ডাকে ফুল-ঠাকুমা বলে। স্বামীর কোন রোজগারপাতি নেই। তবু এত দুঃখ কষ্ট ও অভাবের মধ্যেও তাঁদের কোন মনোমালিন্য বা ঝগড়া-ঝাটি কেউ কখনো দেখেনি। আসলে কিছু লোক তা সে পুরুষই হোক আর

মেয়ে মানুষই হোক, খারাপ আছে। আর তাদের জন্যই গড়ে ওঠে এরকম সব কেচ্ছা কাহিনী।

ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেল—শবুরা সেকেণ্ড ইয়ারে উঠল। কানাইকে বড়মার স্কুলে আগেই শিশু শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয়েছিল, এখন প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদি ওদের ক্লাশ টীচার ছিল এতদিন। স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার আগে কানাই বিষ্ণুপ্রিয়াদির সামনে স্বচ্ছন্দে ডাংগুলি বা মার্বল খেলত, এখন তাকে দেখলেই সে বহুদূরে পালায়. প্রথম শ্রেণীতে উঠেও তার সে ভয় কাটে নি। বিষ্ণুপ্রিয়াদি এখন অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করে আছেন—স্কুলের বাসে তিনি আর যান না। না হলে কানাই হয়ত ভয়ে বাসেই উঠত না। শবুদের এই ভাইটি বড়ই দুরন্ত, নন্দুর মত শান্ত শিষ্ট নয়।

ছোটবোন তপু প্রায় দু বছরেরটি হল, বেশ ছোটখাট স্বঠাম মিষ্টি চেহারা। মুখে খুব পটপটি কথা হয়েছে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—খুকী তোমার নাম কি? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে—তপু, তাপসী, গৌরী, পূর্ণিমা। একজন মানুষের কত নাম—বাপরে—ঐ টুকু ত মানুষটা! ছোটবোন, আদর করে এক এক জনে এক এক নামে ডাকে।

নন্দু লেখাপড়ায় বেশ ভাল, খুব মনোযোগী—এবারে তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছে। ভুবনেশ্বর থেকে শ্রীলা এসে মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি হল—ওখানে মেয়েদের ভাল স্কুল নেই। শঙ্খও বেশ বড় হয়েছে—গনেশের মত নাদুসনুদুস চেহারাটি।

এই বসন্তেই ঘটল আর এক ঘটনা যার ফলে শুধু এ শহরেই নয়, রাজ্য জুড়ে হুলুস্থুল তোলপাড় হতে লাগল। প্রায় তিন বছর আগে নবকলেবরের রথের সময় নাগা-পুলিশে মারামারি হয়েছিল তারপর শহরে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। এবারের ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাগজওয়ালারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাগজ বিক্রি করতে লাগল—'কমলা হরণ পুলিশর মরণ'! নিয়া খুন্টা বা আগুনের ফুলকি নামে কাগজ সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে আগুন ছড়াতে লাগল।

কে কমলা হরণ হল আর কোন পুলিশেরই বা মরণ হল? গ্রাম থেকে এসে ছল মেয়ে কমলা আর তার মা। ওদের পিছনে নাকি দুষ্ট লোক লেগেছে তাই রক্ষা করার নাম করে পুলিশ মেয়েটির সর্বনাশ করেছে।

থানা অফিস কাছারি তোলপাড় হতে লাগল। প্রতিবাদে একদিন স্কুল কলেজে ষ্ট্রাইক হয়ে গেল। কলেজের লেকচার হলে প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি নিয়ে মিটিং হল। ছাত্র নেতারা তেজস্বিনী ভাষায় পুলিশি অত্যাচারের নিন্দা ও প্রতিবাদ করল আর মা বোনদের ইজ্জত রক্ষার শপথ নিল। শবুদের ক্লাশের উর্মিলা বেশ বলিয়ে কইয়ে, সেও ক্লাশের মেয়েদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিল। মেয়েরা সব মিটিং শেষে এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত যে যার ঘরে ফিরল।

ঠাকুমা বললেন—

'হায়রে, কি দেশ হল। যে রক্ষক সেই ভক্ষক! এর থেকে ত ইংরেজ রাজত্ব ভাল ছিল। এমন কথা কখনো শুনিনি।'

শবু ভাবে, তার এইটুকু জীবনে কত অভিজ্ঞতাই না হল। প্রত্যেকটি ঘটনা প্রতিটি কথা তার স্মৃতি কোঠায় জমা হতে থাকে। গ্রামের মেয়ে কমলার জন্য মন খারাপ লাগে—এই যে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল তার জন্য কে দায়ী? শবুদের ক্লাশের মেয়েরা ঠিক করেছে থার্ড ইয়ারের দ্বিবেদী বলে যে ছাত্রটি খুব ভাল বক্তৃতা করেছে কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনে সকলে তাকেই ভোট দেবে।

জামাই ষষ্ঠীর আগে দিন পনেরো ছুটি নিয়ে দিদি জামাইবাবু এসেছে। দিদিরা এসেই তার শশুরকে দেখতে গেল, সঙ্গে শবুরা ক'ভাইবোনও চলল।

চাটুয্যে মশাই কি কষ্টেই না আছেন। কোনরকমে একটু ওঠা বসা করতে পারলেও, চলাফেরা করতে মোটে পারেন না। দিদি-জামাইবাবু তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজী হলেন না। বললেন—

'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না, আমি এই জীবনেই এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিমলা নামে যে মেয়েটি আমার দেখাশোনা করে সে আমার কোন অসুবিধে হতে দেয় না।'

শবু এই প্রথম চাটুয্যে মশাইকে ও তাঁর অসহায় অবস্থা নিজের চোখে দেখল।...এ-ও এক জীবন। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এই যে পরিস্থিতি, প্রতি মুহূর্ত অপরের সাহায্য ছাড়া চলে না, সেটা যে কত কষ্টকর ও অসহনীয় তা বলার নয়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকাও দুর্ভাগ্যজনক, আবার মৃত্যুও কারো ইচ্ছাধীন নয়। আত্মীয় স্বজনরা সেবা যত্নই করতে পারে, সব অসুবিধে ত দূর করতে পারে না। তাঁর স্ত্রী বেঁচে থাকলে হয়ত ।

দিদি জামাইবাবু রোজ এক বেলা করে গিয়ে চাটুয্যে মশাইকে দেখে আসে। বাকি সারাদিন জামাইবাবু গল্প গুজবে বাড়ী মাতিয়ে রাখে। জামাই বাবু আবার খাস ঢাকাই বাঙাল, মাঝে মাঝে এমন খাস ঢাকাই কুট্টি বুলি ছাড়ে যে শবুরা হেসে কূল পায় না। ওরা আবার বাঙাল কথা একদম বুঝতে পারে না।

সুশীল রোজ দুপুরে মিতুকে নাচায়—'মিতু, তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে নাও। তারপর চল ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে আসি।'

স্কুল কলেজে সব গরমের ছুটি। মিতু তাড়াহুড়ো করে খেয়ে সেজেগুজে তাগাদা দেয়—'চলুন জামাইবাবু, সঙ্গে শ্রীলা নন্দু কানাইও যাবে।'

সুশীল ততক্ষণে খেয়ে উঠে মৌজ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, বলে—'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে এখন ঘুমিয়ে নি. পরে ইভিনিং শোতে যাবো।'

মিতু প্রতীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। শবু, কিস্কুকে জিজ্ঞেস করে—'সত্যিই সিনেমায় নিয়ে যাবে নাকিরে দিদি ?'

কিস্কু বলে—'ছাথ কি করে।'

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে সুশীল চুপচাপ বসে থাকে, যেন সিনেমায় যাবার কথা সে বলেই নি।

মিতু আবার তাগাদা দেয়—'কই জামাইবাবু, চলুন।'

'ও হ্যাঁ, চল' বলে সুশীল ধীরে সুস্থে কাপড় জামা পরে মিতু, শ্রীলাদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

ঘণ্টাখানেক দেড়েক পরে আবার সবাইকে নিয়ে ফিরে আসে। শবু জিজ্ঞেস করে—

'কি হল জামাইবাবু, সিনেমা দেখলেন না ?'

সুশীলের এক একদিন এক এক রকম জবাব—'আজ দেরী হয়ে গেল' 'আজকের বইটা ভাল নয়' কিম্বা 'আজ সিনেমা বন্ধ মেশিন খারাপ হয়ে হয়ে গেছে' ইত্যাদি।

মিতু মনের দুঃখে কেঁদে ফেলে, বলে—

'জামাইবাবু আমাদের সিনেমা হলের দিকেই নিয়ে যায় নি, সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে চীনাবাদাম খাইয়েছে আর গল্প করেছে।'

সুশীল বলে—'ঐত সিনেমা-ই হল।'

দিদি বলে—'কেন ওকে রোজ রোজ মনে দুঃখ দাও ? জান ত ও সিনেমার নামে পাগল।'

সুশীল শুধু মিটি মিটি হাসে। আবার পরদিন চলে আগের দিনের পুনরাবৃত্তি।

সুশীল একদিন শবুকে নিয়ে পড়ল। বলল—

'আচ্ছা শবু, তুমি যখন কলেজে যাও বা ফিরে আসো তখন রোজ একটা ছেলেকে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ না?'

শবু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—'কেন, দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?'

'থাকে কিনা তাই বল'—সুশীলের জেরা চলে যেন।

শবু বলল—'না, দেখিনি।'

সুশীল বলল—'না, এবার থেকে লক্ষ্য রেখ ত। রাজার ছেলে ঘোড়া বা মোটর সাইকেলে চেপে ঘোরাফেরা করে কিনা।'

শবু বলল—'রাজার এক ছেলেত আমাদের ক্লাশেই পড়ে, সে কেন ঘোরাফেরা করবে?'

সুশীলের তাক ফসকে গেল। গম্ভীর হয়ে বলল—'আমি এখানকার সব জানি, বাবার জন্ম পনের বছর ধরে আসা যাওয়া করছি।'

শবু হেসে বলল—'তাই কি হয়েছে? আপনি ত এতদিন আমাদেরকেই চিনতেন না।'

সুশীল একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—'একটু সরল হতে চেষ্টা কর শবু, সব মনের মধ্যে চেপে রেখো না।'

আসলে সুশীল এই শালীকে খুব স্নেহ করে, কেমন শান্তশিষ্ট কথা কম বলে, অকারণ নাচানাচি করে না। তাই সুশীল খুঁচিয়ে তার মনের গভীরের খবর জেনে নিতে চায়। শবু বুঝে পায় না গোপন করার মত কি থাকতে পারে?

অফিসের ছুটি শেষে জামাইবাবু দিদিকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

মা পদ্মিনী দেবী উঠে পড়ে লেগেছেন শবুর বিয়ের জন্য। কোথা থেকে এক ছেলের খবর পাওয়া গেছে, কটকে থাকে, কলেজের লেকচারার। বাবা গিরিন বাবুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা হল। ছেলের বাবা মা এসে মেয়ে দেখে এক কথায় পছন্দ করে গেল। পদ্মিনী দেবী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন।

গিরিন বাবু বললেন—'ওঁরা ত পছন্দ করে গেলেন, কিন্তু ছেলে এত কাছে থাকে সে কেন একবার নিজে এসে দেখে যাচ্ছে না? সবাই যে সুশীলের মত সুবোধ বালক হবে—বাবা মার কথা মেনে নেবে তার ঠিক কি?'

পদ্মিনী দেবীও একটু সংশয়ে পড়লেন, তাই ত, ছেলের একবার আসা উচিৎ ছিল। শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীকে দিয়ে চিঠি লেখালেন, ছেলে যেন একবার এসে মেয়ে দেখে যায়। বড় স্নেহের বড় আদরের মেয়ে শবু। সে যেন যার তার হাতে পড়ে সারাজীবন কষ্ট না পায় তারই জন্য এত সাবধানতা। বিয়ে হবে ত ছেলের সঙ্গে, সে যদি পছন্দ করে না নেয়, তবে মেয়ের বাপ-মায়ের মনে ভরসা কি যে সে ছেলে শবুকে আদরে রাখবে, সুখে রাখবে? থাকেও যখন এত কাছে। ছেলেটাকেও একবার দেখা দরকার, দেখতে শুনতে কেমন।

কিন্তু ছেলে আর আসে না। কানাঘুষোয় শোনা যেতে লাগল ছেলের মন নাকি অন্যত্র বাঁধা পড়ে আছে আর সেইজন্যই তার বাপ মা একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলের মন ফেরাতে চাইছে।

গিরিন বাবু এক কথায় সম্বন্ধ নাকচ করে দিলেন, বললেন—'আমার মেয়ে শবু গিনিপিগ নয় যে, যার ইচ্ছে তাকে নিয়ে ছেলের উপর এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে। আমার ইঞ্জেকশনটা তৈরী করতে সেরকম পরীক্ষা আমি অনেক করেছি। তাই বলে আমরা শবুকে গিনিপিগ করতে দিতে পারিনা।'

পদ্মিনী দেবী, নির্ঝরিণী দেবীও এব্যাপারে একমত। আজকালকার ছেলে মেয়ে দেখেশুনে পছন্দ করবে সেই ত ভাল। এত কাছে থেকেও ছেলে

এসে একবার মেয়ে দেখবে না সেটা কি কথা? লোকের কথায় কান না দিলেও, ছেলে যদি একবারটি এসে মেয়ে দেখে যেত তবু বোঝা যেত ছেলের আগ্রহ আছে। অতএব সম্বন্ধ নাকচ।

কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ কি আগে থেকে কেউ বলতে পারে, না আভাস দিতে পারে? অনাগত ভবিষ্যৎকেই লোকে বলে ভাগ্য, কিছু ঘটে গেলে বলে—নিয়তি। তাই এই ভাগ্যরূপী ভবিষ্যৎ ভেবেই লোকে এমন অনেক কাজ করে যা হয়ত সব সময় সৌভাগ্য প্রসব করে না। তবু মানুষ বলতেই বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এই তিন নিয়ে চলে বিধির বিধান—সেখানে কারো হাত নেই। ছেলে বা মেয়ে পছন্দ হ'ল না হ'ল, তাতে অভিভাবকদের কোন কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নেই—সব নাকি আগে থেকে বিধির বিধানে নির্দিষ্ট করা আছে। যদি দুঃখ ভোগ থাকে সেও নাকি বিধির বিধান। যার যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা বিয়ে লেখা আছে তা হবেই।

তাই বলে কি মানুষ নিশ্চেষ্ট বসে থাকে? তাও নয়। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাধ্যমত সৎ চেষ্টাই করে। ভবিষ্যতে যা হবার হবে। বাপ মা পছন্দ না করে শুধু ছেলে মেয়েরা নিজেরা যেখানে পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করে সেখানেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়? তাও নয়। তাই এই বিতর্কের কোন শেষ নেই। থাকলে যুগ যুগ ধরে সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার গীত—গাথা রচনা হ'ত না, সৃষ্টি হ'ত না কত কাব্য মহাকাব্যের। সুতরাং শবুর জীবনের আজকের এই প্রতীকি ঘটনা থেকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের বা পরিণতির কোন আভাসই পাওয়া যাবে না। এখন তার বিচারও করা যায় না। বিচার করবে ভাবীকাল।

এখনই শবুর বিয়ে হওয়া না হওয়া কোন সমস্যা নয়। এখন সে কলেজে পড়ছে। শবুর নিজের কাছেও এখনো বিয়ের প্রয়োজন ততটা স্পষ্ট নয়। হীরা কিন্তু বলে অন্য কথা। বলল—

'তোর আর ভাবনা কি? তোর রূপ আছে, যে দেখবে সেই পছন্দ করবে—তোর বাবা মা-ও চেষ্টা করছেন। আমার যে কি হবে, দিদির বিয়ে দেয়া যাবে কিনা কে জানে।'

শবু মোটেই উৎফুল্ল বোধ করে না। বলল—'আমার বাবা এক মেয়েকে পার করতেই দেড়হাজার টাকার দেনায় ডুবে গেছে, আমি চাইনা আমার জন্য বাবা আবারও ঋণগ্রস্ত হোক। সে জন্য যদি কোনদিন আমার বিয়ে না

হয় সেও ভাল।'

হীরা বলল—'আসলে আমাদের এই মানুষের সমাজেই যত বৈষম্য। সেখানে রূপ দেখবে, বংশ দেখবে আর সবার উপরে দেখবে টাকা। টাকা নেই ত কিছুই নেই। প্রাণী জগতের আর কোথাও কি এমন দেখা যায়? মানুষ সভ্য হয়েছে না সমস্যা বেড়েছে।'

'তাই বলে কি আমাদের আদিম যুগে ফিরে যেতে হবে? যে হাত ধরে টানল তার সঙ্গেই যেতে হবে? মেয়েরা হবে বহুভোগ্যা?' শবু ঘেন্নায় শিউরে উঠল।

হীরা বলল—'না, তা নয়। তবে এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি অসহায় হয়ে থাকতে হবে, নিজেদের একটা ইচ্ছা বা মতামত বলে কিছু থাকবে না? ছেলেরাই শেষ কথা বলবে?'

শবু বলল—'সে ত অধিকারের কথা। কিন্তু সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মত পরিবেশ কোথায়?'

কলেজে ডারউইনের তত্ত্ব ওদের পাঠ্যসীমায় আছে, শিক্ষার গুণে অধিকার-বোধও জন্মায় কিন্তু এই কলেজী শিক্ষা কোন সমাধানের পথ দেখায় না।

হীরাকে দেখতে শুনতে মন্দ নয়, বেশ ভালই বলা যায়, লেখাপড়াও মোটামুটি শিখেছে। তবু তার বিয়ে হওয়াটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমে রুগ্না দিদির বিয়ে না দিয়ে হীরার বিয়ের কথা কেউ ভাববে না। এক বছর আগে পর্যন্ত আই এ পাশ দিদি কিন্নুর বিয়েও এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছিল যেহেতু সে ছিল কালো। তাই ওদের আলোচনাও অসমাপ্ত থেকে যায়।

অথচ বড় মাসীর মেয়ে বেবীদি? তার নাই রূপ, নাই লেখাপড়া। গ্রামে থেকে থেকে স্বভাবে রীতিমত গ্রাম্য। শবুর মনে আছে দিদির বিয়ের সময় কে যেন বেবীদিকে বলেছিল সলতে পাকিয়ে দিতে। বেবীদি বড় গলা করে বলেছিল—

'সলতে পাকাতে পারি, কিন্তু একবাটি জল না হলে কইল (কিন্তু) আমি পারবনে না।'

কি যেন একটা বিরাট ব্যাপার ভেবে শবু তাড়াতাড়ি একবাটি জল এনে তার সামনে ধরে দিয়েছিল। বেবীদি মাঝে মাঝে সেই জলে হাত ভিজিয়ে সলতে পাকাতে লাগল। একটু ভিজে হাত না হলে যে সলতে পাকাতে

অসুবিধে হয় তা শবুও জানে—তার জন্য এত হাঁকডাক! গ্রামের লোকেরা একটু শোরগোল না তুলে কোন কাজ করতে পারেনা।

সেই বেবীদির হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল এক পড়ন্ত রাজার দেওয়ানের ছেলের সঙ্গে। সবাই বলল, জমিদার ঘরের মেয়ে—বিয়ে হল দেওয়ানের ছেলের সঙ্গে, এ প্রায় রাজবাড়ীতেই বিয়ে হওয়া। রাজার রাজত্ব গেছে কিন্তু নাম ত আছে। কয়েকটা দিন খুব হৈ হট্টগোলে কেটে গেল। বড় মেসোমশাই উত্তর বঙ্গ থেকে এসেছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে।

শুভেন্দু দা জাঁক করে বলতে লাগল—

'ছোট মেসোমশাই কিছুর আর কি বিয়ে দিল, আমাদের বোনকে আমরা রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছি।'

বড় মেসোমশাইয়ের কিন্তু আগের সেই জমিদারসুলভ ভাব নেই। এখন তিনি গিরিনবাবুর মত গরিব ছোট-ভায়রার সঙ্গেও স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন। ছোট শ্যালিকা পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে জমিয়ে সরস গল্প করেন। দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়ে পদ্মিনী দেবী তাঁর জামাই বাবুর সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন। শবুরা তাগাদা দেয়—

'মা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, চল।'

মা বলেন—'দাঁড়া—অত তাড়া কিসের?' 'সে' ত ফিরবে রাত সাড়ে আটটায়।'

বড় মেসোমশাই বললেন—'ঠিকই ত, এখনই যাবে কি? খুকী (পদ্মিনী দেবীর ডাক নাম), তুমি বরং আমার পাশে এই মাদুরটাতেই শুয়ে শুয়ে গল্প কর। চিরকাল ত কালো বৌ নিয়ে ঘর করলাম, ফর্সা সুন্দরী বৌ পাশে থাকলে কেমন লাগে বুঝলামই না।'

মেসোর কথায় শবুর মাথা বুঝি গরম হয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে—মা নিশ্চয়ই ঐ বুড়ো লোকটার পাশে শোবে না, মজা করে হলেও। কি আশ্চর্য্য! মা সত্যি সত্যিই লোকটার পাশে শুয়ে পড়ে হেসে হেসে গল্প করতে থাকে। সেই দেশ গাঁয়ের গল্প যার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই—পাশ থেকে বড় মাসী আবার তাতে রসদ যোগান। শবু অধৈর্য্য হয়ে বলল—

'মা চল রাত হয়ে এল, আমার পড়াশুনা আছে।'

মেসোমশাই টিপ্পনি কাটলেন—'বাপ সোহাগী মেয়ে, বাপের জায়গায় আর কাউকে সহ্যই করতে পারছে না।'

শবু বড় মেসোর গ্রাম্যতায় মনে মনে আরো রেগে যায়। তারও ত

জামাইবাবু আছে, সে কি তাই বলে পাশে গিয়ে···। আসলে তার বয়সটাই এখানে সব—কিন্তু তা সে বুঝতে পারে না। মেসোমশাই কাজের জায়গায় চলে গেলে শবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখন আর ঐ বুড়োটা মার সঙ্গে রসিকতা করতে পারবে না।

বেবীদির বিয়ে হয়ে যেতে পদ্মিনী দেবী আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শবুর বিয়ের জন্য। মেজ-জার এক ভাই তার দিদিকে শশুর বাড়ী পৌছে দিতে দু একবার এখানে এসেছিল। সেই সূত্রে খনা দেবী একটা আভাসও দিলেন যদি এখানে তার ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করা যায়। পদ্মিনী দেবী এককথায় তা নাকচ করে দিলেন—এক কুটুমবাড়ীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার কুটুম্বিতা করা ঠিক নয়, নানান কথা উঠতে পারে। তাছাড়া সম্পর্কেও বাধে। শবুও ব্যাপারটার কিছু আভাস পায়। কিন্তু শবুর মনে তা রেখাপাতমাত্রও করে না। যা করার বাবা—মা করবেন, তাঁরা যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। তার নিজের মত কিছু নেই। পদ্মিনী দেবী যথারীতি তাঁর স্বামীকে তাগাদা দিয়ে চলেছেন।

দুই

আবার এসেছে শ্রাবণ মাস। এই মাসের প্রতি শবুর বুঝি নাড়ীর টান আছে। বর্ষার অঝোর ধারায় মন উতলা হয়ে ওঠে। আবার মেঘলা আব-হাওয়ায় মন ভারী হয়ে থাকে। শুনেছে এমনি এক বর্ষণ মুখর শিউলি ফোটা শ্রাবণ উষায় তার জন্ম। তাই সে শ্রাবণ মাসের সঙ্গে মর্মে মর্মে একাত্মতা বোধ করে। বেশীর ভাগ সময় মার কাছাকাছি থাকে, একটু দূরে থেকে বাবার সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখে, কলেজে যায় আসে, পড়াশুনাও ঠিক মত চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যসময় শঙ্খ তপু কানাই নন্দু মিতু শ্রীলাদের সঙ্গে গল্প করে খেলা করে। বর্ষা ভেজা অলস দিনে বিছানায় সব এক সঙ্গে বসে আগ-ডুম বাগডুম না হলে লুডো খেলার আসর জমে ওঠে।

রামুদার দিয়ে যাওয়া ছাগলছানা দুটি এখন অনেকটা বড় হয়েছে, শবুই তাদের দেখাশোনা করে। ছোটরা ছাগলছানা দুটোর নাচানাচি দেখে, নানান গাছের পাতা চাল ডাল কলাই ওদের মুখের সামনে ধরে। ছাগল দুটো সব খায়, মুখের কাছে কাগজের টুকরো পেলে তাও খেতে আরম্ভ

করে। কথায় বলে পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায়—কর্তামার মুখে শোনা শান্তর। নন্দু বলে—

'ছাগল দুটো পিটারের মত খেলা করতে পারে না। পিটার কেমন সুন্দর আমাদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করত, তাই না মেজদি ?'

মিতু বাধা দিয়ে বলল—'পিটার ত কুকুর ছিল। কুকুর আর ছাগল কি এক ? পাঁঠীটা আরো বড় হলে কত দুধ দেবে জানিস ?'

কানাই জিজ্ঞেস করল—'আর পাঁঠাটা দুধ দেবে না ?'

শ্রীলা বলল—'তুই দেখি বোকার মত কথা বলিস। পাঁঠা কি দুধ দেয় ? বড হলে লোকে কেটে খায়।'

শবুর মনটা চিরকালই কোমল, তার এসব কাটাকাটির কথা ভাল লাগে না। বলে—'আমি রাজাকে কাটতে দেবনা।'

শবু পাঁঠা ও পাঁঠীর নাম দিয়েছে রাজা আর রানী। তপু শঙ্খ পিটারকে দেখেনি, কানাই খুব ছোট থাকতেই পিটার মরে গেছে—তারা রাজা রানীকে নিয়েই মেতে থাকে।

রাজার গায়ের লোম কুচকুচে কালো। আর রানীর রং ধবধবে সাদা—কোথাও একটা লাল কালো ছিটও দেখা যায় না। এই নিয়ে গিরিনবাবু একদিন ঠাট্টা করে বললেন পদ্মিনী দেবীকে—

'পাঁঠার রংটা ঠিক তোমার ছেলে কানাইয়ের মত কুচকুচে কালো, আর পাঁঠীটার রং আমার মেয়ে শবুর মত।'

পদ্মিনী দেবীও হেসে বললেন—'তাই না কি ?

গিরিনবাবু তখন আরো রং চড়িয়ে সকৌতুকে বললেন—

'জাননা সে কথা ? আমার ডিস্‌পেন্সারীতে সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, গল্প গুজব করছিলেন, সমুদ্রের টানে তিনি নাকি প্রায়ই এ শহরে আসেন। গল্পের মাঝখানে কানাই আমার কাছে গিয়ে পয়সা চাইতে তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে বিদায় করলাম। কানাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কে ? বললাম—আমার ছেলে। ভদ্রলোক আরো অবাক হয়ে বললেন—আপনার ছেলের এমন রং ! আপনার স্ত্রী বুঝি ·। বললাম—নিশ্চয়ই, অবশ্য, আমার রং এর সঙ্গে মিল খুঁজতে গেলে আমার মেজো মেয়েকে দেখতে হবে।'

ঠাকুমা বললেন রঙ্গ করে—'তোর বৌ কালো, আর তাই তুই লোকের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছিস ?'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'আহা বলুকনা মা, তবু যদি নিজের মেয়েটার বিয়ের জন্য চেষ্টা করত আপনার ছেলে তবে বুঝতাম। সে বেলায় যত চিন্তা আপনার আর আমার।'

ঠাকুমা বললেন—'তা ঠিক, গিরিন, এখন থেকেই খোঁজ খবর করা দরকার।' এসব ব্যাপারে শাশুড়ী বৌ একমত।

গিরিনবাবু বললেন—'কে বলে আমি খোঁজ করিনা? ডিসপেন্সারীর সামনের রাস্তা দিয়ে যত লোক যায় আমি জনে জনে জিজ্ঞেস করি, কোন··'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তোমার তামাশা রাখ। মা, আপনার বড় ছেলেকে বলুন, যদি কোন কাজের কথা থাকে তাই আমাদের শোনাক।'

ঠাকুমাও সে কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

গিরিনবাবু বললেন—

'সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছিলাম, শেষে কি কথায় কি কথা এসে গেল। সেদিন একটি ছেলে এসেছিল তার বাবার জন্য ওষুধ নিতে। জিজ্ঞেস করাতে নাম বলল বরুণ দাস, বাড়ী ছিল নাটোর না রাজশাহী কোথায়।'

ঠাকুমা বললেন—'দাস দত্ত পাল দিয়ে আমাদের কি হবে?'

গিরিনবাবু বললেন—'আগে সবটা শোন। তাকেও বললাম কোন বারেন্দ্র ছেলের খোঁজ থাকলে জানাতে। বলল তাদের অফিসেই একটি ছেলে আছে ভাল কাজ করে। অফিসের যে নাম বলল, আমার ধারণা ওখানে কোন ভদ্রলোক কাজ করে না।'

পদ্মিনী দেবী সাগ্রহে বললেন—'ভদ্র অভদ্র বুঝিনা, ছেলে যখন ভাল কাজ করে বলেছে আর যদি পাল্টি ঘর হয়, খোঁজ খবর করতে দোষ কি?'

গিরিনবাবু বললেন—'ও সব বিয়ে শাদীর কথা আমার বলা আসেনা। এর পরে সে ছেলে এলে তাকে সোজা অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেব—যা বলার তোমরা বোলো।'

মেয়ে যেমন মা বাবা অন্ত প্রাণ, বাবা গিরিনবাবুও তেমনি মনে মনে তাঁর মেজো মেয়েটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন। এই মেয়ের বিয়ে হওয়া মানেই পর হয়ে যাওয়া। তাই তিনি নিজে থেকে কোন উদ্যোগ নিতে চান না। মা পদ্মিনী দেবীরও প্রায় একই অবস্থা, তবু মা হয়ে মেয়েকে চিরকাল চোখের সামনে আইবুড়ো করে রাখবেন অতটা স্নেহান্ধ স্বার্থপর হতে পারেন না।

দিন তিনেক পরে সন্ধ্যের সময় একটি ছেলে এসে বাড়ীতে ডাকাডাকি

শুরু করল—

'মাসীমা আছেন নাকি? আমাকে ডাক্তারবাবু পাঠিয়েছেন। আমার নাম বরুণ। কি আদেশ বলুন।'

ঠাকুমা ও পদ্মিনী দেবী এগিয়ে এলেন, বরুণকে বসতে দিলেন। ঠাকুমা বললেন—

'আমরা কি আদেশ করব বাবা? এখানে থাক কোথায়?'

'ঐ যে গৌরাঙ্গ মন্দির আছে তার কাছে বাবা মা ভাইবোনদের নিয়ে থাকি।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'ওঁর কাছে শুনলাম, তোমাদের অফিসে নাকি একটি ছেলে কাজ করে, এখনও বিয়ে থা করেনি, তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পার? আমার মেজো মেয়ে শ্রাবণীর জন্য একটি সুপাত্র খুঁজছি।'

বরুণ বলল · 'হ্যাঁ আছে। কিন্তু আমি ত তাকে কিছু বলতে পারব না। আমি নতুন চাকরিতে ঢুকেছি, আর সে আমার উপরওয়ালা।'

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন—'সে ছেলে কি ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র? কতদিন হল কাজ করছে?'

'হ্যাঁ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আমাদের নাটোরের দিকেই বাড়ী। বছর আড়াই তিন বোধ হয় এখানে কাজ করছে।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তাকে একবার বলে দেখনা কি বলে?

বরুণ বলল—'আমার বলাটা ঠিক হবে না, মাসীমা। তবে অন্য একটা উপায় বলতে পারি। তার এক পাতানো ঠাকুমা আছেন এখানকার প্রীতি লজে আর ঠাকুমার ছেলে জয়ন্তদা তার বিশেষ বন্ধু। আপনারা প্রীতিলজে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।'

প্রীতি ঠাকরুন নির্ঝরিণী দেবীর সমবয়েসী, আলাপ পরিচয় আসা যাওয়া আছে। ঠিক আছে, সেখানেই যোগাযোগ করা যাবে। বরুণ চা জল খাবার খেয়ে চলে গেল।

একদিন বিকেলে দুই শাশুড়ী বৌতে প্রীতি-লজে গিয়ে হাজির হলেন। প্রীতি দেবীর উপরের ছেলেগুলো কলকাতায় বড় বড় চাকরি করে। ছোট ছেলে জয়ন্ত বৌ ও এক মেয়ে নিয়ে এখন এখানে আছে। বৌ রেবা এসে প্রণাম করে চা পান যোগান দিতে লাগল। প্রীতি দেবী বললেন—

'অনেক দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়না—শরীরটাই ভাল থাকে না, বাড়ী থেকে বেরই হইনা।'

নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'আমারও প্রায় সেই অবস্থা, মাসান্তে একবার মন্দিরে যাওয়া তাই প্রায় হয়ে ওঠে না। আজ এলাম একটা বিশেষ ব্যাপারে। বরুণের মুখে শুনলাম তার অফিসে একটি ছেলে কাজ করে, আপনার ছেলে জয়ন্তর সঙ্গে তার আলাপও আছে। আমরা তার সঙ্গে গিরিনের মেজো মেয়ে শবুর বিয়ের কথা তুলতে চাই।'

জয়ন্ত ঘরেই ছিল, বলল—'কাকীমা, সে ছেলেকে আমি মাত্র অল্প কিছু-দিন হল চিনি। আমার বড় ভাইপো প্রশান্ত ছুটিতে এসে কোথায় যেন খেলতে গেছিল সেখানে তাদের আলাপ হয়, সেই সূত্রে এখানে আসা যাওয়া আছে। আমি বেকার মানুষ, খাইদাই বসে থাকি, তাই সে ভদ্রলোক এলে তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি—এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'জয়ন্ত ঠাকুরপো, তুমিই না হয় ছেলেটির কাছে কথাটা পাড়। দেখ কি বলে।'

জয়ন্ত বলল—'সে না হয় বললাম, বৌদি। তবে আপনাদের মেয়ে শবু দেখতে শুনতে ভাল, আমার মনে হয় আগে থেকে কিছু না বলে—এখানে যদি ওকে একদিন দেখান যায় তাতেই ভাল কাজ হবে।'

নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'যা ভাল বোঝ কর, বাবা। নাতনী বড় হয়েছে আমাদের কি আর চোখে ঘুম আছে, কি বলেন দিদি?'

প্রীতি ঠাকরুনও সায় দিয়ে বললেন—'সে ত বটেই, মেয়ের বিয়ে বলে কথা। যতদূর দেখেছি ছেলেটি ভালই মনে হয়, ভাল চাকরি করে নাকি।'

সব যোগাযোগের দায়িত্ব জয়ন্তর উপর দিয়ে দুজনে বাড়ী ফিরে এলেন।

তিন

কদিন পরে শবু কলেজ থেকে ফিরে বাড়ীর কিছু কাজ কাম সেরে খেয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠেছে। মা পদ্মিনী দেবী বললেন—

'শবু চল আমরা প্রীতিকুঞ্জ থেকে বেড়িয়ে আসি। তপু কানাইকেও সঙ্গে নেব।'

মার কথামত শবু হাত মুখ ধুয়ে তপু কানাইকে সাজিয়ে নিজে শুধু শাড়ীটা

পাল্টে তৈরী হয়ে নিল। তারপর চার জনে একটা রিক্সায় চেপে সন্ধ্যের মুখে প্রীতি লজে পৌছল। শবুকে দেখে প্রীতি ঠাকরুন বললেন—

'সেই বাদুলে মেয়েটি এখন এত বড় হয়েছে? আমি ওকে শেষ দেখেছি সেই ফ্রক পরা অবস্থায়।'

মা বললেন—'অনেকদিন ও কাপড় পরা ধরেছে, বড়ই লাজুক কোথাও যেতে চায় না।'

এ বাড়ী শবুর চেনা, ছোট থাকতে দু চারবার মা ঠাকুমার সঙ্গে এসেছে, তবে এখানে তাস খেলা হত না। জয়ন্তকাকা, তার মাকে চেনে, কাকীমা রেবাকে দু একবার পথে ঘাটে বা দুর্গাবাড়ীতে দেখেছে—বেশীদিন হল ত বিয়ে হয়নি। রেবা কাকীমা দেখতে বেশ সুন্দরী। রেবা বলল—

'মেয়ের চেহারা দেখি পাকা আপেলের মত, দেখিতো টোকা দিলে রস গড়িয়ে পড়ে কিনা?' বলে সত্যি সত্যিই শবুর গালে একটা টোকা দিল। 'ভারি সুন্দর চেহারা, গত পূজোয় ওকে দুর্গাবাড়ীতে দেখেছিলাম।'

শবু বুঝতে পারে না রেবা কাকীমা হঠাৎ ওর রূপ আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন?

পদ্মিনী দেবী বললেন—'ভাল কথা, আমার দিদির মেয়ের বিয়ে হল যে দেওয়ানের ছেলের সঙ্গে, রেবা ত সেই দেওয়ানেরই মেয়ে, না?'

রেবা বলল—'ওমা, হ্যাঁ, তাইতো। দাদার বিয়েতে বাপের বাড়ী গিয়ে শুনলাম দাদার এখানেই বিয়ে হচ্ছে। দাদা বৌ নিয়ে বাড়ী গেলে বৌদির কাছে শুনলাম ডাক্তারদাদা তার ছোট মেসো হন। আমি এসে সে কথা বলতেই ভুলে গেছি।'

জয়ন্ত বলল—'তোমার ত কিছুই মনে থাকেনা। আমি আগের দিন চুল কেটে এসে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস কর, ওমা তুমি চুল কেটে এলে কখন?'

প্রীতি ঠাকরুন বললেন—'ভালই হল, এখন একটা সত্যিকারের সম্পর্ক হল। বারিন্দিরের সম্পর্ক লতায় পাতায়।'

রেবা শবুর দিকে তাকিয়ে বলল—'ইস্, এত সুন্দর চুলের গোছ, একটু ভাল করে গুছিয়ে বাঁধনি কেন? কলেজে পড়া মেয়েরা সব এই রকমই হয়।'

জয়ন্ত ফোড়ন কাটল—'সেই জন্যই বুঝি স্কুলের পড়াটাই শেষ করনি।'

রেবা জবাব দিল—'আর তুমি বুঝি কত কলেজের চৌকাঠ মাড়িয়েছ?' বলে হেসে শবুকে বলল 'চল আমার ঘরে, ভাল করে চুলটা বেঁধে দিই।'

শবু এতক্ষণ কানাই তপু ও জয়ন্তকাকার মেয়েটাকে নিয়ে খেলা করছিল আর জয়ন্ত রেবার দাম্পত্য কলহ উপভোগ করছিল। শবু জানে জয়ন্তকাকা তার ভাইদের মধ্যে লেখাপড়ায় মাঠো; মাট্রিকের বেশী পড়াশুনা আর এগোয় নি। এখন বেড়াতে এসে হঠাৎ চুল বাঁধার প্রস্তাবে সে আশ্চর্য্য হয়ে মায় মুখের দিকে চাইল। মা বললেন—

'যা, ও ঘরে বসে তোরা গল্প কর, আমরা এখানেই বসে কথা বলি।'

কানাই তপু জয়ন্তর মেয়েকে নিয়ে খেলায় ব্যস্ত হয়ে রইল। রেবা শবুকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে চুল খুলে দিয়ে ভাল করে চুল বাঁধতে বসল। চুল বাঁধতে বাঁধতে রেবা বলল—

'আমার মাথায় এত চুল থাকলে তার কত যত্ন করতাম। যা-ও ছিল গতবারের অসুখে অর্ধেকই উঠে গেল। কত ভাল ভাল তেল মাখছি কিছুই হচ্ছে না। তুমি মাথায় তেল দাওনা নাকি?'

শবু বলল—'তেল দিই ত।'

রেবা বলল—'যেমন মেম সাহেবের মত চেহারা মাথার চুলও তেমন মেম-সাহেবদের মত।'

যতক্ষণ ধরে রেবা কাকীমা চুল নিয়ে ব্যস্ত ততক্ষণ শবু ভাবতে থাকে, শুনেছিল এই রেবাকাকীমা একবছরের মত অসুখে ভুগে প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, কথাটা তবে ঠিকই। মেয়েটা জন্মাবার পর পরই নাকি অসুখটা করেছিল— এখন ত বেশ সুস্থ স্বাভাবিক। মেয়ে মানুষের কিসে কি হয় কে জানে।

চুল বাঁধা শেষে রেবা জিজ্ঞেস করল—'স্নো পাউডার মাখো নাকি?'

'নাঃ।'

'সেই ভাল। আমাদের ত রুজ লিপষ্টিক মেখে মেখে গাল ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর তোমার যা রূপ তাতে স্নো পাউডারের দরকারই করে না।'

বাইরে জয়ন্তর গলা শোনা গেল—

'এই যে আসুন আসুন। বরুণ তুমিও এস।'

'কি ব্যাপার, জোর তলব এখনই আসতে হবে?' আগন্তুকের কণ্ঠ শোনা গেল।

জয়ন্ত বলল—'হচ্ছে হচ্ছে, আসুন আমার শোবার ঘরে আসুন।'

বাইরের লোকজন আসছে বুঝতে পেরে শবু ঘর থেকে চলে আসায়

উদ্যোগ নিতে রেবা বলল—

'আরে বস, বস—তুমি আবার চললে কোথায় ?'

শবু কিছু বলার আগেই—

'কি ব্যাপার, বাড়ীর ছোট বৌ কি আজ নতুন কোন খাবার···'বলতে বলতে জয়ন্তর পিছনে ঘরে ঢুকে আগন্তুক এক অপরিচিতাকে দেখে চুপ করে গেল। শবু এক পলক সবাইকে দেখে অন্যদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বলল—'আপনি না হয় এই চেয়ারটায় বসুন। লজ্জা পাবার কিছু নেই, ও আমার এক দাদার মেয়ে, কলেজে পড়ে।'

শবু আবার উঠতে যায়, রেবা হাত ধরে বসিয়ে দিল—

'আরে বস, বস, তুমি উঠছ কেন ? কথা বল।'

শবু আবার চুপচাপ বসে পড়ল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে মা কেন হঠাৎ তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে আর রেবা কাকীমাই বা কেন তার কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সঙ্গের ঐ বরুণ নামে লোকটাকে কদিন ওদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে, মা ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। এরকম অভিজ্ঞতা তার মাত্র একবারই হয়েছিল। সেবারে সামনে ছিল অভিভাবক-শ্রেণীর লোকজন—কিন্তু এবারে ? লজ্জায় শবু কারও দিকে তাকাতে পারে না—কখন কার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। আরক্ত মুখে তাই জানালা দিয়ে সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। শুনতে পায় জয়ন্ত বলছে—

'আপনি ত বড় পেটুক মশাই, এসে থেকে কেবল খাবার কথা বলছেন।'

জবাব এল—'কি করব বলুন, দু বেলা হোটেলে খাই, ঘরের তৈরী খাবারের নামে জিভে জল আসে।'

রেবা বলল—'এবারে একটা বিয়ে করলেই ত নিজের ঘর হয়।'

উত্তর হল—'হায়রে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে চাল চুলো নেই এমন একটা লোককে মেয়ে দিচ্ছে কে ?'

জয়ন্ত বলল—'চাল চুলো নেই চাকরি ত আছে। মেয়েও হাতের কাছে আছে।'

আবার পাল্টা জবাব আগন্তুকের—'মেয়ে থাকলে মেয়ের মা-বাবাও আছে, —তারা দেখবে···।'

বাধা দিয়ে জয়ন্ত বলল—'আমার মত বেকার ছেলের হাতে একজন দেওয়ান যখন তাঁর কন্যারত্নকে গছাতে পেরেছেন সেখানে আপনি তো লোভ-

নীয় পাত্র।' বলে আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল একবার।

রেবা ফুঁসে উঠল—'আহা, তুমি মোটেই বেকার নও। দূরে বদলি করে দিয়েছে বলে ছুটি নিয়ে বসে আছ।'

'ঐ একই কথা'—জয়ন্তর জবাব।

আগন্তুক এবার মধ্যস্থের ভূমিকায় নামল, বলল—'আপনাদের দাম্পত্য কলহ একটু থামান।'

জয়ন্ত নিরুপায়ের ভঙ্গি করে বলল—'তা কি করব? ঘরে একজন ভদ্র-মহিলা আছেন, আপনি তার সঙ্গে একটা কথাও বলছেন না, এটা রীতিমত অভদ্রতার পর্য্যায়ে পড়ে।'

আগন্তুক প্রশ্ন তুলল—'কি কথা বলব?'

জয়ন্ত চটপট বলল—'কেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন আজ কি দিয়ে ভাত খেয়েছেন কিম্বা আকাশে শুক্লা দশমীর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন?'

ঘর সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল—জয়ন্ত বেশ রসিকতা করতে পারে। আগন্তুক হঠাৎ শবুর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল—

'কলেজে পড়েন শুনলাম, কোন ইয়ার?'

শবু এতক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছিল, ঘরের সব কথাও কানে আসছিল। হঠাৎ প্রশ্নে ঘরের ভিতরটায় চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করে জবাব দিল—

'সেকেণ্ড ইয়ার।'

আবার প্রশ্ন—'আর্টস না সায়েন্স? কম্বিনেশন কি কি?'

'আর্টস—হিষ্ট্রি ইকনমিকস স্যান্স্ক্রিট।'

'ম্যাথমেটিকস্ নেন নি কেন?' আগন্তুক যেন জেরা করছে।

শবু পাল্টা জবাব দিল—'সবাই কি সব জিনিষ পারে?'

আবার সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল—শবু একটা জুৎসই জবাব দিয়েছে প্রশ্নের আকারে। রেবা ওর উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলল—

'এই ত তুমি বেশ কথা বলতে পার। এবারে তুমি নিজে থেকে কিছু বল।'

'কি বলবো?'

জয়ন্ত যোগান দিল—'অনেক কিছুই বলা যায়, চালের মণ কত করে, মাছের বাজার দর কি? তবে প্রশ্ন করার সময় সাবধান' বলে একবার স্ত্রী একবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—'মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের রোজগারের কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না।'

রেবা সঙ্গে সঙ্গে বলল—'তা আমি তোমার চেয়ে ছোটই আছি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই' বলে জয়ন্ত এমন একটা মুখভঙ্গি করল যেন সে একটা মিথ্যাকে বাধ্য হয়ে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

আবার একটা হাসির ঢেউ উঠল, এবারে বরুণও সে হাসিতে যোগ দিল। পাশের ঘর থেকে প্রীতি দেবী ডাকলেন—

'জয়ন্ত তোরা এ ঘরে আয়, চা জল খাবার দেওয়া হয়েছে।'

চা পর্ব শেষ হলে শবু পূবের বারান্দার রেলিংএ দু কনুইয়ে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, পিঠে দুলছে রেবা কাকীমার গাঁথা সাতগুছির মোটা লম্বা বিনুনী। পরনের হাল্কা আকাশি রং-এর শাড়ীটা সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে। জয়ন্ত কাকা ঠিকই বলেছিল—নবমী না দশমীর চাঁদ আকাশের অনেকটা উপরে নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। যদিও শ্রাবণ মাস, তবু আকাশ আজ অনেকটা পরিষ্কার। রূপালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তার জানতে ইচ্ছে করে কি আছে আজ চাঁদের মনে। সূর্য্য ত দেবতা, চাঁদও কি দেবতা? শ্রাবণ মাস শবুর জন্ম মাস—হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগে—সামনের বছর শ্রাবণ মাসে সে কোথায় থাকবে?

প্রীতি লজের এই দোতলা বাড়ীটা সমুদ্রের অনেক কাছে, দোতলার বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। চাঁদের আলো পড়ে সমুদ্রের জল চিকচিক করছে। শুনতে পেল জয়ন্তকাকা বলছে—

'দাঁড়ান, আমিও বের হব এদের এগিয়ে দিয়ে আসতে।'

আগন্তুকটি 'আচ্ছা' বলে শবুর পাশ দিয়ে হেঁটে বারান্দার দুটো থাম পার হয়ে পূব দক্ষিণের কোণের রেলিংএ ভর দিয়ে সমুদ্র দেখতে লাগল—তার পাশ দিয়েই নীচে নামার সিঁড়ি। সমুদ্রের হাওয়ায় কাপড় ঠিক থাকে না, শবু শাড়ীর আঁচল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কানাই এসে শবুর হাত ধরল।

মা তপুকে কোলে নিয়ে জয়ন্তকাকার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, পিছনে বরুণও আসছে। রেবা মেয়েকে কোলে করে এগিয়ে দিতে এল। নীচে নেমে বরুণ আর আগন্তুকটি সাইকেল নিয়ে সবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলল। আগে আগে চলেছে জয়ন্ত কাকা ও বরুণ, মাঝখানে মা আর আগন্তুক লোকটি, তপু এখন শবুর কোলে—কানাইকে পাশে নিয়ে শবু চলেছে সকলের পিছনে।

শবু ভাবতে ভাবতে পথ চলছে, মাঝে মাঝে সামনের সারির কথাবার্ত্তা

কানে আসছে। আগন্তুক লোকটির সাইকেল নিয়ে হাঁটা দেখে প্রথমেই তার মনে পড়ে যায়, এ ত সেই ভুবনেশ্বরে দেখা লোকটি—এতক্ষণ লোক-জনের মাঝখানে ভাল করে তাকাতে পারে নি। তাহলে ত নির্ঘাত সেই জাহানারা—হেমুকাকাদের সেই সাজাহান নাটকের। আশ্চর্য্য ত! কানাইটা এত ছোট যে একবছর আগের কথা তার নিশ্চয়ই মনে নাই। নাটক দেখতে গিয়ে হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছিল। তাছাড়া কানাইটা যত দুরন্ত বুদ্ধিশুদ্ধি ততটা নেই। আজ প্রীতি-লজে তারা কি ব্যাপারে এসেছিল তা-ই হয়ত বুঝতে পারে নি। এখন মাকে জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না—সঙ্গে কেউ না থাকলেও শবু মাকে জিজ্ঞেস করতে পারত কিনা সন্দেহ।

মাঝে মাঝে দু একটা কথা কানে আসছে—'রাজশাহী' 'কলম গ্রাম' 'চলন বিল' 'কলকাতা' 'সরকারী চাকরি'। কানাইটা পাশে চলতে চলতে সমানে বকবক করে চলেছে শবুর কোলে তপুর সঙ্গে। রাত হয়ে গেছে আর এ দিকটা একটু নির্জন তাই কানাই চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, খুব বীর পুরুষ ত, দিনের বেলা হলে সে চলে একমাইল আগে আগে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে। শবুর মনে মনে হাসি পায়—আচ্ছা, ছেলেরা অত ঢিল ছোড়ে কেন—ঐ লোক-টাও নিশ্চয়ই ছোটবেলায় খুব ঢিল ছুড়ত।

লোকটার বয়স কত হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশতি-বর্ষ? মাথায় ত দেখা যাচ্ছে অনেক চুল—দশ আনা ছ আনা করে ছাঁটা, রংটা কালোই। ফুল প্যান্টের সঙ্গে লম্বা ডোরা কাটা ফুল-হাতা-শার্ট প্যান্টের নীচে গুঁজে পড়েছে, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল। পথে চলতে শবু কখনো কোন লোককে এমন খুঁটিয়ে দেখেনি, কারো দিকে সে তাকায়ই না, মাটির দিকে চোখ রেখে চলে। কিন্তু আজ তার দৃষ্টি বারবার এক জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে। দোহারা চেহারা, বেশ লম্বা আছে। জয়ন্তকাকা বেশ লম্বা চওড়া মাথায় তার সমানই মনে হচ্ছে। রেবা কাকীমা খুব বেঁটে জয়ন্তকাকার পাশে বেমানান লাগে। চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। বাড়ীর সামনে এসে বরুণ আর সরকারী বাবুটি বিদায় নিয়ে সাইকেলে চড়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। জয়ন্তকাকাও সবাইকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল।

ঠাকুমা মার কাছে সব শুনে বললেন—'কি নাম বললে বৌমা, প্রাণনাথ না দয়ানাথ?'

'প্রাণনাথ নয়, দীননাথ' মা সংশোধন করে দিলেন।

'এ কালের ছেলেদের ঐ রকম দীননাথ প্রাণনাথ নাম হয় নাকি ? বাপ ঠাকুর্দার নামও নিশ্চয়ই ভোলানাথ ভূতনাথ হবে।' ঠাকুমা রঙ্গ করলেন।

মা বললেন—'ওরা ত গ্রামের মানুষ, চলন বিলের কাছে গ্রাম। তাই নামের ঐ ধারা।'

'তা বাপ ঠাকুর্দার দেওয়া নাম পাল্টাবে কি করে ?' বলে ঠাকুমা একগাল হাসলেন।

এতক্ষণ যে কথাটা শবুর মনের ভিতর তোলপাড় করছিল মা এবারে সেই কথাটিই বলে ফেললেন। শাশুড়ীকে বললেন—

'বুঝলেন মা, হোটেলের যে ছেলেটি গতবার জাহানারার পার্ট করেছিল এ সেই ছেলেটি। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, লজ্জা করল।'

ঠাকুমা বললেন—'তাই নাকি ? এও যে দেখি অবিনাশের মত রং মেখে পরচুলো পরে মেয়ে সাজে।'

বড়কাকীমা ধনাদেবী বলে উঠলেন—'লম্বায় শবুর সঙ্গে মানাবে, তবে একটু রোগা, আমার ভাইয়ের মত স্বাস্থ্য নয়।' তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে।

মিতু হাততালি দিয়ে নেচে উঠল—'ভারি মজা হবে, জাহানারা জাহানারা বলে ক্ষেপান যাবে। আমার সঙ্গে ত পার্ট করেছে।'

মা বললেন—'চুপ। ছেলে মেয়ে একই শহরে থাকে, বিয়ের কথা হচ্ছে, বাইরে জানাজানি হলে লোকে নানা কথা বলবে। বিয়ে ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ কাউকে কিছু বলবে না।'

সবার মুখে কুলুপ পড়ে গেল।

চার

নতুন বাড়ীর কাজ কিছুদিন হল শুরু হয়েছে। ঠিক হয়েছে প্রথমে নীচে দুখানা ঘর রান্নাঘর বাথরুম তৈরী করে সেখানে ঠাকুমা বড়কাকা কাকীমা শঙ্খকে নিয়ে গিয়ে উঠবেন। এ বাসা থেকে একটু দূরে হয় বলে ওখানেই আর একপ্রস্থ রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা হবে, পুরো বাড়ীটা হয়ে গেলে তখন সেখানে আবার এক হাঁড়ি হবে।

বড়কাকা উঠে পড়ে লেগেছেন শরীর দিয়ে, দু বাড়ী নিয়ে বারবার রাস্তার এপার ওপার করতে ভাল লাগে না আর। শখটাও বড় হয়েছে কখন গাড়ী চাপা পড়ে ঠিক নেই।

কোম্পানীর কাগজ ও জমি বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া গেছে—কিন্তু সে আর কতটুকু? গ্রামের জমির দাম দিয়ে কি শহরের বাড়ী হয়? জলের মত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে গিরিনবাবুর। সবে তিনি এক মেয়ের বিয়ের দেনা-মুক্ত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী তৈরীর খরচ ঘাড়ে চেপেছে। হেম আর অবিনাশ ত বাঁধা মাইনের চাকরি করে, যার যার সংসার পোষ্যও আছে। গিরিনবাবুর ইঞ্জেকশন এখন ভাল চলছে। লোকের উপকার হচ্ছে তাঁরও আয় বাড়ছে। বাড়লে কি হবে, বাড়তি সব আয়ই বাড়ীর পিছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে মেয়ের মা শবুর বিয়ে বিয়ে করে উতলা হয়ে পড়েছে। তাদের কালে তের চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে বলে একালেও মেয়ের বয়স ষোল পেরিয়েছে কি আর রক্ষে নেই। মা-বৌ এর এক রা—মেয়ে বড় হয়ে গেছে বিয়ে দাও। একটা মানুষ কদিক সামলাবে?

হেমবাবু দেখে শুনে একদিন পদ্মিনী দেবীকে বললেন—

'বৌদি, আপনি মেয়ের বিয়ের চিন্তায় অস্থির, আমরা বাড়ী তৈরীর খরচে হিমশিম খাচ্ছি আর ওদিকে এ বাড়ীরই আর এক বৌ নতুন করে কান ফোঁড়ানর জন্য ক্ষেপে উঠেছে, আগের ফুটো দুটো নাকি বড় হয়ে গেছে গয়না পরা যাচ্ছেনা। দু কানেরই গয়না জোটাতে পারিনা, আবার চারকান!'

পদ্মিনী দেবী হেসে বললেন—'আহা পরুক, বেশীদিনত বিয়ে হয়নি, এখনই ত পারবে।'

এমন সময় দেখা গেল মেজবৌ খনাদেবী বাথরুমে স্নান সেরে বেরিয়ে কুয়োতলায় কাপড় ধুতে লেগেছেন, হেমর কথাগুলো তাঁর কানেও গেছে। খনাদেবীর গায়ে গোল গোল কাঁচ বসান বাহারের ব্লাউজ। হঠাৎ হেম তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের আয়নার সামনে মাথা নামিয়ে চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি করে বললেন—

'দাড়াও, দাড়াও—আয়নায় চুলটা একটু আঁচড়ে নি।'

রঙ্গ দেখে পদ্মিনী দেবী নির্ঝরিণী দেবী কেউ হাসি চাপতে পারেন না। খনা দেবী আগেই স্বামীর মন্তব্যের জন্য রেগে ছিলেন, এখন তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

'বুড়া বয়সে রঙ্গ করতে লজ্জা করে না ?'

হৈম বললেন—'বুড়ার বৌ-ই যদি ছুঁড়ী সাজতে পারে তবে বুড়াই বা ছাড়বে ক্যান ?'

নির্ঝরিণী দেবী হৈমকে বললেন—'চুপ কর, শুধু শুধু কেন মনে আঘাত দিস ?'

হৈম বললেন—'বলি কি আর সাধে ? আমরা এদিকে খরচের চাপে চোখে অন্ধকার দেখছি আর উনি ওদিকে গয়না পরতে ব্যস্ত।'

বিয়ের পর বছর দুই তিন হৈমবাবুর রসিকতা অনেক কমে গিয়েছিল। তবে রসবোধ ঠিকই আছে কিন্তু এখন তাতে তিক্ততার আভাস।

ইঞ্জিনীয়ার অবিনাশবাবু নতুন বাড়ীর নক্সা তৈরী করতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। প্রায় ত্রিকোনাকৃতি একখণ্ড জমি, জ্যামিতির বাক্সের স্কেলটার মত, যার ছোট বাহুটা রাস্তার সমান্তরাল। জমির কেন্দ্রস্থলে একটা পাতকুয়ো—জল ব্যবহারের অযোগ্য। সেটাকে ঝালাই করে পাড় বাঁধিয়ে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে, তাতে টিউবওয়েল লাগিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝখানে কুয়ো থাকাতে একটা আধুনিক বাড়ীর পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছে।

অবিনাশবাবু বললেন—'জমির যা আকৃতি আর টাকা পয়সার যা অভাব তাতে ভাল বাড়ীর স্বপ্ন না দেখাই ভাল। বড় জোর কয়েকটা কুঠুরি-যুক্ত একটা বাক্স তৈরী করাযেতে পারে।'

পুরোনো বাড়ীর কথা সবার মনে পড়ে। ওখানে কত বেশী জায়গা ছিল ঘরদোর কেমন খোলা মেলা আর বড় বড় ছিল। এখানে জমি কম, তার আকারও অদ্ভুত ধরনের—মাঝখানে আবার একটা কুয়ো। সবারই মনটা খুঁত খুঁত করে। ঠাকুমা বললেন—

'একজন মানুষ একার রোজগারে যে বাড়ী করেছিল তোরা তিনজনে মিলে তার ধারে কাছে যেতে পারছিস না ?'

গিরিনবাবু বললেন—'বাবার কালে আড়াইশ তিনশ টাকার মাইনেতে যা করে গেছেন, ইচ্ছে করলে দোল দুর্গোৎসবও করতে পারতেন—এখন তিন হাজার টাকায়ও কেউ তা করতে পারবে না। মনে নেই সেকালের অন্নপ্রাশনের কথা, মাত্র ছ সাত টাকায় পাঁচ গ্রামের লোক খেয়েছে। আর এই কিস্কুর বিয়েতেই আমার তিনহাজার টাকা খরচ হল, তবুত এক ভরি সোনা

তা থেকে কিনতে হয়নি।'

হেমবাবু বললেন—'সে সব কথা থাক। এখন রাস্তার দিকে একটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে মাঝখানে একটা দরজা বসান দরকার। তাতে আব্রুও হবে আর ছেলে মেয়েরা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়বে না।'

হেমবাবুর এখন সব চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল শঙ্খ। এই বুঝি শঙ্খর কিছু হল, এই বুঝি গাড়ী চাপা পড়ে। প্রথম ছেলে, ওরকম একটু হয়েই থাকে। আর এ জমিটা এমন একটা রাস্তার উপরে যে চওড়ায় কম হলেও দিনরাত লোকজন গাড়ী ঘোড়া চলার বিরাম নেই—ট্রেন থেকে যাত্রী নামছে আর এই রাস্তা দিয়েই চলছে অবিরাম জনস্রোত ধর্মশালা বা মন্দিরের দিকে—হয় গাড়ীতে নয় পায়ে হেঁটে। পুরোনো বাড়ীটা ছিল গীর্জার প্রায় পিছনে তাই পথের মূল স্রোতের ধাক্কাটা সেখানে পৌঁছত না। যাই হোক একটা ভাল প্ল্যানমত না হলেও প্রয়োজনমত বাড়ী তৈরীর কাজ মোটামুটি এগিয়ে চলেছে শবুরা ছুটির দিন মাঝে মাঝে নতুন জমিতে বাড়ী তৈরী দেখতে যায় কিন্তু কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু ইট কাঠ বালি সিমেন্ট দেখে একটু ঘুরে ফিরে খেলা করে বাসায় ফিরে আসে।

আশ্বিন মাস এসে গেছে, আর কিছু দিন বাদেই পুজো। বাড়ীতে এখন পুজোর চিন্তার চাইতে দিনরাত ইট কাঠ চুন স্বরকি আর বালি সিমেন্টের হিসেব চলছে। বাবা গিরিন বাবু সকালে উঠে ডিস্‌পেন্সারী যাবার পথে মিস্ত্রি মজুরদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যান, ফেরার সময় আবার ঘণ্টাখানেক থেকে দেখা শোনা করে আসেন, খেয়ে উঠে সামান্য বিশ্রাম নিলেন কি না নিলেন চললেন বাড়ীর কাজ দেখতে, তারপরে ডাক্তারী। বড়কাকা হেমও অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে সকাল বিকেল বাড়ীর কাজ দেখছেন। সকলের প্রচণ্ড পরিশ্রম যাচ্ছে। মালমশলা যোগান দিচ্ছেন দাদুর সেই ঠিকেদার বন্ধু রাখহরি বাবু—তাঁর ব্যবসা জোর কদমেই চলছে। দাদুর বাড়ী থেকে খুলে আনা মজবুত দরজা কয়টা নতুন বাড়ীতে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে—দাদুর স্মৃতি মনে করিয়ে দেবে।

এদিকে বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাবাড়ীতে নাটকের মহড়াও চলছে। শবুর খুব জানতে ইচ্ছে করে সেই অফিস বাবুটি এবারে কোন নাটকে নামছে, কি পার্ট করছে; কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। এ এমন একটা জায়গা যেখানে

সময়ে লজ্জায় মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলা যায় না। অভ্যাসমত মাঝে মাঝে হীরাদের বাড়ী যায়, সেও আসে—নানা কথা হয়। নাটকের কথা উঠলেই বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করতে থাকে—এই বুঝি ঐ নামটা উঠে পড়ল। নাঃ কিছুই জানা যায় না। হীরাদের বাসাটা বলতে গেলে দুর্গাবাড়ীর প্রায় লাগা তবু তার কাছে কিছু শোনা যায় না। হীরা ত কিছু জানেনা শবুর ব্যাপার। মার নিষেধে সবার মুখে কুলুপ আঁটা তাই বাইরের কোন লোকই ব্যাপারটা জানে না। বরং একদিন এক ঘটনায় শবুর হীরা বা বড়মাসীর বাড়ী যাওয়াও কমে গেল।

শবু অভ্যাসমত কলেজ থেকে ফিরে দুপুরে খাওয়া বিশ্রাম সেরে রাজা-রানীর সেবা করে চা খেতে খেতে মাকে বলল—

'মা, আমি তপু কানাই শ্রীলা মিতুদের নিয়ে একবার বড়মাসী আর হীরাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসব ?'

শবু মা বাবার অনুমতি না নিয়ে কোথাও এক পা যায় না। সঙ্গে ভাই বোনেরাও থাকে। মা বাবারও শবুর উপর অগাধ বিশ্বাস কখনো বারণ করেন না। সেদিন বোধ হয় পদ্মিনী দেবীর কোন কারণে মনটা ভাল ছিল না। হঠাৎ বললেন—

'তুমি যেন আজকাল বড় বেশী ওদিকে যাচ্ছো ?'

মুহূর্তে শবু চোখের জলে চারদিক ঝাপসা দেখে—মার কথার ইঙ্গিত বুঝতে তার মোটেই কষ্ট হয়না। ঐ অবস্থায়ই গিয়ে বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। ভাবে, সাত আটদিন পরে আজ সে ওদিকে যাবার কথা বলেছিল সেটা কি বেশী হল ? আগে বরং একদিন দু-দিন পরেই ওদিকে যেত। মা কি কিছু সন্দেহ করেছে ? মাঝে মাঝে যে সেই অফিসারবাবুটির কথা তার মনের মধ্যে উঁকি দেয় মার চোখ কি সেই মনের কথাটি ধরে ফেলেছে ? কি লজ্জা! কি লজ্জা !!

এদিকে মা-ও বুঝতে পারেন কথাটা ওভাবে বলা উচিৎ হয়নি। মনটা এমনিতেই ভাল না—দেড়মাস আগে ছেলেটার সঙ্গে কথা হল অথচ এখনও সে কিছু জানাচ্ছে না কেন ? মেয়ে কি অপছন্দ হয়েছে ? বরুণ জয়ন্তকে দিয়ে খোঁজ খবর করাতে হবে। কিন্তু তাই বলে নিজের এত আদরের নির্বিরোধী মেয়েটার প্রতি এমন কটাক্ষ করাটাও খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে। ভাবতে ভাবতে তাঁর নিজের চোখেও জল এসে পড়ল। ছুটে বিছানার পাশে গিয়ে শবুর মুখখানি তুলে ধরে চিবুকে চিবুক স্পর্শ করে আদর সোহাগ করে বললেন—

'আর বলবোনা মা, আমার ভুল হয়ে গেছে। তোকে আমার এমন কথা

কখনই বলা উচিৎ হয়নি।'

শবুর কান্না বেড়ে যায়—যে মা আদর করে তুই বলে সম্বোধন করে তার মুখে 'তুমি' বলাটাই ত প্রচ্ছন্ন ভৎর্সনার সামিল, তার উপর ইঙ্গিতটাও খুব স্পষ্ট। শবু অভিমানে মার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

মা আরো আদর করে বলতে লাগলেন—

'দেখ শবু, তাকা আমার দিকে। আমি তো মা, মেয়ের যাতে অকারণ কোন বদনাম না হয়, সেই লোকনিন্দায় ভয়ে মার মন সদা তটস্থ থাকে। তুই ত বড় হয়েছিস, আমার কথাটা বুঝে দেখ। যা, চোখ মুখ ধুয়ে ওদের নিয়ে বেড়িয়ে আয়।'

শবু চোখ মুছতে মুছতে বলল—'না, আমি যাবো না।'

মা বললেন—'অত মানগোমান ভাল না মা, যা, আমি বলছি ঘুরে আয়, মন ভাল থাকবে। অভিমান করে থাকিসনা, রাগ করিস না।' বলে কিছু-ক্ষণ আগে নিজে হাতে বেঁধে দেওয়া শবুর চুল আবার ঠিকঠাক করতে করতে সবাইকে ডাকলেন 'ওরে মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই তোরা আয়, মেজদির সঙ্গে বেড়াতে যাবি।'

মিতু অনেক আগেই বেড়াতে যাবার কথায় তৈরী হয়ে নিয়েছিল, এতক্ষণ বাদে মার ডাক পেয়ে ফোঁস করে উঠল—'মেজমেয়ের মানভাঙানো শেষ হল? আমরা ত ভাবছিলাম আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না।'

মা আর শবুর অফুরন্ত স্নেহের স্রোতে মিতুর মনে হিংসুটে ভাব দেখা দেয়। আরও কারণ আছে। মিতু এখন বড় হচ্ছে, তাই ওর একা একা কোথাও যাওয়া বারণ। মেজদি কিম্বা অন্য বড় কেউ সঙ্গে গেলে তবে যেতে দেওয়া হয়। সেইজন্য তার আরো বেশী রাগ। ব্যাপারটাত তার বোধগম্য নয়। এককালে দিদি কিন্তু শবুকে সব সময় চোখে চোখে রাখত।

মিতুর কথা শেষ হতে কানাই বলে উঠল—'মা আমাকেও আগের মত ভালবাসেনা, মেজদিকেই কেবল আদর করে।'

ওটা শিশু, অবুঝ। মা একটু হেসে কানাইকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—

'তোর এই হাতে পাঁচটা আঙুল, কোন আঙুলে চিমটি কাটলে কম ব্যথা লাগে রে?'

কানাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নন্দু ধমকের সুরে বলল—'মা কে অমন কথা কক্ষণো বলবিনা কানাই।

মা আমাদের সবাইকে সমান ভালবাসে।'

স্বভাব সরল নন্দুর দাদাগিরিতে মা শবু হেসে ফেলে। কানাইটা যত দুষ্টু তার চাইতে বেশী বোকা। একদিন কোথায় খেলতে গিয়ে পা কেটে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসেছে, মা কাটা জায়গায় ওষুধ লাগাচ্ছেন। বাবা দেখে বলে ছিলেন-ওখানে একটু নুন লাগিয়ে দাও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। বাবা ত ডাক্তার—কানাই বুঝি কথাটা মনে করে রেখেছিল। পরে আর একদিন যখন তার হাতের এক জায়গায় ছড়ে যায় তখন কাউকে না জানিয়ে নিজে নিজে খুব করে নুন লাগিয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার সে কি চিৎকার আর দাপাদাপি। এইত ওর বুদ্ধি।

পূজো এসে গেল। দিনে তিনবার করে দুর্গাবাড়ীতে যাওয়া আসা। সকালে অঞ্জলি দিতে, সন্ধ্যায় আরতি দেখে ফিরে খেয়ে দেয়ে আবার রাতে নাটকের আসরে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে মেয়েদের পালটা—পালটি করে নতুন শাড়ী পরা আর ছোটদের নতুন পোষাকের বাহার। এবারের নাটক দত্তা আর সিরাজদ্দৌলা, সপ্তমীর দিন শুধু মেয়েদের নাচগান। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক একটা থাকা চাই না হলে জমে না। সেদিনের ঘটনার পর থেকে শবু নিজের মনকে শাসনে রেখেছে, ও ব্যাপারে কোন চিন্তাকেই মনের মধ্যে উঁকি দিতে দেয় না। অবশ্য সে বাবুটিকে এর মধ্যে দেখাও যায় নি—না নাটকে না অন্য কোথাও।

লক্ষ্মী পূজোর দিন এবারে নতুন বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো হল। ঐ দিনই সকালে সবাই সে বাড়ীতে গেল, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে সত্যনারায়ণ পূজোও হল, রাতে প্রসাদ খেয়ে গিরিনবাবু সপারিবারে ভাড়া বাড়ীতে ফিরে এলেন, ঠাকুমা বড়কাকা শুদ্ধ নতুন বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। পূজোর কটা দিনের জন্য ছোটকাকা কাকীমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন, লক্ষ্মীপূজোর পরদিন তাঁরাও ভুবনেশ্বর ফিরে গেলেন, শ্রীলা এখানেই রয়ে গেল।

ভাড়া বাড়ীটা অনেক ফাঁকা হয়ে গেল। মানুষ গেল মোটে একজন, ঠাকুমা। বড়কাকারা ত রাস্তার ওপারের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন, সেটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বেশ কিছু মালপত্র নতুন বাড়ীতে গেল। সেখানে দুখানা মাত্র শোবার ঘর, বারান্দায় রান্না খাওয়া। তারই মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে একটা সংসার পাতা হয়েছে। রান্নাঘর তৈরীতে হাত পড়েছে সবে।

পাঁচ

কয়েকদিন পরে বরুণ এসে পদ্মিনী দেবীকে খবর দিল ছেলেটি নাকি বলেছে আর একবার দেখাশোনা কথাবার্তা না বলে সে মনস্থির করতে পারছে না।

তবে কি মেয়ে অপছন্দ হয়েছে ?

না তা নয়, বরং আশাতিরিক্ত পছন্দের। তবে সেদিন হঠাৎ ঐ পরিবেশে গিয়ে পড়েছিল বলে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কবে কখন কোথায় আবার কথা বার্তা বলা যায় জানালে ছেলেটি বরুণের সঙ্গে চলে আসবে।

পদ্মিনী দেবী ভাবলেন, প্রীতিলজ একটু দূরে পড়ে, তা ছাড়া একই ব্যাপারে এক জায়গায় বারবার যাওয়া ভাল দেখায় না। এই ভাড়া বাড়ীটা বড় ভাঙা চোরা এখানে দুজন লোককে আসতে বলতেও সঙ্কোচ লাগে। নতুন বাড়ীতে এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারেনি, জায়গাও কম। মাঝামাঝি আছে দিদি অর্থাৎ শবুদের বড় মাসীর ভাড়া বাড়ী—সেখানেই ভাল।

বরুণকে দিদির বাসার একটা আন্দাজ দিয়ে জানালেন শাশুড়ী ও কর্তার সঙ্গে আলোচনা করে দিনক্ষণ কালই জানিয়ে দেবেন, বরুণ যেন কষ্ট করে কাল এসে জেনে যায়। বরুণ চা জলখাবার খেয়ে আবার কাল আসবে বলে চলে গেল।

সামনের রবিবারে বিকেলে দিদির বাড়ীতে যাওয়া ঠিক করলেন পদ্মিনীদেবী স্বামী ও শাশুড়ীর মত নিয়ে—দিদিকেও খবর জানিয়ে রাখলেন। রবিবার বিকেলে যাবার প্রস্তুতি চলেছে, ও বাড়ী থেকে নির্ঝরিণী দেবী এসে গেছেন এ বাড়ীতে, থাকবেন সবাই ফিরে না আসা পর্যন্ত। গিরিনবাবু ডিসপেন্সারী যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন—তাঁর এ ব্যাপারে করার কিছু নেই, যা করার মেয়ের মা-ই করুক। এ সব ছেলে ছোকরাদের মধ্যে তিনি থাকতে চান না।

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তোমার মেয়ের বিয়ে—তোমারই ত থাকা দরকার। আমি মেয়ে মানুষ। তাছাড়া তোমার সে ছেলেটিকে দেখা দরকার। তাই না মা ?' বলে শাশুড়ীকে মধ্যস্থ মানলেন।

নির্ঝরিণী দেবী চোখ দুটো পিটপিট করে সম্মতি জানালেন।

গিরিনবাবু হেসে বললেন—

'আমার দেখা হয়ে গেছে। সেই যে গত বছর জাহানারার পার্ট করেছিল বলেছিলে না? এবার পুজোয় সিরাজদ্দৌলা নাটকের সন্ধ্যায় আমি স্টেজের দেখাশোনা করছিলাম, হেমু নীলুরা মেক আপ নিচ্ছিল। সে সময় একটি ছোকরা এসে হেমুদের সঙ্গে নাটকের বিষয় নিয়ে গল্প করতে লাগল। হেমু বলল—এই যে জাহানারা, এবারে পার্ট নিলেন না, সিরাজের বেগম লুৎফান্নেসার পার্ট আমরা আপনার জন্য ভেবে রেখেছিলাম। ছেলেটি বলল, মেয়েদের পার্ট করে বদনাম হয়ে গেছে, হোটেল পাড়ার ছেলেরা পর্য্যন্ত আমার নাম পাল্টে জাহানারা রেখেছে। মেয়ের পার্ট আর করব না। বলতে বলতে আমার সামনেই ফস্ করে সিগারেট ধরাল।'

পদ্মিনী দেবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—'আহা, সেকি তোমাকে চেনে নাকি?'

গিরিনবাবু বললেন—'না, তা নয়। তোমরাই যাও, কথা বার্ত্তা বল তা হলেই হবে। আমি ত আছিই।' গিরিনবাবু ডাক্তারখানায় চলে গেলেন।

অগত্যা পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীকে বাড়ীতে রেখে ঠাকুরকে রাতের রান্নার ভার বুঝিয়ে দিয়ে শবু মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই তপুকে সঙ্গে করে দুখানা রিক্সায় চেপে দিদির বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ঠাকুমা যাত্রার শুভ কামনায় 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করলেন—ওরা ফিরে এলে সব শুনে তিনি নতুন বাড়ীতে যাবেন। সূর্য্য অস্ত যেতে আর বেশী দেরী নেই, দিন ছোট হয়ে আসছে।

এবার শবু সব জেনে শুনেই যাচ্ছে। ওর কিন্তু আর ভয় করছে না, বুক দুরু দুরুও করছে না। লোকটাকে ত একবার দেখেছে, এমন কিছু বাঘ ভালুক নয়। যদি আবার কিছু প্রশ্ন করে? কি প্রশ্ন করবে? যাই করুক, তার যা জানা আছে তাই বলবে। তা নিয়ে অত ভাবার কি আছে? আর যা কথা হবে সকলের সামনেই হবে, তবে ঘাবড়াবে কেন? সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ সে ভালই জানে—সেলাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করে কিছু-লাভ হবেনা, ছেলেরা সেলাই কি বোঝে? রান্নার কথা হলে অবশ্য একটু অসুবিধে আছে, নিজে হাতে ত কখনও রান্না করেনি। রান্নার ঠাকুরই সে কাজ করে, ঠাকুমা মা কাকীমারাও করে। তবু মার শেখান মত কিছু কিছু ফোড়ন মশলার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করে। আর যদি গান বাজনার কথা বলে তবেই মুস্কিল—বড়মার স্কুলে গানের পরীক্ষার স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে হাসি পায়। এক লাইন না গাইতেই তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। কি বোকাই

ছিল তখন—এখনই কি কিছু চালাক হয়েছে? যদি জিজ্ঞেস করে, বলে দিলেই হবে—গান শিখিনি। সবাই কি সব জিনিষ পারে? মাথায় ভাবনার পাহাড় নিয়ে বড়মাসীর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

বড় মাসীর বাড়ী গিয়ে শবুর মন অনেক হাল্কা লাগতে লাগল। মাসতুতো ভাইরা ছসাত জন আর ওরাও পাঁচ ছজন, তার উপরে দুই মা মাসী ত আছেই। নানা কথাবার্ত্তা ছোটদের হুটোপুটি চেঁচামেচিতে শবুর চিন্তার বোঝা যেন মাথা থেকে নেমে গেল। মাসী তাঁর মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর জাঁকজমকের গল্প করছেন—দেওয়ানের বাড়ী, লোক লস্কর দাস দাসী। খাওয়া দাওয়ার কি অঢেল বন্দোবস্ত। আর শাড়ী গয়নার ত অন্ত নাই। মেয়ের যেন রাজবাড়ীতেই বিয়ে হয়েছে, দেওয়ানের আবাসও রাজপ্রাসাদের মত বিশাল।

শুভেন্দুদা একবার ঠাট্টা করে বলল—'শবু, এই সময় বোম্বাই থেকে নাক এসে গেলে তোকে সহজেই পছন্দ করত।'

এই নাকের কথায় শবু আগে কেঁদে ফেলত, এখন আর কাঁদে না, রাগেও না। ওর নাকটা একটু চাপা, তাই কবে কার কাছে যেন শুনে বলেছিল, বোম্বাইতে নাকি নাক অপারেশন করে পছন্দ মত উঁচু নাক বসাতে পারে—সেই থেকে শুভেন্দুদা রোজই বোম্বাইতে শবুর নাকের অর্ডার পাঠাত। শেষে ঠাকুমা একদিন বলেছিলেন--বোকার মত কাঁদিস কেন, বোঁচা নাক সোহাগের টেপারী—নাক-বোঁচা মেয়েদের স্বামীরা বেশী সোহাগ করে। সেই থেকে শবু আর নাকের কথায় কাঁদে না।

বরুণ আর তার অফিসবাবু এসে গেল। তাদেরকে বাইরের শোবার ঘরে দুটো চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছে। কিছু কথাবার্ত্তার পর শুভেন্দুদা ভিতরের ঘরে এসে ডাকল—

'শবু আয় আমার সঙ্গে ওঘরে।'

শবু মার মুখের দিকে তাকাল। মা বললেন—

'চল, ভয় কি? আমরাও দরজার পাশেই আছি।'

শুভেন্দুদার সঙ্গে শবু বাইরের ঘরে এসে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সব ভাইবোনেরা চৌকির উপরে শবুর পিছনে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে বসে আগন্তুককে মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। শবুকে একটা জরির পাড়ওয়ালা হাল্কা চাঁপা রংয়ের শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে, দুধের মত ফর্সা পা দুটিতে আলতা

পরানো হয়েছে। তার ঠোঁট দুটোও যেন আলতায় রাঙানো, সারামুখে রক্তিমাভা। দু হাতের চাঁপার কলির মত সুন্দর আঙুলগুলো নিজের কোলের উপর রেখে আপন মনে খেলা করছে। স্বভাব-ভীরু শবু আশ-পাশের ভাইবোন ও আড়ালে মা মাসীর উপস্থিতিতে মনে জোর আনার চেষ্টা করছে। মুখে নেই প্রসাধন—কানে গলায় হাতে সামান্য কিছু অলংকার, যে টুকু না হলে নয় তাই। লম্বা বিনুনীটা পিছনে পিঠের উপরে ঝুলছে।

ছেলেটা যেন লাজুক ভাবে দু একবার শবুর দিকে চাইল, শবুর দৃষ্টি নিজের হাতের আঙুলের উপর নিবদ্ধ।

শুভেন্দু বলল—'কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'না, তেমন কিছু নয়' বলে ছেলেটি একটু ইতস্তত করে শবুর উদ্দেশ্যে বলল—'আচ্ছা, সেদিন যে বললেন আপনার ইকনমিক্স কম্বিনেশন, আমি ত জানি ওটা ডিগ্রী কোর্সে পড়ায়। আমরা তাই পড়েছি।'

এখানে আমাদের ইকনমিক্সই পড়ায়' শবু জবাব দিল। আবার মনে মনে শঙ্কিত হল, এবার বুঝি ইকনমিক্সেরই পরীক্ষা শুরু হয়—ডিম্যাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই আর সব কত কি, বইয়ের পড়া সব কি মনে থাকে?

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল—

'গল্পের বইটই কেমন পড়েন?'

'ভালই পড়ি।' শবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'কার লেখা আপনার ভাল লাগে?' আবার প্রশ্ন।

'ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের লেখা' শবু বলল। কিছুদিন আগেই 'চিতা বহ্নিমান' নামে এক উপন্যাস সে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে শেষ করেছিল তার কথাই সবার আগে মনে পড়ে। সদ্য পড়া উপন্যাসের নায়িকা তপতীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা সে ভুলতে পারে না। উত্তরটা বোধ হয় ঠিক পছন্দসই হয়নি, —আরো কত বড় বড় লেখক আছেন।

'আর কার কার লেখা পড়েছেন?' ছেলেটি জানতে চাইল।

এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে শবু বলল—

'শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও কিছু কিছু পড়েছি।'

ছেলেটি এবারে যেন খুশি হল, বলল—

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

শবু তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে পালিয়ে বাঁচে—ভাগ্যি রান্না আর গানের কথা ওঠেনি, তাহলেই নির্ঘাত ফেল।

ভিতরের বারান্দায় আসন পেতে বড় মাসী বরুণ আর তার অফিসবাবুকে জলখাবার খেতে বসিয়ে তাদের সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। শবু—ভিতরের ঘরে বসে বসে সব শুনতে পাচ্ছে। ছোট ভাইবোনেরা দল বেঁধে ওদের খাওয়া দেখছে। মা-ও খাওয়ার সামনে উপস্থিত।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন—'বাবা তোমার নাম কি ?'

'দীননাথ লাহিড়ী।'

'বাড়ী কোথায় ?'

'চলন বিলের কাছে কলম গ্রাম।'

'বাবার নাম ?'

'শ্রী কালীনাথ লাহিড়ী।'

'ঠাকর্দার নাম ?'

'৺ হরিনাথ লাহিড়ী।'

'তোমার বাবা কি উকিল ? নাটোরে ওকালতি করতেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন ?'

বড়মাসী জানালেন—'আমাদের জমিদারীর ব্যাপারে ওখানে অনেক মামলা মোকদ্দমা হত ত—নাম শুনেছি। তাছাড়া ওনারও বিয়ে হয়েছিল নাটোরের রাজার দেওয়ানের মেয়ের সঙ্গে। বরযাত্রীদের কথামত পাল্কি থেকে নামার পর বরকে বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পথে সন্দেশ পেতে তার উপর নতুন চাদর বিছিয়ে। ওদিককার প্রাচীন লোকেরা এখনও সে কথা বলাবলি করে।'

দীননাথ নামের লোকটি বলল—'সে সব এখন অতীতের গল্প—এখন আমরা সবাই রিফিউজী।'

মাসী—'সেত বাবা আমরা সকলেই রিফউজী। দেখছ তো আমাদের চাল। তা দীননাথ, তোমার কে কে আছেন ?'

'বাবা মা দুই দাদা এক দিদি আর কয়েকটা ছোট ভাইবোন—সবাই কলকাতায় থাকে শুধু বড়দা বৌদি দুই মেয়েকে নিয়ে কটকে আছে চাকরির জায়গায়।' লোকটি জানাল।

'দুই দাদারই বিয়ে হয়েছে ?'

'মেজদার বিয়ে হয়নি। দিদি ও একবোনের বিয়ে হয়েছে।'

এবারে পদ্মিনী দেবী কথা বললেন—'আচ্ছা, তোমার বাবা কি গত বছর এখানে এসেছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে ?'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'ওনার ডাক্তারখানায় এক লাহিড়ী বাবু আসতেন ওষুধ নিতে। তখনই উনি তাঁকে এই বিয়ের কথা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মেজো ছেলের বিয়ে হয়নি বলে তিনি অগ্রসর হননি। তোমরাও লাহিড়ী কিনা, তাইতেই মনে পড়ল কথাটা।'

দীননাথ বলল—'বাবা আমাকে এসব কথা কিছুই বলেন নি। যাক, ব্যাপারটা তাহলে অনেক সহজ হয়ে গেল, না হলে হঠাৎ করে কি ভাবে লিখে জানাব ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

এই সময় পাশ থেকে মিতু বলে উঠল—'আপনি ত গত বছর জাহানারা সেজেছিলেন।'

দীননাথ মিতুর দিকে একটু তাকিয়ে হেসে বলল—'তুমি ত সিপার সেজেছিলে, তাই না ? তুমি কে ?'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'ও আমার সেজ মেয়ে—মিতালী।'

খেতে খেতে দীননাথ দুটো মিষ্টি মিতুর হাতে জোর করে গুঁজে দিল। চা এসে গেল, ভিতরের ঘরে শবুকেও এক কাপ চা দিয়ে গেল।

দীননাথ বলল—'চা আমি বিশেষ খাইনা, মাঝে মাঝে খাই।'

'আমার মেয়ের কিন্তু দুবেলা চা খাওয়া অভ্যাস'—পদ্মিনী দেবী বললেন।

বড়মাসী জিজ্ঞেস করলেন—'তা বাবা, আমাদের মেয়ে তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। চালচুলো নেই, আমাকেই কেউ পছন্দ করবে কিনা সন্দেহ।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'নেই, হতে কতক্ষণ ?'

চা পর্ব শেষ করে মা বড়মাসী শুভেন্দু দীননাথ ও বরুণকে নিয়ে আবার বাইরের শোবার ঘরে বসল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে তারা দুজন বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মাসী ভিতরের ঘরে এসে হেসে শবুকে বললেন—'সব ঠিক হয়ে গেল লো, এখন শুধু একটা শুভ দিন দেখে সাতপাক ঘোরানো বাকি।'

শবু লজ্জায় রাঙা হয়ে চোখ নীচু করল।

মা বললেন—'চল, অনেক রাত হয়ে গেছে, তাঁর ফেরার সময় হয়ে গেল।'

মাসী বললেন—'বেশ চালাক চতুর লেখাপড়া জানা, ভাল বংশের ছেলেটি —ভাল চাকরিও করে। আগে জানলে আমার বেবীর সঙ্গে ওর বিয়ের চেষ্টা

করতাম। আমার জামাইটাত কেবল ম্যাট্রিক পাশ, বেকার—সব বাপের উপর নির্ভর।'

মা ঠাট্টা করে বললেন—'তা হলেও দেওয়ানের বড় ছেলে—আর এ হল এক মৃত দেওয়ানের দৌহিত্র।' মা মাসী দুজনেই হেসে উঠলেন।

বাড়ীতে ঠাকুমা উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন, বাবাও এই মাত্র ডাক্তারখানা থেকে ফিরেছেন। পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীকে মধ্যস্থ রেখে দুজনকে বললেন—

'মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এখন ঠাকুর মশাইকে দিয়ে একটা শুভদিন স্থির করে জানালে দীননাথ সেইমত তার তরফের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'দীননাথ কে?' বাবা জানতে চাইলেন।

মা বললেন—'ঐ ত ছেলের নাম—দীননাথ লাহিড়ী—দীনু। বাবার নাম কালীনাথ লাহিড়ী—সেই যার কাছে তুমি গত বছর শবুর বিয়ের কথা তুলেছিলে এ তাঁরই ছেলে।'

ঠাকুমা বললেন—'যার যেখানে লেখা আছে তা হবেই।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'ওর উপরের ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে?'

'না, হয়নি এখনও। বলেছে, সবার মত নিয়ে সে এ কাজ করবে।' মা জানালেন।

ঠাকুমা বললেন—'তা আমারও ত মেজো ছেলের আগে ছোট ছেলের বিয়ে হল। এমন ত হয়ই।'

মা বলতে লাগলেন—'জানেন মা, কটকে ওর বড় দাদা-বৌদি আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মারফৎ সব ব্যবস্থা করবে। আমি বলেছি, মেয়ের বিয়ে বলে কথা—আমরা ত অনিশ্চিতের উপর ভরসা করে বসে থাকতে পারি না। সামনের কার্ত্তিক মাস বাদ দিয়ে অঘ্রানে দিন দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, হাতে মাস দেড়েক সময় পাওয়া যাবে। ছেলেও তাতে রাজী।'

ঠাকুমা জানতে চাইলেন—'আর খরচ পত্তর?

মা বললেন—'সেদিক থেকে ছেলেটি খুব ভাল—ঠিক আমাদের সুশীলের মত। বলে, আমাদের কিছু নেই, আপনাদের কাছে চাইবো কোন মুখে। কিছুদিন আগে নাকি তার মেজোবোনের বিয়েতে গয়না যোগাড় করতে পারেনি বলে বরের বাপ বিয়ের আসর থেকে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, শেষে বড়ভাই দশভরি সোনার গহনা দেবে বলে দলিলে সই করে ঝামেলা

মেটায়—সে গহনা এখনও শোধ হয়নি। আমি বললাম, তোমাদের কি চাই না চাই জানলে তবে তো আমাদের সাধ্যে কুলোবে কি না বুঝবো। বলেছে —মেয়ে পছন্দ হয়েছে আর কিছু চাইনা। হাতঘড়ি সাইকেল ফার্নিচার আংটি বোতাম কিছুই না। আমি বলেছি, আমার বড় জামাইকে আংটি বোতাম দিয়েছি, তোমাকেও দেব—এসব হল বিয়ের অঙ্গ। সব মিলিয়ে সাত আট-ভরি সোনা। আর বরপণ না দিলে নিয়ম রক্ষা হয় না—সে বাবদ ২০১, টাকা দেব, বড়জামাইকেও তাই দিয়েছি। বলেছে গয়না মেয়েদের ব্যাপার। বিয়েতে কিছু খরচ অবশ্য হবে, দেড়শর কিছু বেশী মাইনে পাই, প্রভিডেণ্ড, ফাণ্ডে সামান্য কিছু ছাড়া আর কোন জমা টাকা নেই—তাই ধার দেনা কিছু হবেই। আপনি টাকা দিলে মাথা পেতে নেব—তাতে ঋণের বোঝা একটু হাল্কা হবে। না দিলেও কিছু বলব না।'

ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন—'এই ত আজকালকার ছেলের মত কথা. মানুষের মত কথা। দুদিন বাদে যেখানে মধুর সম্পর্ক হবে সেখানে কি দর-দস্তুর করা উচিৎ?' এমন সময় হৈমকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখে বললেন—'এই ত অবিনাশ হৈমর বিয়েতে আমরা চাপ দিয়ে কিছু আদায় করিনি, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, যা দিতে পেরেছে তাই দিয়েছে।'

বড়কাকা একবার পদ্মিনী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

'কিন্তু দাদার বিয়েতে কিছু কম নাও নি।'

ঠাকুমা বললেন—'সে বৌমার দাদারা জমিদার, নিজে থেকেই দিয়েছে, দেবার সাধ্য ছিল—আমরা কিছু চেয়ে নিই নি। আর তখন দিনকালও ছিল অন্যরকম।'

বড়কাকা শবুর বিয়ের কথা পাকা হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর মাকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে চলে গেলেন।

পদ্মিনী দেবী এবার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন—

'কেমন মনে হচ্ছে? তোমার মত আছে ত?'

গিরিনবাবু পরিহাস করে বললেন—'মেয়ের মায়ের যখন পছন্দ তখন বাপেরও পছন্দ।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'জানো, শবুকে সে গান বাজনা রান্না বান্নার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করেনি, শুধু পড়াশুনার কথা জানতে চেয়েছে। আমার ধলীর ত কেবল ধলাগুণ আছে, কি দেখে ওকে পছন্দ করল?'

গিরিনবাবু মেয়ে-গর্বে স্ফীত হয়ে বললেন—'কেন, মেয়েকি আমার যেমন

তেমন ? যে দেখবে সেই পছন্দ করবে। ছেলেটার বোধ হয় বিষয়বুদ্ধির অভাব আছে। কিন্তু অত যে সোনা-গয়নায় ফিরিস্তি দিলে, সোনার ভরি কত করে, জানো ?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কাল আমার পুঁজিপাটা বের করে দেখি তার পরে বলব। তুমি শুধু অন্য খরচগুলো চালিয়ে দিও।' বলে পদ্মিনী দেবী মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

গিরিনবাবু হেসে বললেন—'দেড় বছরে খুব পকেট মেরেছ দেখছি।'

'মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা ?' পদ্মিনী দেবীও হেসে জবাব দিলেন।

অতি আদরের মেয়ে শবুর মোটামুটি এক সুপাত্রে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বাবা মা দুজনেই বেশ খুশি।

ছয়

শবুও কি খুশি ?

খেয়ে দেয়ে শুতে রাত একটু বেশীই হল। সে রাতে শবুর চোখে সহজে ঘুম আসে না। কাল পর্য্যন্তও যখনই শুয়েছে ঘুমিয়ে পড়েছে. আজ কিন্তু ঘুম আসছে না। সে-ও কি মা বাবার মত খুশি হবে ? বয়স কালে বিয়ে ঠিক হলে সব মেয়ের মত তারও খুশি হবার কথা। ঘুরে ফিরে কত কথা মনে জাগছে।

ও ঘরে বাবা মা তপুকে নিয়ে শুয়েছেন—এখনও তাঁরা ঘুমোন নি, মাঝে মাঝে কথা শোনা যাচ্ছে। অবশ্য মা বাবা অনেক রাত অবধি গল্প করে থাকেন বরাবরই।

এ ঘরে ঢালাও বিছানায় একপাশে মিতু শ্রীলা আর এক পাশে কানাই নন্দু—মাঝখানে শবু। সে যে সবার মেজদি তাই সকলের মাঝখানে তার ঠাঁই। সবাই তাকে খুব ভালবাসে—শবুও সকলকে প্রাণের অধিক ভালবাসে। এদের সবাইকে ছেড়ে, বাবা মার কাছ থেকে কতদূরে চলে যেতে হবে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের সঙ্গে। ভাবু চলে গেছে, দিদিও কাছে নেই। যখন তার আনন্দের কথা মনে আসা উচিৎ তখন মনে জাগছে শুধুই একটা সব হারাবার বেদনার অনুভূতি। ····

লোকটাকে ত ভালই মনে হল। কি যেন নাম—দীননাথ। ঠাকুমা ঠিকই বলেছিল, দীননাথ না প্রাণনাথ—একটা অদ্ভুত সেকেলে নাম। বাকি জীবন কি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—প্রাণনাথ, প্রাণনাথ জপ করতে হবে? ওর নিজের নামটা কি সুন্দর—শ্রাবণী—নামের সঙ্গে যেন বৃষ্টির শব্দ কানে আসে, ভেসে আসে ভাবী শরতের শিউলির সুবাস। বন্ধুরা আত্মীয় স্বজন সবাই শবুর নামের কত তারিফ করে।··

মিশনের লাইব্রেরী থেকে আরও কিছু বই আনিয়ে পড়তে হবে—নন্দু আজকাল লাইব্রেরী থেকে বইটই এনে দেয়।···

সব চাইতে বড় কথা বাবা মার দুশ্চিন্তা। কি করে বাবা মাকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করা যায়। পৃথিবীতে মা বাবাই তার সব। দাদু মারা গেলে বাবাকে কত কষ্ট কত পরিশ্রম করে সংসার চালাতে দেখেছে। দুবেলা খাবার জুটেছে ঠিকই, কিন্তু এতগুলো ভাইবোনকে মানুষ করা কি সহজ কাজ? দাদুর বাড়ীটা ছিল তাও চলে গেল। এত দিনে কত কষ্টে একটা বাড়ী হচ্ছে, কতদিনে তা শেষ হবে কে জানে। বাড়ীর পিছনে বাবার কত টাকা খরচ হচ্ছে। তার উপর মাসে মাসে বাড়ী ভাড়া গুণতে হচ্ছে। বিনা বিলাসিতায় শুধু মোটা ধুতি আর ফতুয়া পরে বাবা দিন কাটিয়েছেন। মা সব সাধ আহ্লাদ ত্যাগ করে ছেলে মেয়েদের সুখী করার চেষ্টা করেছেন, কত স্নেহে আদরে সবাইকে মানুষ করেছেন। এত অনটনের মধ্যেও বকুনি মারধোর ওদের অজানা। ভাবুর অসুখের সময় দেখেছে মা-বাবাকে রাতের পর রাত জেগে তার সেবা যত্ন চিকিৎসা করতে। সব চেষ্টাকে ফাঁকি দিয়ে ভাবু চলে গেল, মা-বাবার সে কি বুকফাটা কান্না। এমন মা-বাবার মনে দুঃখ লাগে সে রকম কোন কাজ শবু করতেই পারে না। তাই বিয়ের ব্যাপারেও তার নিজস্ব কোন মত নেই। বাবা মা বললে সে হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। কানা খোঁড়া কাউকে বিয়ে করতে বললে চোখ বুজে তাতেই সে রাজী। সে শুধু চায় বাবা মার মনের শান্তি। বাবা যেন আবার দেনার দায়ে জড়িয়ে না পড়েন। ···

ছেলের তরফ থেকে কোন দাবি-দাওয়া নেই। বাবা মার অর্ধেক দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। শ্বশুর বাড়ী কেমন হবে? শ্বশুর শাশুড়ী কেমন হবেন? ভাসুর দেওর ননদারা কে কেমন হবে?—কি দরকার এ সব প্রশ্নের? মা-বাবা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবেন এর থেকে বেশী আনন্দ সে তাঁদের কী দিতে পারে? শবুর মত অমতের কথাই ওঠে না। তাছাড়া ভাল মন্দ আগে থেকে কি করে

বিচার করা যাবে? যাচাই হবে কি করে—এটা ভাল হবে, না অন্যটা?…

এই বিয়ে কি বিধির বিধানে নির্দিষ্ট—প্রজাপতি নির্বন্ধ? ঘটনার গতি দেখে তাই যেন মনে হয়। অচেনা অবস্থায় আগে লোকটাকে এক দুবার দেখেছে। বাবা যে ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা তুলেছিলেন এক লাহিড়ী মশাইয়ের কাছে, বরুণ যে ছেলের খবর দিল—সে-ও এই। মিতু যার সঙ্গে থিয়েটার করল জাহানারারূপী সে লোকটাও এই। ঘটনাক্রমে একটি লোকই বারবার শবুর জীবনের পথে এসে পড়ছে। তাই ঠাকুমার কথাটাই মনে আসে—প্রজাপতির নির্বন্ধ।…

সবার কাছে শুনে এসেছে—সে নাকি খুব সুন্দরী, বান্ধবীরা তার রূপের প্রশংসা করে। বাড়ীর সবাই শবুর ধৈর্য্য নম্রতা ও কোমল স্বভাবের কথা বলে। আগেকার দিনে, শোনা যায়, কোন কোন গরিব রূপবতী কন্যার হঠাৎ করে রাজা বা জমিদারের ঘরে বিয়ে হয়ে যেত। এ সব মনে হয় রূপ-কথার গল্প—ও রকম কল্পনা বিলাস তার নেই। তবু ত অনেক সচ্ছল গৃহস্থ পরিবার আছে—যাদের ঘর আছে বাড়ী আছে প্রতিষ্ঠা আছে। আজকাল তেমন একটা চোখে পড়ে না। যা-ও বা দু একটা আছে সে সব ঘরের ছেলেরা প্রায়ই নিষ্কর্মা হয়। খাওয়া পরার ভাবনা না থাকলে যা হয়। মা বলেন, উঠতি ঘরে মেয়ে দেবে আর পড়তি ঘরের মেয়ে নেবে। ঐ লোক-টাকে ত উঠতিই বলা যায়। শিক্ষিত, রোজগেরে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।…

শবু কি দীননাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে? নিজে দেখে নিজের মতে বিনা দ্বিধায় তাকে জীবন সঙ্গিনী করে আপন করে নিতে চাইছে। বাবা ঠিকই বলেছে। বিষয়বুদ্ধির অভাব আছে নিশ্চয়ই, নইলে মেয়ে দেখতে এসে শুধু পড়ার কথা বইয়ের কথা বলে কেউ? কি জানি কেমন ধারা মানুষ! দাবি দাওয়ার ব্যাপারেও একেবারে উদাসীন। এমন অবস্থায় ছেলেরা বাপের সুপুত্তুর হয়ে চাপ দিয়ে কত কিছু আদায় করে—নতুন বিয়ে হওয়া ভগ্নীপতির দৃষ্টান্তই ত তার চোখের সামনে রয়েছে। তার বদলে বলে কিনা, নিজে ধার দেনা করে বিয়ে করবে তবু একটা পয়সা চাইবে না। কিছুদিন আগে বেবীদির বিয়ে হল, ছেলে ত বেকার—তাইতেই দুহাজার টাকা পণ, পনরো ভরি সোনা, বিরাট বরযাত্রীদের খরচ, প্রণামী, ফার্নিচার আরো কত কি। ওরা এককালের জমিদার, দিতে পারে। গত বছর দিদির বিয়ে হল—বাবা মা প্রায় কিছুই দিতে পারে নি। জামাইবাবুর মত মানুষ হয়না।

যেমন উদার স্বভাব তেমনি সুন্দর ব্যবহার—দিদির মত কালো মেয়েকে বিয়ে করেও বলে—আমি জিতে গেছি। জামাই বাবুদেরও বিষয় সম্পত্তি নেই, কিন্তু বহুদিন এ পাড়ে থাকে বলে হঠাৎ রিফিউজী হয় নি। মামাদের কাছে মানুষ। তাদের হেফাজতেই আছে চাকরি করে, কোন ভাবনা চিন্তা নেই। লোকটাও ত চাকরি করে, নিশ্চয়ই জামাইবাবুর মত ভাল হবে।...

শুয়ে শুয়ে শবু চুল চেরা বিচার করতে থাকে। বেশী কথা বলার চাইতে সে একটু ভাবতেই অভ্যস্ত—কিন্তু এত ভাবনা কোনদিন তার মাথায় এতভিড় করে আসেনি। যেন নিজের ভবিষ্যৎকে ভাগ্যের মানদণ্ডে তুলেছে ভালমন্দ বিচার করতে। মন্দের দিক বলতে সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবন ও পরিবেশের এক অজানা অস্পষ্ট ছবি, চাকরি ছাড়া নেই কোন চালচুলো। অন্যদিকে আছে ছেলেটির সহজ উদার ব্যবহার, আত্মবিশ্বাস, নিজের পছন্দে একটি মেয়েকে আপন করে নেবার প্রতিশ্রুতি। সবার উপরে আছে ঠাকুমা, মা-বাবার সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ। শবুর মঙ্গল কামনা তাঁরা অবশ্যই করেন। ছেলেটিকে মার পছন্দ হয়েছে, বড়মাসীর কথামত বংশ পরিচয়ও ভাল, চাকরি করে, স্বজাতি, পালটিঘর—দেখতেও কিছু কদাকার নয়। ভালর দিকের পাল্লাই ভারি মনে হয়। বাবা মা-র পছন্দ—শবুও রাজী।

দীননাথই হোক তবে তার প্রাণনাথ।...

ভাবতে ভাবতে এক সময় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অবচেতন মন স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে...শবু কত দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন মানুষ ভালয়-মন্দয় মেশানো। হঠাৎ মনে হল সে বুঝি কোন মরুভূমিতে একা একা চলেছে। পরক্ষণেই দেখে মরুভূমি নয়, গভীর অরণ্য—চারদিকে হিংস্র শ্বাপদেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্ধারের আশায় সে চারদিকে তাকাচ্ছে। দূরে একটা আশ্রম বা তপোবনের মত দেখা যাচ্ছে—সেখানে মা বসে আছেন স্বরূপে স্বমহিমায়। যার কোলে নির্ভয়ে আশ্রয় নিতে সে সামনে এগিয়ে চলেছে। ওদিকে আর একটা লোক দুহাত বাড়িয়ে অভয় আশ্রয়ের আহ্বান জানাচ্ছে কিন্তু লোকটি নিজেই প্রায় শ্বাপদ বেষ্টিত —নিরস্ত্র। কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে দোটানায় পড়ে গেছে—বাবাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। হিংস্র শ্বাপদগুলো ভীষণভাবে শবুর দিকেই তেড়ে আসছে।...ভয়ে শবুর ঘুম ভেঙে গেল, প্রাক হেমন্তের মিষ্টি রাতেও সে ঘেমে উঠেছে। ঘুম ভেঙে বুঝতে পারল, এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল—রাত গভীর। স্বপ্নের কি কোন মানে হয়? শাড়ীর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে

পাশ ফিরে কানাইয়ের গায়ের উপর একখানা হাত রেখে আবার শবু ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে বাবা ডাক্তার খানায় চলে যেতে ওবাড়ী থেকে ঠাকুমা এবাড়ীতে এলেন। মা পদ্মিনী দেবী হঠাৎ ডাকলেন—

'শবু, এদিকে আয় ত। তোর কি শরীর খারাপ লাগছে? দেখি গা দেখি, জ্বর টর হয়নি ত? চোখ দুটো একটু লাল দেখাচ্ছে।'

শবু বলল—'না, কিছু হয়নি ত।'

মা গায়ে হাত রেখে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর এ মেয়ের জন্মে থেকে, বলতে নেই, কোন অসুখ বিসুখ হয়নি—মা ষষ্ঠীর কৃপায় অপরের গচ্ছিত ধন মোটামুটি নীরোগ শরীরে সুস্থই আছে। তাই চেহারাটা একটু উস্কোখুস্কো দেখলে মনে তাঁর শঙ্কা জাগে। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে মা বললেন—

'আমরা ত সব দেখে শুনে অগ্রসর হতে যাচ্ছি, ছেলেটিকে ত দেখলি, তোর পছন্দ ত?'

শবু লজ্জায় ঠাকুমার পিঠে মুখ লুকোল। মা ঠাকুমাকে বললেন—

'কাল রাতে আপনার ছেলে বলছিল, মেয়ের পছন্দটাও একটু জেনে নিও—মেয়ে বড় হয়েছে।'

ঠাকুমা বললেন—'হ্যাঁ, আমরা সাধ্যমত দেখেশুনে ভাল মনেই মেয়ের বিয়ে দিতে চাই—এখন সবই প্রজাপতির নির্বন্ধ। ভবিষ্যৎকে ত আর দেখতে পাইনে, মেয়ের মনের কথাও জানিনে। তা লজ্জার কি আছে, বলে ফেল।'

শবু সরমে রাঙা হয়ে 'জানিনা' বলে ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মা জিজ্ঞেস করলেন—'কলেজ খুলবে কবে?'

এখানে স্কুল কলেজে পুজোর ছুটি কম, গ্রীষ্মে লম্বা ছুটি। শবু বলল—'কাল আমাদের কলেজ খুলবে, সকাল সাতটায় আমার ক্লাশ।'

মা ঠাকুমা আবার বিয়ের আলোচনায় বসলেন। ঠাকুমার প্রশ্ন—

'ছেলের বয়েস কত?'

'তা পঁচিশ ছাব্বিশ হবে।'

ঠাকুমা বললেন—'শবুর বয়স ত উনিশ হবে সামনের বছর।'

'ওই ধরুন আর কি।' বলে মা একটু হাসলেন। ঠাকুমার হিসেব ঐ রকমই। গত শ্রাবণে সতেরো পূর্ণ হয়েছে ত বলবেন আঠারো আর সামনের

বছরে আঠারো পূর্ণ হবে ত বললেন উনিশে পড়বে।

ঠাকুমা জানতে চাইলেন—'ছেলের জন্ম কি মাসে, কি বার?'

'সরকারী খাতায় লেখা আছে ডিসেম্বর, তবে মার কাছে শুনেছে মাঘমাসে জন্ম, রবিবার।'

ঠাকুমা বললেন—'জন্ম মাস পড়ছে না কারোই—অঘ্রান মাসে বিয়ে হতে বাধা নেই। রাম-সীতারও অঘ্রান মাসে বিয়ে হয়েছিল—ভাল মাস। দু জনেরই রবিবারে জন্ম। গোত্রে আটকাচ্ছে না, দু পক্ষই বারেন্দ্র, কাপ। ঠিকুজি কোষ্ঠীর খবরটা?'

মা বললেন—'ছেলের কাছে ইস্কুল কলেজের সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছু নেই নাকি।'

'না থাকলে আর কি করা যাবে।' ঠাকুমা আর সে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

মা ঠাকুমার সামনেই তাঁর পুঁজি খুলে বসলেন। নন্দু কানাই মিতু শ্রীলা পাশে বসে টাকা আধুলি সিকি আনি দুয়ানি পয়সা সব গুণতে লাগল।

ঠাকুমা বললেন 'আমার একজোড়া আড়াই ভরির বালা আছে, এখন বোধ হয় দু ভরি হবে—ও দুটো আমি শবুর জন্য দেব।'

পুঁজি হিসেব করে দেখা গেল আশীটাকা ভরি হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন ভরি সোনা কেনা যাবে।

মা বললেন—'আমার গয়না থেকে পুরোনো আড়াই পৈঁচি জোড়া আর আপনার বালা জোড়া যোগ করলে সাড়ে সাত ভরি মত সোনা হবে। ভাঙা গড়ার মজুরি আছে। মেয়ের হাতে সরু একজোড়া চুড়ি, এক জোড়া কান বালা আর পানের ডিজাইনের একটা আংটি আছে। সব মিলিয়ে খরচা বাদ দিয়ে সাত সাড়ে সাত ভরিই হবে। কি বলেন?'

ঠাকুমা বললেন—'ঠিক আছে, এদিক থেকে গিরিনের আর ভাবনা রইল না। বৌমা, তুমি ওবেলা একবার ওবাড়ীতে এসো, আমি পাশেই ঠাকুর-মশাইকে খবর দিয়ে রাখবো। বিয়ের দিনক্ষণ নিয়ে কথাবার্তা হবে।'

মা বললেন—'সেই ভাল। সেই সঙ্গে ঠাকুরমশাই এর কোন এক শিষ্যের নাকি কলকাতায় সোনার দোকান আছে তাকে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিলে সুশীলকে দিয়ে যোগাযোগ করিয়ে সেখান থেকেই শবুর পছন্দমত ডিজাইনের গয়না গড়ানো যাবে।'

বিকেলে ঠাকুর মশাই এর সঙ্গে কথা বলে এসে রাতে পদ্মিনী দেবী

স্বামীকে জানালেন, বারোই অঘ্রান শুক্রবার বিয়ের দিন আছে, সন্ধ্যা লগ্নে বিয়ে। গিরিনবাবুও তাঁর সম্মতি জানালেন। পরদিন সকালে বরুণ মারফৎ দীননাথের কাছে খবর চলে গেল।

সাত

আজ কলেজ খুলছে। হীরা সকালে এসেছে, শবু ও হীরা একসঙ্গে কলেজে যাবে। পথে পা দিয়েই হীরা বলল—

'এই শবু, তোর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

শবু আশ্চর্য্য হয়ে হীরার মুখের দিকে তাকায়। কথাটা ত বাইরের কাউকে বলা হয়নি, জানল কি করে?

হীরা বলল—'আহা, অমন আশ্চর্য্য হবার ভান করছিস কেন? কথাটা বোধ হয় সারা শহরের লোকই জেনে গেছে। আমার দাদা কাল তোদের শুভেন্দুদার ছোট এক ভাই এর কাছে শুনেছে। আমি তোর সব চাইতে কাছের বন্ধু, আমাকেই জানালি না'—বলে অভিমানে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পথ চলতে লাগল।

শবু বলল—'দেখ, তা নয়। কথাটাতো কাল পরশুই হল। আর এ দুদিন তোর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। তোকে বলবো না কেন? আর কি শুনেছে রে পরেশ দা?' অন্যের মুখ থেকে শবু নিজের ব্যাপারটা শুনতে চায়, বুঝতে চায়।

হীরা বলল—'ঐ ত হোটেল পাড়ার লোকটা, সেবারে যে জাহানারা সেজেছিল, তার সঙ্গে বিয়ে, ঠিক কিনা? বেশ ভাল হবে, তোদের দুজনকে বেশ মানাবে—আমি ত প্রায়ই তাকে পথে যেতে আসতে দেখি।'

কলেজে গিয়ে কমনরুমে পৌঁছে শবু বুঝল ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। মাসতুতো ভাইদের কল্যাণে বন্ধুরা সব আগেই জেনে বসে আছে। নিজে থেকে বলে যে চমক লাগিয়ে দেবে সে সুযোগ আর নেই। ঊর্মিলা শ্রাবণীকে জড়িয়ে ধরে বলল—

'কংগ্র্যাচুলেশনস্। কেবে বাহাদুর হউছি?'

সীমন্তী বলল—'আমি ত ছোট ভাইদের মুখে শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি, দাদাও যখন একই কথা বলল তখন বুঝলাম ব্যাপারটা সত্যি।

আমার দাদা অফিসে শুভেন্দুদার কাছে সেই কথাই শুনেছে।'

লাবণ্য বলল—'কণ শ্রাবণী, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিংকিং ওয়াটার!'

হীরা এবারে শ্রাবণীর পক্ষ নেয়, বলল—'অমন করে বলিস না। ও ত চুপেচাপে কিছু করেনি—প্রেমও করেনি। রীতিমত মা বাবা সম্বন্ধ এনে দেখিয়ে শুনিয়ে বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

প্রফেসর এসে গেছেন, চলচল ক্লাশে চল। যেতে যেতে শ্রাবণী ওদেরকে বলল—'পরে সব বলবো।'

পরদিন দুপুরে খাবার পর শবু মাকে বলে তপুকে সঙ্গে করে হীরাদের বাড়ী গেল। অনেক কথা আছে ওর সঙ্গে—অভিমান ভাঙাতে হবে। মেয়েটা খুব ভাল—একেবারে সরল সাদাসিধে, সেই জন্যই শবুর ওকে এত পছন্দ। শবুকে দেখে হীরার মা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ওর সৌভাগ্যের প্রশংসা করলেন। আবার নিজের অসুস্থ বড় মেয়ে ও হীরার কথা ভেবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। হীরার দিদি কথা বলতে পারে না—তবু সেও সব বোঝে, আর তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। শবু কি বলবে? কিছু বলা হয়ত শোভনও হবে না। হীরার মা খানিক কেঁদে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

হীরা বলল—'মেয়ে হয়ে জন্মেছিত, মার দুঃখ চোখে দেখা যায় না।'

শবু বলল—'সত্যিরে, মাসীমার জন্য আমারও বড় কষ্ট হচ্ছে। তোর দিদির এই অবস্থা আর আমি বিয়ে করতে চলেছি বলে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।'

হীরার দিদি পাশে থেকে শবুর গায়ে হাত বুলিয়ে যেন সান্ত্বনা দেয়। হীরা বলল—

'দেখ, দিদি সব বোঝে। অথচ করার কিছু নেই। যাক ওসব কথা, তোর কথা বল, কি করে সব ঠিক হল।'

শবু খুব স্বাভাবিকভাবে সব বলে গেল, একটা কথাও বাদ দিল না। হীরার দিদি পাশে থেকে সব শুনছে, হাসির কথায় মিটি মিটি হাসছে—যেন একটা ছেলে এসে তাকেই দেখে পছন্দ করে গেছে। হায়রে অবোধ!

হীরা সব শুনে বলল—'এ ভাই বেশ ভাল হল, বিয়ে হয়ে এখানেই থাকবি মা বাবাকে কাছে পাবি। দেখে শুনে যে বিয়ে হচ্ছে সেই ভাল। ঐ সব প্রেম ভালবাসার উপর ঘেন্না ধরে গেছে—শর্মিলাদি জ্যোৎস্নাদিকে ত চোখের

সামনেই দেখলাম, কত কেলেঙ্কারী হল।'

শবু বলল—'ও সব ভালবাসা-ফাসা কি করে হয় বুঝতেই পারি না। একটা মেয়ে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে যে কি করে মেলামেশা করে বুঝিনা। আমি ত আমার দূর সম্পর্কের দাদাদের কেন বাবা কাকাদের সামনেই কথা বলতে পারি না। আমার সব কথা মার সঙ্গে, ঠাকুমা কাকীমা ভাইবোনদের সঙ্গে আর তোর সঙ্গে।'

হীরা ঠাট্টা করে বলল—'সেই ভাল, সব কথা তুলে রাখিস তোর প্রাণনাথ দীননাথের জন্য।'

শবু বলল—'নামটাও জানিস না কি?'

হীরা বলল—'জানাবো না কেন, সেত সবাই জানে। তোর বর হবে বলে কি আমরা নামটাও জানতে পারবো না? সেবারে নাটকে মেডেল ডিক্লেয়ার করার সময়ই তো নাম বলেছিল।'

শবু বলল—'কি জানি ভাই, আমার মনে নেই—আমি হয়ত তখন অন্য-মনস্ক ছিলাম।'

দুজনের অনেক কথা উজাড় করে, হীরার মান ভাঙিয়ে সন্ধ্যার আগ দিয়ে শবু তপুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল হাল্কা মন নিয়ে।

আজকাল বাড়ীতে ছোট ভাইবোনেরাও অবসর সময়ে মেজদির বিয়ের কথায় মশগুল থাকে। বিয়ের সময় কে কি পোষাক পরবে এখন থেকেই তার বায়না শুরু হয়ে গেছে। মিতু বলল—

'না বাবা, আমি শাড়ী পড়ব না। সবাই আমাকে বুড়ী বুড়ী ভাববে, আমার চাই ভাল স্কার্ট,—বেশ স্মার্ট দেখতে লাগে।'

শ্রীলা ত ফ্রকই পরবে। নন্দু পরতে চায় হাফ্ প্যাণ্ট হাফ সার্ট—ওদের বয়সের কেউ ফুলপ্যাণ্ট পরে না। নতুন জামা প্যাণ্ট তার দরকার নেই, পূজোতে যে দুই সেট নতুন জামা প্যাণ্ট হয়েছিল তাতেই হবে। সেদিন ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে দেখেছে বাবার টেবিলের ড্রয়ারে বেশী পয়সা নেই—আবার এদিকে মেজদির বিয়েতে বাবার কত খরচ। সব দায়—সব চিন্তা যেন একা তার। কানাইয়ের কোন বোধ নেই, তবে নতুন জামা প্যাণ্ট তার অবশ্যই চাই।

মিতু মাকে বলল—'মা, স্কুলের মেয়েরা সব জিজ্ঞেস করে, তোর মেজদির বিয়ে কবে রে? আমি বুঝিনা সবাই জানল কি করে। দু একজন বলে, বড়

মাসীর ছেলেদের কাছে শুনেছে। ওরা দেখ কেমন ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

কানাই বলল—'বা রে, বলল ত কি হয়েছে? আমিও ত আমার সব বন্ধুকে বলেছি—জানিস, আমার মেজদির বিয়ে হবে।'

কানাইয়ের মত বোকাকে নিয়ে আর পারা যায় না। একে ত বোকা আবার সব ব্যাপারে ওস্তাদি আছে।

শ্রীলা বলল—'জানো মা (বড়মাকে আর সবার মত মা-ই বলে), সেদিন দেখি আমাদের স্কুলের বাইরের প্রাচীরে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে—'শ্রীলার ভাই অসিত।' স্কুলের মেয়েদের নামে ওরকম করে লেখে নাকি কেউ—সবাই নাম জেনে যাবে না?'

কানাইয়ের এই রকমই সব উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড। কতজনের আর মুখ চাপা দেওয়া যাবে। দরকারই বা কি। কথা বার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে, সুশীলের মারফৎ মেয়ের গয়না তৈরীর অর্ডার চলে গেছে। পদ্মিনী দেবী ও গিরিন-বাবু একটু একটু করে শবুর বিয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

বিয়ের চিঠি ছাপাবার ব্যাপারে ঠাকুমা বললেন—

'কথায় বলে মাসের নামে নাম আর নদীর নামে নাম হলে সে মেয়ে জীবনে সুখ পায়না—যখন শ্রাবণী নাম রাখা হল তখন খেয়াল করা হয়নি। বিয়েতে ওর নামটা পাল্টে প্রতিমা নাম ব্যবহার করিস, গিরিন—ওর চেহারাটাও ত সোনার প্রতিমার মতন।'

বিয়ের কনের নাম পাল্টে প্রতিমা করে কার্ড ছাপা হতে গেল।

মিতু বলল—'বরুণদাকে বলতে হবে জামাইবাবু যেন ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে বিয়ে করতে আসে। বড়দির বিয়ে হল শুধু উলু আর শাঁখে ফুঁ দিয়ে, কোন বাজনা ছিল না। বাজনা না বাজলে বিয়েই মনে হয় না।'

ঘরে বাইরে সবাই খুব উৎসাহ দেখাচ্ছে আনন্দ করছে। শবু কেন যেন তেমন আনন্দিত বোধ করছে না। এক গভীর বিষন্নতা তার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কেন এই বিষন্নতা? মেয়েরা যেখানে বিয়ের কথায় আনন্দে উচ্ছল হয়, পুলকে শিহরিত হয়—সে আনন্দ পুলকের অনুভূতি তার মনে জাগেনা কেন? সে কি শুধু বাবা মা ভাই বোনদের ছেড়ে যেতে হবে বলে? সে ত সবাইকেই যেতে হয়। যত ভাবে কোন চিন্তা করবে না তত নানান ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের চিন্তা যেন সেখানে বাসা বেঁধে আছে। শ্বশুর বাড়ী কেমন হবে? সেখানে সকলে তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে?

শবু তার ভাবী বরকেই শুধু দেখেছে। বাবার কথায় বুঝেছে ছেলের বাবা নাকি অতিশয় ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি। বাকি আর সবাই? তারা কে কেমন? এতটুকু কথার ঘা, সামান্যতম তাচ্ছিল্য সে সহ্য করতে পারে না। বড় কাকা বলেন, শবু বড় অভিমানী। মা বলেন, অত মান অভিমান ভাল না মা। কিন্তু সে ত কারো অবাধ্য হয় না, মুখে মুখে তর্ক করেনা, বেশী কথাই তার মুখে যোগায় না। বাবা বলেন—বোবার শত্রু নেই, শবু বেশী কথাই বলতে পারে না, ওর সঙ্গে যে শত্রুতা করবে সে নেহাৎই ঝগড়ুটে পাষণ্ড। স্বভাবে নম্র, মনের দিক থেকে দুর্বল শবু ভাবে, এই কথা বলতে না পারাটাই যদি তার সঙ্গে শত্রুতা করে তখন সে কি করবে? ভেবে কিছু কুল কিনারা পাওয়া যায় না—মনের ভাবনা মনেই পাষাণভার হয়ে চেপে থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

বিয়ের এক সপ্তাহ বাকি। শবুর কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দিদি জামাইবাবু এল কলকাতা থেকে। দিদির প্রথম ছেলে হবার লক্ষণ সর্বাঙ্গে। মা ঠাকুমার মনে গভীর তৃপ্তি।

বিয়ের বাজার এসে গেছে কলকাতা থেকে। মা ঠাকুমা বড়কাকীমা এক এক করে সব জিনিষ পরখ করে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। প্রথমেই সোনার গয়না—ডায়মণ্ড কাটা দুই জোড়া চুড়ি, চুড় এক জোড়া, কানের ঝুমকো এক জোড়া, শঙ্খ ডিজাইনের একছড়া গলার হার, বরের আংটি বোতাম। শবুর কানের কানবালা হাতের আংটি ও একজোড়া সরু চুড়ি এর সঙ্গে যোগ হবে। বেনারসী শাড়ী ও অন্যান্য জামা কাপড়। বিয়ের বাক্স, বিছানা, ননদের বাক্স, প্রণামী সব ঠিক আছে। থালা বাসন, বিয়ের টোপর, ছেলেমেয়ের জুতো সব স্থানীয় বাজার থেকে কেনা হবে।

মার মন খুঁত খুঁত করে, শীতের মুখে বিয়ে লেপ তোষক যদিও দেওয়া হচ্ছে, মেয়ে জামাইকে শীতের শাল দিতে হয়—কিন্তু সাধ যত সাধ্য নেই তত। এর পরেও বিয়ের অন্যান্য খরচ আছে। খাট ড্রেসিং টেবিল বা কোন ফার্নি-চারের ঝামেলা নেই। ঘড়ি সাইকেলের প্রশ্ন নেই। বর যাত্রীর ঝামেলাও নেই, বরের আত্মীয় স্বজন যে কজন আসবে বরের বাসায় উঠবে। শুধু বিয়ের রাতে তাদের ও কিছু অফিস বন্ধুদের আপ্যায়ন করলেই হবে। তবু আর সবেতে যা খরচ পড়ছে শেষ পর্যান্ত কততে দাঁড়াবে কে জানে। ভাই বোনেরা বিয়ের জিনিষ পত্র নেড়েচেড়ে আনন্দ করছে।

জামাইবাবু একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে শবুকে পরখ করার জন্য বলল—

'বরের সঙ্গে দেখা করে এলুম।'

শবু কোন উৎসাহ না দেখিয়ে শুধু বলল—'বেশত।'

সুশীল আবার বলল—'তোমরা দুজনে যে সেবারে সাক্ষীগোপালে বেড়াতে গিয়েছিলে সেই সব গল্প আমাকে শোনালো।'

শবু বলল—'তাই নাকি ?'

মিতুও বুঝতে পারে জামাইবাবু হয় গুল মারছে না হয় আন্দাজে ঢিল ছুড়ছে। জিজ্ঞেস করল—

'বলুন ত, তার চেহারা কেমন ?'

সুশীল অম্লানবদনে বলে গেল—'মোটা, ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কার্ত্তিকের মত এক জোড়া গোঁফ।'

শালা শালীরা একযোগে হাত তালি দিয়ে হেসে উঠল—'কিছু জানে না—মিথ্যে কথা।'

সুশীল বিব্রত মুখে জানালার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

দিদি বলল—'তোদের জামাইবাবুর কথা বিশ্বাস করিস না রে। সে ত তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সমুদ্রের ধারে বড়মার আশ্রমের কাছে।' সুশীলের সব জারিজুরি ফাঁস করে দিয়ে দিদি আবার বলল 'আচ্ছা তুমি কেন শুধু শুধু শবুর বদনাম করছ ?'

সুশীল যেন আকাশ থেকে পড়ল—'আমি আবার কি বদনাম করলুম ?'

দিদি বলল—'ঐ রকম বললে মনে হয়না কি এ বাড়ীর মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ?'

এবারে খাস ঢাকাই বোল বের হল সুশীলের মুখ দিয়ে। হাতের অঙ্গুলে টাকা বাজাবার মত করে বলল—

'হঃ, বাজাইয়া দেখতাছিলাম। বদনামের লাইগ্যা কি কইছি ? মা ঠাকরেনরা, ক্ষমা কইরা দিবা। তোমাগো বদনামের কথা কইলে ঘুড়ায় হাসবো।'

সুশীলের মুখে বাঙাল কথায় কিন্তু শবু ও ভাইবোনেরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। এই জন্তই জামাইবাবুকে শবুর খুব ভাল লাগে, মনে কোন ঘোর প্যাঁচ নেই। না হলে আজ প্রায় মাস তিন চার হল তার বিয়ের কথা উঠেছে, এর মধ্যে একদিনও ছেলেটার সঙ্গে পথে ঘাটে তার দেখা হয়নি যদিও কলেজে আর হীরাদের বাড়ীতে যেতে প্রায় রোজই পথে বের হতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—ছেলেটা কি উবে গেছে শহর থেকে ? কিন্তু তাও ত নয়. হীরার সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই বলে, কাল তোর বরকে দেখলাম, আজ তোর বরকে সাইকেলে যেতে দেখেছি। বাড়ীতে মিতু নন্দু কানাইও সেরকম কথা প্রায়ই বলে—শ্রীলা কিছু বলে না, সে আবার একটু নীতিবাগীশ আছে। তবু জামাইবাবু যখন বেড়াতে যাবার গল্প ফাঁদে শবুর মোটেই রাগ

হয়না। স্থানীয় ভাষায় বলে, মনে মনে গুড়পানি পিউথা। বলে যদি আনন্দ পায় পাক—মজায় কথায় শবু রাগ করবে কেন, সত্যি ত সে আর…।

দুই

আরো একটা দিন কেটে গেল। মামাদের চিঠি এসেছে, তারা কেউ আসতে পারছে না, সবাই হিন্দুস্থান পাকিস্তান নিয়ে বিব্রত। ছোটকাকা অবিনাশবাবু দলবল নিয়ে বিয়ের দুদিন আগে আসবে।

বরুণ হঠাৎ এসে উপস্থিত। বরুণকে দেখেই মিতু বলে উঠল—

'বরুণদা, নতুন জামাইবাবুকে ব্যাণ্ড পার্টির কথা বলেছেন ত?'

বরুণ বলল—'হ্যাঁ বলেছি। মাসীমা, বরের বাবা আজ সকালের গাড়ীতে এসেছেন। তাঁর নাকি কি সব কথা বার্ত্তা আছে আপনাদের সঙ্গে। মেসোমশাই ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে নিয়ে একবার গিয়ে দেখা করলে ভাল হয় বলবেন।' বরুণ এখন বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী। খবর দিয়ে সে চলে গেল।

খবর পেয়ে গিরিনবাবু ডাক্তারখানা থেকে বাড়ী এসে সব শুনে ঠাকুরমশাইকে অনুরোধ করে আনিয়ে সুশীলের সঙ্গে তাঁকে রওনা করে দিলেন। নিজে কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে পরে যাচ্ছেন, তিন বামুন একসঙ্গে যাত্রা করতে নেই কোন শুভ কাজে। আসল বরকর্ত্তার সঙ্গে আসল কাজের কথা ত এখনই হবে। বর নাকি ভিক্টরদের বাসাবাড়ী ইয়োর হোম ঠিক করেছে বিয়ের জন্য। সেখানেই সব কথা বার্ত্তা হবে।

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে গিরিনবাবু ফিরলেন, সঙ্গে সুশীল। বাড়ী সুদ্ধ সবাই উচাটন হয়ে অপেক্ষা করছে, বরকর্ত্তা কি বললেন জানার জন্য।

নির্ঝরিণীদেবী জিজ্ঞেস করলেন—'কি হল গিরিন, সব ঠিক আছে ত?'

গিরিনবাবু বললেন—'ঠিকই আছে। আমরা ঘাবড়েই গিয়েছিলাম—প্রথমেই লাহিড়ী মশাই কি বললেন জানো?' সবাই নিস্তব্ধ। 'বললেন—আমি ছেলের বিয়ে দিতে আসিনি, বিয়ে বন্ধ করতে এসেছি।'

নির্ঝরিণী দেবী শঙ্কিত হয়ে বললেন—'ও মা, সে কি, এতদূর এগোবার পর বিয়ের মাত্র আর তিনদিন বাকি!'

গিরিনবাবু বললেন—'হ্যাঁ। তা কারণ কি? প্রথম কারণ মেজ ভাইয়ের

বিয়ে হয়নি, তার মত না নিয়ে সেজর বিয়ে হয়না। উনি তার মৌখিক মতটা-ও নিয়ে আসেননি। আমরা হৈমর দৃষ্টান্ত দিয়ে অনুরোধ করলাম, ছেলের বাবা হিসেবে তিনিই সে অনুমতি দিতে পারেন। অনেক বলে কয়ে সে ব্যাপারে রাজী করানো গেল।'

নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'তারপর? আর কি?'

গিরিনবাবু একটু দম নিয়ে বললেন—

'এর পর যে কারণ উনি দেখালেন সেখানে আমি কেন স্বয়ং ঠাকুরমশাইও মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। লাহিড়ী মশাই বললেন, আমার বাৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ পতিত পড়ে আছে, হঠাৎ করে যে কোন সময় পতিত শ্রাদ্ধ করতে গেলে কৃষ্ণপক্ষ চাই—আর আজ থেকে বিয়ের তারিখ পর্য্যন্ত পুরো শুক্লপক্ষ। বলুন এখন আমি কি করব?—উনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপ করেন, প্রাচীন মানুষ, পেঁয়াজ রসুন খান না। সব পূজা ও ক্রিয়া-কর্মের নিয়ম কানুন তাঁর নখদর্পণে। ঠাকুর মশাই ত একেবারে হতবাক, এ ত বিয়ে বন্ধের পক্ষে মোক্ষম কারণ, পরের কৃষ্ণপক্ষের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।'

উৎকণ্ঠিত পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীর উপস্থিতি ভুলে স্বামীকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—

'তারপরে কি হল তাড়াতাড়ি বল—আমার ত ভয়ে হাত পা কাঁপছে।'

গিরিনবাবু বললেন—'এদিকে আমারও গলা শুকিয়ে গেছে, কেউ আমাকে এক গ্লাস জল দাও।'

খনা দেবী তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলেন। জল খেয়ে দম নিয়ে গিরিনবাবু বললেন—

'কথাটা ছেলের কানে যেতে সে বলল, ওসব নিয়ম কানুন বুঝিনা। একটা শুভদিন বিয়ের জন্য স্থির হয়েছে, ঐ দিনই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। উভয় পক্ষের যোগাড় যন্তর সব হয়ে গেছে সে সব কি পণ্ড হবে? নিয়মকানুন যেমন আছে তেমনি তোর বিকল্পও আছে।—অমন নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলের মুখে একেবারে কালাপাহাড়ের মত কথা। শেষে ঠাকুর মশাই অনেক ভেবে বিধান দিলেন, যেহেতু এটা শ্রীক্ষেত্র এখানে সব তিথি সব পক্ষেই পতিত শ্রাদ্ধ করা যেতে পারে। এখানে বিধবারা দুবেলা অন্নপ্রসাদ খেতে পারে, এমন কি একাদশীতেও। আমি নিজে কাল আপনাকে দিয়ে কাজ করিয়ে দেব।—লাহিড়ী মশাই বললেন, আমি এমন অশাস্ত্রীয় কাজ করতে পারব না, শ্রীক্ষেত্র

হলেও।—ঠাকুর মশাই বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে আপনার বড়ছেলে কটক থেকে আসছে, সে ত শ্রাদ্ধাদি কাজের উপযুক্ত অধিকারী, আমি বুঝিয়ে তাকে দিয়ে এ কাজ করাব। আপনি শুধু অনুমতি করুন।—ছেলে বলল, এই ত সব ব্যবস্থা আছে, আপনি আর আপত্তি করবেন না, বাবা।—লাহিড়ী মশাই বেশ বিবেচক ব্যক্তি, এককালের উকিল ত। বললেন 'তথাস্তু'। ছেলেটার মনের জোর আছে।'

গিরিনবাবুর কথা শেষ হতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—নির্ঝরিণী দেবী ও পদ্মিনী দেবীর বুকের উপর থেকে দুশ্চিন্তার পাহাড় নেমে গেল। দুজনে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন—'মঙ্গলহোক'।

এত সব ঝামেলা হচ্ছে শুনে শবুর খুব খারাপ লাগে, মনে জাগে শঙ্কা। এত বাধাবিঘ্ন ঠেলে এ বিয়ে হলে কি সত্যিই কারো মঙ্গল হবে? এখনি এই, পরে না জানি আরো কি হয়! মাকে একসময় কাছে পেয়ে শবু তার আপন মনের শঙ্কার কথা জানালো। মা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

'ওলো সুবুচনী, তোকে অত ভাবতে হবে না।'

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন—'কি হয়েছে? কি বলছে আমাদের বিয়ের কনে?'

মা বললেন—'শুনছেন মা আমাদের আদরিণীর কথা? এইটুকু একটু ঝামেলায় মেয়ে আমার মনমরা হয়ে গেছে। ছেলের বাবা ত মেয়ে অপছন্দের কথা বলেনি, এখানে বিয়ে দেবো না তাও বলেনি। কথাটা হচ্ছে শুধু শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুন পালন হল কিনা।'

ঠাকুমা বললেন—'এতে এত মন খারাপের কি আছে? লোকে বলে, লাখকথা না হলে বিয়ে হয় না। নাতনীকে ত প্রাণনাথ এক কথায় পছন্দ করেছে। দোষ ত তার বাবার। ছেলেদের কাছ থেকে যখন আগেই চিঠি পত্রে সব জেনেছে তখন তিথি দেখে আগের কৃষ্ণপক্ষে পূর্বপুরুষদের জলদানটা করে রাখলেই পারতো। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, সময় মত এসে হাজিরও হয়েছে—তা নিষ্ঠাবান বামুনের তো ও কাজটা আগে সেরে আসাই উচিৎ ছিল। বিয়ে বন্ধ করা বললেই হল? তার না হয় ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া বা বন্ধ করা সহজ কথা? মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে কথা।'

মা বললেন শবুকে—'শুনলি ত মার কথা? তোকে আর এ নিয়ে মন খারাপ করতে হবেনা।'

সুশীল ডাকল—'ও শবু, তুমি এদিকে এসো, কিছু কাজের কথা আছে।'

পাশের ঘরে ভাইবোনদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এতক্ষণ দীননাথের সঙ্গে কি কি সব কথা হয়েছে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে তার সরস বর্ণনা শুরু করল সুশীল। কথা বলার ঢঙে শালা শালীরা আমোদে হাসতে থাকে। কথার ভঙ্গি দেখে মনে হয় জামাইবাবু এতক্ষণ বরের সঙ্গে কথা বলে কত বড় একটা রাজ্য জয় করে এসেছে যেন। হাসি গল্পে শবুর মন একটু একটু করে হাল্কা হয়ে আসে।

পরদিন সকালে ভুবনেশ্বর থেকে অবিনাশবাবু সপরিবারে এলেন। ভাড়া বাড়ী ও নতুন বাড়ী নিয়ে বিয়ের যোগাড় হাঁটাহাঁটি জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। কিস্তুর বিয়ের সময়ের মত পাশের দুখানা ঘর খালি পাওয়া গেছে, তার উপরের ছাত ও ছাতের ঘরও পাওয়া গেছে। বিয়ে এই ভাড়া বাড়ীতেই হবে—নতুন বাড়ী এখনো ভাল করে গড়ে ওঠেনি, চারদিকে ইট বালি চুন সুরকি ছড়ানো অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। তাই এই ভাড়াবাড়ীই ভাল।

দুপুর বেলা ঠাকুর মশাই বাড়ী যাবার পথে খবর দিয়ে গেলেন, ছেলের বড়ভাই হৃদিনাথকে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের বাৎসরিক কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে—এখন বিবাহ অনুষ্ঠানে আর কোন বাধা নেই। সবাই নিশ্চিন্ত হল।

পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীকে বললেন—

'সবই ত হল। এখন ঘাসউলী হোতার মাকে কালই ডেকে আনাতে হয়। শবু যে এখনও তার গচ্ছিত ধন।'

নির্ঝরিণী দেবী বললেন—'ওমা তাইত, আমার মনেই ছিল না।' তখনই লোক পাঠান হল ঘাসউলী হোতার মা ও রামুকে খবর দিতে।'

বিকেলে বরুণের সঙ্গে হৃদিনাথের স্ত্রী বীণা দুটি শিশুকন্যা ও কটকের এক প্রতিবেশীর মেয়েকে সঙ্গে করে এসে আলাপ পরিচয় করে গেল। সবাই বলল শবুর ভাবী বড়জা বেশ হাসিখুশি। ঠাকুমা মা কাকীমারা তার সঙ্গে কথা বলে তার ব্যবহারে খুব খুশী। বীণা শবুকে দেখে বলেছিল—

'শ্রাবণী, তুমি আমার দীনু ঠাকুরপোর বৌ হবে, তুমি কলেজে পড় শুনলাম, আমি কিন্তু লেখাপড়া জানি না তবু আমি তোমার বড়বৌদি, বড়দি' বলে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই বীণাদিকে শবুর ভাল লেগেছে।

বীণা চলে গেলে ছোটকাকীমা শাশুড়ী ও বড়জাকে বললেন—'ঐ বৌটি খুব বড় জমিদার ঘরের মেয়ে। ওর এক পিসীর ওর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে যে

জমিদার বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল আমার দিদিরও সেই পরিবারে বিয়ে হয়েছে।'

ঠাকুমা বললেন—'তবে ত ভালই হল, সবই জানাশোনা ঘর, আর কোন সংশয়ই রইল না। আসলে আমাদের বারেন্দ্র সমাজটা এত ছোট যে দুটো কথা বললেই সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ে।'

মা বললেন—'বেশ ভাল কথা। দীপুর দিদির যখন ঐ গ্রামেই শ্বশুর-বাড়ী তখন ত নিশ্চয়ই ভাল জানাশোনা আছে।'

শবুর ভাবী শ্বশুরবাড়ীকে এখন আর কারো খুব একটা দূরের অপরিচিত পরিবার বলে মনে হয় না।

আর একদিন পরে কাক-ডাকা ভোরে দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শবুর জীবনের সেই বিশেষ শুভ দিনটি শুরু হবে। খুব সকালে গ্রাম থেকে হোতার মা ও রামু এসে গেল। রামু এই দেড় বছরে আরও অনেকটা বুড়িয়ে গেছে। তবু কর্তামশাইয়ের নাতনীর বিয়ে, কাজে কম্মে সে যেন যৌবনের শক্তি ফিরে পেয়েছে। একাই চারদিকে ছুটাছুটি করে সব কাজ নিজের মাথায় তুলে নিল।

আর ঘাসউলী হোতার মা—সে এক স্নেহময়ী করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি যেন। সর্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়েছে, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, বয়সের হিসাব জানে না—সেই যে আগে একবার বড় যুদ্ধ হয়েছিল তখন সাত আট বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। বয়স দু কুড়ি কি তিন কুড়ি হবে। গাঁয়ের গরিব ক্ষেতমজুর ঘরের বৌ, বাড়ীর সকলের সঙ্গে তাকেও আজীবন খাটতে হয়েছে। পরের জমির ঘাস কেটে শহরে এনে বিক্রি করে সেও সংসার চালাতে কম পরিশ্রম করেনি। দু তিন দিন বাদে বাদে তিন ক্রোশ রাস্তা ঘাস মাথায় করে পায়ে হেঁটে শহরে এসেছে। মৈত্র পরিবারে গাই বাছুর ছিল, সে সূত্রে এ বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক বছরের। আর সব শেষে বড় পরিচয় সে হল শবুর ধাই মা—লোকাচার ও শাস্তর মতে সে এখন তার আসল মা।

দারিদ্রের চাপে হোতার মাকে বয়সের তুলনায় বুড়ী দেখায়—এখন আর সে এত দূর শহরে আসতে পারে না। শবুর বিয়ের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে—তারই ত মেয়ের বিয়ে, তার অনেক দায়। আনন্দে স্নেহে শবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আপন মায়ের মত কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল। বারবার মেয়ের গায়ে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—

'কেতে সুন্দর হেইছি মোর ঝুয়টি, যিমিতি কি রাজার ঝুয়। ভগবান তোতে সুখে রাখন্তু রাজরানী করন্তু। গরিব মাকু ভুলি যিবুকি ?'

শবু লজ্জায় আনন্দে আবেগে বলল—'ভুলবো কেন? মা-কে কি কেউ ভুলতে পারে, তুমিতো আমার মা।'

ঘাসউলী হোতার মা আনন্দে গর্বে উপস্থিত শবুর ভাই বোনদের দিকে তাকিয়ে বলল—

'সমস্তে শুনিছ? মু তাহার মা, সে মোর ঝুয়—বুঝিল?'

সুশীল শহরের মানুষ। এক গ্রাম্য বৃদ্ধার সরলতায় যতটা না তাজ্জব মানে তার চাইতে মুগ্ধ হয় বেশী।

হোতার মা পদ্মিনী দেবীকে ডেকে বলে—'আলো ভউনী, আস, কড়ি বদল কর তেবে মু ঝুয়কু দেবি। ন হেলে মু তাকু মো গাঁয়ে নেই যিবি।'

ঠাকুমা বললেন—'সব হচ্ছে গো মেয়ে, তুমি একটু বিশ্রাম করে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নাও। তারপর মঙ্গলঘট বসিয়ে, মঙ্গলঘট, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে কড়ি বদল হবে।'

দুপুরে শবুর স্নান হলে তাকে নতুন শাড়ী পরিয়ে খোলা উঠোনে হোতার মার-কোলের কাছে বসান হল। মঙ্গল ঘটের সামনে মাথার উপর সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ সুশীলকে সাক্ষী রেখে মেয়েলী আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পদ্মিনীদেবী তাঁর কাছে সযত্ন রক্ষিত কড়ি তিনটি বের করে শবুর কপালে ছুঁইয়ে হোতার মার হাতে দিলেন। হোতার মা কড়ি তিনটি নিজের আঁচলে বেঁধে চোখের জলে শবুকে আশীর্বাদ করে পদ্মিনী দেবীর হাতে তুলে দিল। ছোট ভাই বোনেরা অবাক হয়ে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

ঠাকুমা সুশীলকে বললেন—'জান বাবা, এই মেয়ের কল্যাণে আর আশীর্বাদে আমার স্বল্পায়ু নাতনী আজ নীরোগ শরীরে এত বড়টা হয়েছে। সবই ভগবানের ইচ্ছা।'

হোতার মা একজোড়া পায়ের আঙুলে পরার রূপোর চুমকি মেয়ের বিয়েতে দিল—গরিব মায়ের স্নেহের দান। শবু একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। কি করে যে এই গরিব মায়ের ঋণ শোধ করবে ভেবে পায় না। মা পদ্মিনীদেবীকে বলল—

'মা, আমার ধাইমাকে আমি কি দেব?'

মা বললেন—'দিস, আমি সব যোগাড় করে রেখেছি।'

তিন

দিন শেষ হয়ে রাত হল। বিয়েবাড়ী কাজে কামে সরগর। মা ঠাকুমার এবারে স্ত্রীআচার নিয়ে বেশী চিন্তা নেই, মাত্র দেড় বছর আগে কিঙ্কুর বিয়েতে সে সব অনুষ্ঠান হয়েছে। জিনিষ পত্তর যোগাড় করতে কোন বেগ পেতে হল না। আজ রাত শেষ হতেই সব অনুষ্ঠান এক এক করে শুরু হবে। তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের খাইয়ে শুতে পাঠানো হল।

এক প্রহর রাত বাকি থাকতে মা ঠাকুমা কাকীমারা শবুকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দধিমঙ্গল অনুষ্ঠান সারা করলেন। বিয়ের সারাটা দিন না খেয়ে থাকতে হবে মেয়েকে তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং প্রয়োজনও। কিছু বেলা হতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আদান প্রদান হল, অধিবাস, শবুকে গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করাল সব এয়োরা মিলে, নিজেদের মধ্যে হলুদ খেলাও হল। স্নানের পর শবু পরল নতুন শাড়ী—এরপর তাকে সোহাগ জল মাপতে বসতে হবে।

কিঙ্কু কলকাতা থেকে এসেছে শুনে অনেকদিন পরে তার এককালের বন্ধু ও সহপাঠিনী কমরুণ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দুপুর বেলা। বাড়ীতে এত লোকজন দেখে সে জিজ্ঞেস করল—

'কিঙ্কিণী, ব্যাপার কণ কি! কাহার বাহাঘর কি?'

কিঙ্কু বলল—'হ্যাঁ, আজ শবুর বিয়ে।'

কমরুণ খুশি হয়ে বলল—'ভাল হেলা। শুন্ কিঙ্কিণী, মু কেবে হিন্দু বাহাঘর দেখি নাহি, মোতে টিকে দেখিবাকু দব? শবুর বাহাঘর মু দেখিথাস্তি।'

কিঙ্কু বলল—'আসিস সন্ধ্যাবেলায়, দেখবি।' কমরুণ একরকম যেচেই নেমতন্ন নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল, সন্ধ্যার সময় আবার আসবে বলে।

বড়কাকা যথারীতি রান্না খাওয়ার তদারকি করছেন। ছোটকাকা সকাল থেকে নান্দীমুখের কাজে ব্যস্ত ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে। কনে সম্প্রদানও ছোটকাকাই করবেন। বাবা গিরিন বাবু বলেছেন—

'আমার সব থেকে আদরের মেয়ে শবুকে নিজে কারও হাতে সম্প্রদান করতে পারব না, অবিনাশ করুক।'

মা বাবা দুজনেই তাদের আদরের মেয়ে শবু-অন্ত প্রাণ, বাবার এই কথাতেই তা বোঝা যায়। তবু সব কিছু চলে সংসারের নিয়মে।

সুশীল বাইরের গেট মঙ্গলঘট থেকে আরম্ভ করে উপরে ছাদনাতলা, বাসর সাজানোর দায়িত্বে আছে। অতিথি আপ্যায়নের ভারও তার এবং অবিনাশের উপর।

শবুকে ছাতের ঘরখানাতে সোহাগ জল মাপতে বসান হয়েছে। হীরা, সীমন্তী, উর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, লাবণ্য সবাই এসে আলপনা দেওয়া ও বাসর সাজানোর কাজে লেগেছে। সন্ধ্যার আগ দিয়ে এক ফাঁকে তারা যার যার বাড়ী গিয়ে নিজেরা সেজে এল। এবারে সবাই মিলে কনেকে সাজাতে বসল।

শবু হাতে পায়ে মুখে সাবান দিয়ে এলে তার পায়ে আলতা পরানো হল। খোঁপা করে চুল বেঁধে রূপোর কাঁটা দিয়ে ভাঁজ করে আটকে দিল, এই প্রথম কপাল থেকে মাথার মাঝখান বরাবর সিঁথি কাটা হয়েছে। তার পরে বেনারসী শাড়ী পরিয়ে সাজাতে বসান হয়েছে। মা পদ্মিনী দেবীর সারাদিন কাজের অন্ত নাই, কিছুক্ষণ পর পরই উপর নীচ করছেন। মেয়ের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা, মন খারাপ লাগছে কিনা খবর নিচ্ছেন। জোড় এয়ো হয়েছে এবারে ছোটকাকীমা ও দিদি কিস্থ। কনে সাজাতে বসেছে তার বান্ধবীরা, ছোটকাকীমা ও দিদি দেখাশোনা করছেন। মা এই সময়টা একটু বেশীক্ষণ সামনে বসে ঠিকমত সাজান হচ্ছে কিনা দেখছেন।

কমরুণ তার বোন আয়েসা ও এক মেয়েকে নিয়ে এসেছে, হিন্দুদের বিয়ে দেখতে। তাদেরকে একটু আলাদাভাবে শতরঞ্জি পেতে এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে একখানে বসেই কনে সাজান ও বিয়ে দুই-ই দেখতে পারে।

সামান্য প্রসাধনে লাল বেনারসী ও চেলিতে, সোনার নতুন অলঙ্কারে, কাজল চন্দন টিপ শোলার মুকুট ফুলের মালায় শবু একটু একটু করে অপরূপ রূপবতী হয়ে উঠল। সুশীল একসময় দেখে বলল—

'আমার ত মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আর একবার পিঁড়িতে বসব নাকি?'

হীরা শাসনের সুরে বলল—'চুপ, অপরের জিনিষের দিকে হাত বাড়াবেন না, বাড়ালে রূপের আগুনে হাত পুড়ে যাবে।'

সুশীল বলল—'আগুন ত আমার চারদিকেই দেখতে পাচ্ছি। আমারটাই শুধু প্রদীপের আলো।'

সীমন্তী জবাব দিল—'প্রদীপের আলোই ভাল মশাই, কেন মিছিমিছি আগুনে হাত দিতে গিয়ে বিপদে পড়বেন?'

'ছেলেরা ত আগুন নিয়ে খেলতে ...'

'আঃ কি হচ্ছে কি ?' কিছু ধমকের সুরে স্বামীকে থামিয়ে দেয়। 'সামনে শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী মাসীশাশুড়ী সব রয়েছে—আর কথার ছিরি দেখনা। ওদিকে ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা শোনা যাচ্ছে তোমার যা কাজ তাই কর গে।'

সুশীল একবার শবুর দিকে চেয়ে হেসে নীচে চলে গেল।

ছোটকাকীমা বললেন—'সে কি দিদি, আপনি এখনো কাপড়টাই পাল্টাননি ওদিকে বর এসে পড়ল, বর বরণ করতে হবে যে।'

পদ্মিনী দেবী আদর করে শবুর থুতনীতে হাত ছুঁইয়ে অভয় হাসি হেসে চুমু খেয়ে চলে গেলেন নিজে তৈরী হয়ে নিতে। আসল কাজ মেয়ে-সাজানোর কাজ শেষ হয়েছে, এখন নিশ্চিন্ত।

পদ্মিনী দেবীকে নতুন করে শাড়ী পাল্টাতে দেখে গিরিনবাবু ঠাট্টা করলেন—'মা মেয়ে কি একই লগ্নে ····।'

পদ্মিনী দেবী স্বামীর মুখে হাত চাপা দিলেন—'তোমার মুখে দেখি কিছুই আটকায় না। তুমিও একটু ভদ্রস্থ হয়ে নাও ত।'

গিরিনবাবু বললেন—'আমি ত কন্যাদায়গ্রস্ত, আমার অত সাজলে চলে ? মেয়ের মা শাড়ী গয়না পরে সাজলেই হল।'

পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীর কাছে অনুযোগ করলেন—'দেখুন ত মা, আপনার ছেলে আজকের দিনেও সেই ফতুয়া আর মোটা ধুতি পরে থাকবে।'

নিঝরিণী দেবী বললেন—'না, না গিরিন, তুই ভাল দেখে ধুতি পাঞ্জাবী পর। সম্প্রদানের কাজ ত অবিনাশই করবে।

'সবাই মিলে আমাকে সঙ না সাজিয়ে ছাড়বে না দেখছি'—বলে গিরিনবাবু পোষাক পাল্টাতে গেলেন।

ব্যাণ্ডের বাজনা খুব কাছে এসে গেছে। মিতুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। সারা বাড়ীতে ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। 'বর এসে গেছে' বলে সবাই ছুটল গেটের দিকে। শবুর বান্ধবীরা ছাতের উপর থেকেই বর বরণ করা দেখবে ঠিক করে ছাতের আলসের দিকটায় গেল—কমকুণদিরাও তাদের সঙ্গে গেল। শবু এখন সাজঘরে প্রায় একা, মাঝে মাঝে এটা ওটা নিতে কেউ কেউ ঘরে ঢুকছে আর চলে যাচ্ছে। বাড়ীর সামনে এসে কিছুক্ষণ তুমুল আওয়াজ তুলে শানাই বিউগিল ক্ল্যারিওনেট জগঝম্প ড্রাম করতাল সব এক-সঙ্গে নীরব হল। মুহূর্তের নীরবতা ভেদ করে সমবেত মহিলাদের উলু আর শঙ্খ বেজে উঠল। শুরু হল স্ত্রী-আচারের নানা অনুষ্ঠান। এই অবসরে আর

একবার শবু নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখছে।…

আর কয়েক মুহূর্ত পরেই আসছে শবুর জীবনের পরম লগ্ন—বিয়ের শুভ-লগ্ন। তারপর ওর জীবনের ধারা যাবে বদলে। ছিল শিশু কিশোরী কুমারী কন্যা—হবে বধু, পরের ঘরনী। আছে পিত্রালয়ে, এর পরের ঠিকানা হবে স্বামীর ঘর। গোত্র যাবে বদলে, মৈত্র থেকে হবে লাহিড়ী। চেনা জানা একটা পরিবেশ ছেড়ে ভর্তি হবে গিয়ে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা সংসারে।

এখানে আছে মায়ের মমতা, বাবার স্নেহাশ্রয়, ঠাকুমার আদরের প্রশ্রয়, কাকা কাকীমাদের শুভেচ্ছা আর ভাই বোনদের বুকভরা মধুর ভালবাসা। এখানে সে সবার মন বোঝে, সকলের ভাব, রুচি জানে—তারাও ওর আশা আকাঙ্খাকে মূল্য দেয়। নতুন সংসারে গিয়ে সে কোন পরিস্থিতিতে পড়বে? সেখানে কি মা বাবার মত স্নেহ, ভাইবোনদের মত আদর ভালবাসা পাবে? পাবে কি স্বামীর ভালবাসা আর অভয় আশ্রয় যা সে এতদিন পেয়ে এসেছে মা-বাবার সংসারে?

মৈত্র পরিবারে সচ্ছলতার দিনে জন্ম হলেও বেশীর ভাগ সময় কেটেছে অভাব অনটন ও কষ্টের মধ্যে। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত শবুর স্কুলের মাইনে লাগত মাসে মাত্র দু আনা, কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল তা সে আজও জানে না। লেখা পড়ায় যেমনই হোক কোন বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করে বাবা মাকে বিব্রত করেনি। যতটা পারে সংসারের কাজে সাহায্য করেছে। দিদি কটকে থাকতে বা বিয়ে হয়ে যাবার পর ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করেছে। ঠাকুমার উপস্থিতি তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে, ঠাকুমা কত্তামার মুখে শুনেছে পরিবারের নানান ঘটনা, অতীত ইতিহাস। বড় কাকার সস্নেহ দৌরাত্ম্য ও আপন-ভোলা চালচলন এক সুখের স্মৃতি বয়ে আনে। ছোট-কাকার প্রশ্রয়, ছোটকাকীমার আশৈশব আদর যত্ন তার জীবনের অমূল্য পাথেয়। সবার উপর বাবা আর মা—শবুর জীবনের ধ্রুবতারা। ভবিষ্যতের আদর্শ। পরম স্নেহের আধার মা-বাবা ছাড়া তার চোখের সামনে জগৎ অন্ধকার। সবাইকে ছেড়ে সে কেমন করে স্বামীর ঘর করবে? যদি সম্ভব হত সারাজীবন বাবা-মা আর সবার সেবা করে কাটিয়ে দিত। কিন্তু তাতেও যে বাবা-মা জীবনে স্বস্তি পাবেনা—সংসারের এমনই বিচিত্র ধারা। মা-বাবা চান না শবুকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করতে, শবুও চায়না দূরে যেতে—তবু চলে যেতে হবে এই স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে।

শবু জানেনা কতদিন আর এ শহরে সে থাকতে পারবে। যখন সে থাকবে

না তখনও এ শহরে আসবে শ্রাবণ মাস, শবুর জন্মমাস, নামবে ঘন ঘোর বর্ষা, ধুয়ে যাবে সব মলিনতা। শরতে ফুটবে শিউলি আসবে পুজো-আনন্দ-নাটক, বসবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মিলন মেলা। শীতের রুক্ষতা পেরিয়ে পৌষ পার্বণ আর বাগদেবীর আরাধনা অনুষ্ঠান ছুঁয়ে আসবে বসন্ত চিরবসন্তের দেশ সমুদ্রতীরের এই শহরে। গাছে গাছে ফুটবে ফুল অলিরা তুলবে গুঞ্জন, চারদিকে জাগবে রঙের সমারোহ, রঙের আনন্দ। দক্ষিণের বাতাস বইবে উতলা হয়ে, গাইবে কোকিল, আমের গাছে ধরবে নতুন মঞ্জরী, ভ্রমর মৌমাছি প্রজাপতিরা মধু পান করবে ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে। আসবে চৈত্র বৈশাখের উষ্ণতা, কাল-বৈশাখীর ঝড়ে উড়ে যাবে যত ধুলো আর আবর্জনা। জ্যৈষ্ঠের তপ্ত নিদাঘে ঘুঘুর স্বরে আনবে এক করুণ বিষণ্ণতা। ঋতুর আবর্তে বৎসর যাবে বৎসর আসবে। আর—সে সবের মধ্যে থাকবে না শবু, সেই যে এক ছোট্ট শিশু একদিন সকালে মায়ের কোল আলো করে এসেছিল রূপরস গন্ধময় পৃথিবীর ছোট এই কোণে, ছোট এই শহরটি যাকে বুকে করে লালন করেছে, জীবনের সতেরো বর্ষা-বসন্ত পাড়ি দিয়েছে যে এই শহরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, আকাশের আলোয় চোখ মেলে। সব সে ছেড়ে যাবে, হাসিমুখে জীবনের সব দুঃখ কষ্ট বরণ করে নেবে—শুধু মা বাবার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটবে বলে। শবুর সুখের কথা ভেবেই তাঁরা শবুকে স্বামীর ঘরে পাঠাচ্ছেন—সে-ও প্রাণ-পণে চেষ্টা করবে সবাইকে সুখী করতে যা দেখে বাবা মা পাবেন অপার শান্তি। বাবা মাকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিতে তার নিজের দায়িত্বও কম নয়। শবুর বিয়ে হয়ে গেলে তাঁরা আর একটি কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাবেন। আরও দুই বোন মিতু তপুর বিয়ে দিতে হবে। নন্দু কানাইকে মানুষ করতে হবে, ওরা এখনও শিশু। কষ্টের সংসারে বাবা মাকে এখনো বহু পরিশ্রম করতে হবে, নন্দু কানাই বড় হবে মানুষ হবে তবেই তাঁরা স্বস্তি পাবেন, পাবেন অবসর…

হুড়মুড় দুড়দাড় করে সব উপরে উঠে এল—স্ত্রী আচার শেষ, এখন ছাদনা তলায় বিয়ের অনুষ্ঠান। শবুকে অন্যমনস্ক দেখে সীমন্তী তার গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—

'কিরে, বরের ধ্যান করছিস না কি? আর ধ্যান করতে হবে না, বর উপরে উঠে আসছে।'

হীরা বলল—'আমি জানি ও কখনই বরের ধ্যান করছিল না। নিশ্চয়ই

বাবা মার কথা ভাবছিল।' হীরা শবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার মনের কথা বুঝতে পারে।

ছোট কাকীমা মা দুজনে মিলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির কাজ সেরে নিলেন, কনের সাজগোছ ঠিক করে দিলেন। বিয়ের আসর থেকে ঠাকুর মশাই আদেশ দিলেন কনেকে আনতে। শবু একে একে গুরুজনদের প্রণাম করল। সবার শেষে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বাবা ও মা। বাবাকে শবুর মনে হয় যেন স্বয়ং শিবঠাকুর মহাদেব। আর মা যেন পর্বত দুহিতা পার্বতী। বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে শবু অবসন্নভাবে বসে পড়ছিল, বাবা সযত্নে ওকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন, গভীর আবেগে তার মাথায় হাত রাখলেন। নির্ঝরিণী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

'সারাদিন মেয়েটা উপোস করে আছে, এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়ালেও কি তোমাদের শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়? ওর শরীর যে বইছে না।'

ঠাকুমা বললেন—'আর বাবা একটুখানি, এতটাই যখন কষ্ট করল অল্পের জন্য আর নিয়ম ভঙ্গ করবে কেন? এ কষ্ট সুখের কষ্ট—এখন যত কষ্ট ভবিষ্যতে তত সুখ।'

মা পদ্মিনী দেবীরও আজ উপোস—কথায় বলে, মা যত শুকোবে মেয়ে তত সুখী হবে। মাকে প্রণাম করে শবু মার বুকে আছড়ে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা তাকে অনেক আদর করে চুমু খেয়ে বললেন—

'বোকা মেয়ে, এমন সময় কি মন খারাপ করতে আছে? এ ত আনন্দের অনুষ্ঠান। কিছু ভাবিস না, আমরা ত আছি।'

মা যত্ন করে ধরে শবুকে বিয়ের উল্টো পিঁড়িতে বসিয়ে নিজে হাতে আর এক দফা সাজগোছ ঠিক করে দিলেন। মার হাসি মুখের দিকে চেয়ে শবু এক হাতে জামাইবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে অন্য হাত শুভেন্দুদার কাঁধে রেখে বিয়ের আসরে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হল। জয়ন্ত কাকা, বলরাম কাকা, জামাই বাবু ও শুভেন্দুদা শবুকে পিঁড়ি সুদ্ধ শূন্যে উঠিয়ে নিল। মহিলারা একযোগে উলু দিতে লাগলেন, বেজে উঠল শাঁখ, ইশারা পেয়ে ব্যাণ্ডপার্টি একসুরে একতালে মেতে উঠল ঐক্যতানে, চারদিকে তার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হ্যাজাক আর গ্যাসের আলোয় ছাদনা তলা আলোকিত। শবু লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না, চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে আছে। কয়েকজন হাঁক ছেড়ে গুণছে—এক পাক, দুই পাক, তিন ··· সাত পাক। এবার সবাই বলতে থাকে,—'মুখ তোল, চোখ খোল, তাকাও'। তাকিয়ে

দেখে সে সকলের মাথার উপরে উঠে গেছে, সামনে একটি অর্ধপরিচিত মুখ —একটুখানি চোখাচোখি হতেই সরমে আবার ছুচোখ বুজে এল—শুভদৃষ্টি। ঘন ঘন উলু ও শাঁখের আওয়াজের মধ্যে জামাইবাবুর হাতে ভর দিয়ে শবু টুপ করে মালা পরিয়ে দিল সামনের দাঁড়ানো মানুষটির মাথা গলিয়ে,—আর একবার চোখাচোখি হয়ে গেল, বুকের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি জাগছে। ওধার থেকে এক জোড়া প্রসারিত বাহু শবুর গলায় সোনার আর ফুলের মালা পরিয়ে দিল। অনেক লোকের কথা শোনা যাচ্ছে—কেউ বলছে, জামাই বেশ ভাল হয়েছে—বরযাত্রীরা বলছে, পাত্রী খুব সুন্দরী।

পিঁড়িসুদ্ধ শবুকে নিয়ে বসান হল ছাদনাতলায়, পাশে এসে বসল নতুন মানুষটি—শুরু হল সম্প্রদান। শবুর খুব কাছে এসে বসেছেন ছোট কাকীমা, দিদি আর হীরা। সম্প্রদান করছেন ছোটকাকা অবিনাশবাবু। শবুর ডান হাতটি তুলে দেওয়া হল আর একজনের হাতের উপর। ঠাকুর মশাই ং: লাগিয়ে নানান মন্ত্র উচ্চারণ করছেন—একবার ছোটকাকা একবার অন্য মানুষটি সে সব আওড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কানে বাজছে—'সালঙ্কারা কন্যাম্' 'প্রতিগৃহ্যতাম' 'প্রতিগৃহ্ণামি'। কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠের পর উভয়ের চেলি আর চাদরের খুঁটে গ্রন্থি বেঁধে দেওয়া হল। বর বধূ রওনা হল বাসর ঘরের দিকে—এবারে শবু চলেছে বরের পিছু পিছু পায়ে হেঁটে।

কমরুণ আয়েসা হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠান এত কাছে থেকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি। ওদের অনেকদিনের একটা সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। দিদি কিছু ওদেরকে যত্ন করে খাইয়ে দিল। তারা শবুকে একটা উপহার দিয়ে খুশি মনে বিদায় নিল। বাসর ঘরে কড়ি খেলা আর সব আচার অনুষ্ঠান শেষে বর-কনেকে খাইয়ে ছাদের ঘরখানায় মেঝেয় পাতা ঢালা বিছানায় বসেছে বিবাহ বাসর। বরযাত্রী ও স্থানীয় নিমন্ত্রিতেরা খেয়ে দেয়ে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। বাড়ীর কোলাহল থেমে এসেছে। ঘরময় ছড়ান আছে বিয়ের নানা উপকরণ, দীপগাছায় জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ—বাসরের দীপ জ্বলবে সারারাত। শবুর বান্ধবী হীরা, সামন্তী, ঊর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, লাবণ্য শুভ-রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। বরের বাবা দাদারা চলে গেছেন, আর যারা বরের স্থানীয় বন্ধু ও অফিস বন্ধুরা এমন কি বরুণও চলে গেছে, তাদের পক্ষ থেকে বাসর জাগার মত কেউ নেই। জয়ন্ত কাকা ও রেবা কাকীমারাও চলে গেল। আছে শুধু দিদি, জামাইবাবু, শুভেন্দু ছাড়া ঽ তিনজন মাসতুতো

ভাই, মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই এলা বাবুলাল তপু পুটু ও শঙ্খ। ছোটগুলো সারাদিন হৈ হট্টগোলের পর এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল, মা কাকীমারা এসে তাদের তুলে নিয়ে যেতে লাগলেন নীচের ঘরে।

মিতু বলল নতুন বরকে—'মেজ জামাইবাবু, আপনি একটা গান করুন তো।'

বর বলল—'আমি গান জানিনা।'

মিতু নাছোড়বান্দা—'না, আপনি নিশ্চয়ই গান জানেন, গাইতে হবে।'

বর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—'হারমোনিয়ম না হলে গাইতে পারি না।'

মিতু বলল—'বেশ ত চালাক, দেখেছে হারমোনিয়ম নেই অমনি অজুহাত তুলেছে।'

দিদি বলল—'বেশ ত, খালি গলায়ই হোক না, একটু শুনি।'

অনেক সাধ্য সাধনার পর লাজুক গলায় বর গান ধরল 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে···'। সে রাতেও বুঝি আকাশে ছিল শুক্লা নবমীর চাঁদ। হেমন্তের রাত চাঁদের আলোয় রূপোলী মোহের আবরণ ছড়িয়েছে চারদিকে। অনুচ্চ স্বরে দু তিন লাইন গেয়েই থেমে গিয়ে বর বলল—

'সত্যি আমি ভাল গাইতে পারি না।'

দিদি বলল—'ভারি সুন্দর ত হচ্ছিল—হোক না।'

'না, না, আপনারা গান আমি শুনি।'

সুশীল মাঝখান থেকে ফুট কাটল—'গান শুনেই বোঝা গেছে এলেম আছে, তবে সে সব তোলা রইল চাঁদ-মুখের জন্য।' বলে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নতুন বরকেও একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। সিগারেটে টান দিয়ে বর বলল—

'দিদি, আপনি একটা গান করুন, শুনেছি আপনি ভাল গাইতে পারেন।'

মিতু বলে উঠল—'নিশ্চই মেজদি পাশ থেকে কানে কানে বলে দিয়েছে।'

দিদি গান ধরল, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর··'। সত্যি দিদিকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে—শরীরের যা অবস্থা। গান শেষ করে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে দিদি জামাইবাবু নীচে শুতে চলে গেল—দিদির শরীরটাত ভাল নেই। এবারে মিতু গাইল কয়েকটা বাংলা হিন্দি সিনেমার গান, শ্রীলা গাইল একটা ভজন—আজকাল সে নাচও শিখছে—ওড়িষি নৃত্য।

এবারে বর মিতুকে বলল—'এবার তোমার মেজদির গান শোনা যাক।'

শবু করুণ চোখে সবার দিকে চাইল—এই তার শেষ পরীক্ষা, যখন থেকে মিতু গানের বায়না তুলেছে তখনই সে জানে তার সামনে অগ্নিপরীক্ষা।

পদ্মিনী দেবী কাছেই কোথাও আড়ালে আড়ি পেতে ছিলেন, তাঁর ছেলে-মানুষি স্বভাব যাবার নয়। তিনি তাড়াতাড়ি এসে শেষে শবুকে উদ্ধার করলেন —বললেন—

'ও গান গাইতে জানেনা, বাবা। ছোট থাকতে স্কুলে গানের সঙ্গে অনেক নেচেছে। কিন্তু আমারও গলায় গান নেই, এই মেয়েও আমার গাইতে পারে না।'

মার হঠাৎ আগমনে বর এতক্ষণ জ্বলন্ত সিগারেট লুকোতে ব্যস্ত ছিল, বলে উঠল—

'তাতে কি হয়েছে? ঠিকই তো, সবাই কি সব জিনিষ পারে?' বলে আড়চোখে একবার শবুর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

মা বললেন—'সারাদিন অনেক ধকল গেছে, কাল আবার বাসি বিয়ের হোম যজ্ঞ আছে। রাত জেগে শরীর খারাপ করবে কেন, সবাই একটু ঘুমিয়ে নাও। এমনিতেই রাত দেড়টা দুটো হল বুঝি।' বলে ঘুমন্ত কানাইকে তুলে নিয়ে নীচে গেলেন।

মিতু বলল—'মার আদেশ শিরোধার্য্য, বরের বন্ধুরা থাকলে হৈ হৈ করে রাত জাগে, বড়দির বিয়েতে জেগেছিল। আসুন জামাইবাবু, আমরা এখানে যে যেমন পারি শুয়ে পড়ি।' নিজের শোবার ব্যবস্থা করতে করতে আবার বলল, 'জামাইবাবু, আপনি এবারে নাটক করলেন না কেন?'

'তুমি করলে না কেন?'

'মা বাবা বারণ করল যে।'

বর বলল—'আবারও মেয়ের পার্ট নিতে বলেছিল তাই নিই নি—সবাই ঠাট্টা করে। নিলে তোমার মেজদিও নিশ্চয়·।' শেষে নববধূর দিকে তাকিয়ে অন্যের কান বাঁচিয়ে হেসে বলল, 'খুব একটা মোক্ষম জবাব দিয়েছিলে সেদিন—সবাই কি সব জিনিষ পারে? এর ত কোন জবাব নেই।' বলে আলতো করে শবুর গালটা একটু টিপে দিল।

প্রথম স্পর্শে রাঙা হয়ে শবু মুখ লুকিয়ে বলল—

'হ্যা মশাই, অমন বেয়াড়া প্রশ্নের ঐ রকমই জবাব।'

এই প্রথম বর বধূর নিভৃত বাক্যালাপ।

চার

সকাল হল শয্যাতুলুনি অনুষ্ঠান দিয়ে, স্ত্রীআচারের সব অনুষ্ঠানই হওয়া চাই। বরের বড় ভাই হৃদিনাথ এসে বাসর জাগানীয়াদের পাওনা মিটিয়ে দিল। স্নানের পরে শুরু হল কুশণ্ডিকা, হোমযজ্ঞ—যার সব খরচ বরপক্ষের। ঋকবেদী হোম যজ্ঞ সারতে অনেক বেলা হল, অগ্নিসাক্ষী অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে কনের সিঁথিতে পড়ল সিঁদুর। এয়োরা উলু দিল, বরণ করল। কত রকম মন্ত্র পাঠ হল—'অনুষ্টুপ ছন্দ গায়ত্রী দেবতা', 'অগ্রহায়ণে মাসে' 'শুক্লেপক্ষে দশম্যাং তিথৌ', 'যদিদং হৃদয়ং মম'—কখন বাঁ হাতে কখন ডান হাতে কন্যাকে ছুঁয়ে চলতে লাগল বরের মন্ত্রোচ্চারণ ঠাকুর মশাইকে অনুসরণ করে। এক সময় হঠাৎ সকলের নজরে পড়ল বরের ডান হাতের অনামিকায় বিয়ের আংটি-টার উপরে একটা প্রজাপতি এসে বসেছে—এত নড়াচড়া হচ্ছে তবু উড়ে পালাচ্ছে না—প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী ছন্দঃ। সবাই বলল 'খুব শুভলক্ষণ—একেবারে প্রজাপতির নির্বন্ধ। স্বয়ং প্রজাপতি ঋষি প্রজাপতিরূপে বিবাহ যজ্ঞে উপস্থিত—তাঁর আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে। এ বিয়ে খুব সুখের হবে—মেয়ে জামাই সুখে ঘর করবে।'

সবই ভবিষ্যৎ—শবু ভাবে।

বাসি বিয়ে, বর ভোজন ইত্যাদি মিটতে সেই বিকেল হয়ে গেল। আর তখন থেকেই বাজতে লাগল বিদায়ের সুর। বরকনে রওনা হবে, জোড়ে যাবে মন্দিরে প্রণাম করতে। সেখান থেকে গিয়ে উঠবে বরের বাসাবাড়ীতে সন্ধ্যার পর। বাড়ীতে সব গোছগাছ আরম্ভ হয়ে গেছে। ঠাকুমা সামনে বসে আছেন, মা দুই কাকীমা ও দিদি বাক্স গোছাতে লাগলেন। ফুল শয্যার তত্ত্ব আলাদা করে রাখা হল, ওগুলো কাল দুপুরে যাবে। একটু একটু করে বাক্স ভরে উঠল শাড়ী কাপড়ে চোপড়ে, প্রসাধন দ্রব্যে, তেল সিঁদুর আলতা আয়না চিরুণীতে। ননদের বাক্স সাজানোই আছে। পাঁচখানা প্রণামী দেওয়া হল মেয়ের বাক্সে। থালা বাসন এমনকি সম্প্রদানের গাড়ু সব এক জায়গায় করা হল। সুশীল রামুদাকে নিয়ে বিছানা পত্তর বেঁধে একপাশে রাখল। আপাততঃ মিতু শ্রীলা নন্দু সঙ্গে যাবে। কানাই যাবে বায়না ধরেছে তাই সেও যাবে। ওরা সব নিজেদের সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক

ফাঁকে শবু গিয়ে রাজারানীকে খেতে দিয়ে আদর করে এল। আজ ত সে চলে যাবে, কাল থেকে কে ওদের দেখাশোনা করবে? মাকে বলল—

'মা, রাজারানীকে আবার রামুদাকে দিয়ে দিও।'

মা বললেন—'তাই হবে।'

এদিকে মেয়েমহলে সবার চোখ একটু একটু করে অশ্রুসজল হয়ে উঠল। শবু সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলে পর ছোটকাকীমা ও দিদি শবুকে সাজাতে বসেছেন। সেই অবসরে মা পদ্মিনী দেবী ঠাকুমা ও বড়মাসীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন জামাইয়ের সামনে গিয়ে বসলেন সেই ঘরেরই আর এক পাশে। পদ্মিনী দেবী জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

'বাবা দীনু, আমাদের স্বল্পায়ু জনম-দুখিনী মেয়ে শবুকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ও বড় স্নেহের কাঙাল। বড় অভিমানী। বাপ মাকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে যেতে যে কত কষ্ট হয় সে শুধু মেয়ে মানুষেই বোঝে। এটাই মেয়েদের ভাগ্য। আবার স্বামীর ঘর করতে পারা মেয়েদের পক্ষে শুধু ভাগ্যই নয়—সৌভাগ্য। আশা করি মেয়ে তোমাদের অনুপযুক্ত হবে না। যতটা সম্ভব একান্নবর্তী পরিবারের উপযুক্ত করে ওকে আমরা মানুষ করেছি। তবু কিছু দোষ ত্রুটি থেকে যায়—ভিন্ন পরিবারে রুচি চালচলনও হয় ভিন্ন প্রকারের। তুমি ত আমার মেয়েকে দেখে শুনেই নিয়েছ। যাঁরা এখনও দেখেন নি তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে তুমি ওকে সাহায্য কোরো। স্বামীর কর্তব্য হল স্ত্রীর দোষ ঢেকে গুণ প্রকাশ করা—অপরের শত প্রশংসাতেও কিছু যায় আসে না।

'মেয়ে আমাদের বড়ই লাজুক, বড় নির্বিরোধী। আজ পর্য্যন্ত ঘরেবাইরে ওর কোন শত্রু নেই, কারো সঙ্গে নেই ঝগড়া বিবাদ। ও বেশী কথাই বলতে পারে না। খেতে না পেলেও খেতে চাইবে না, আধপেটা খেলেও কিছু বলবে না। সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতে পারে। ওর মন বড় সরল আর খাঁটি। যার কাছে আদর আর ভালবাসা পাবে ও তারই সেবা করবে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু ওর মনটা বড়ই দুর্বল, বড় কোমল—এতটুকু অনাদর বা অবহেলায় ওর চোখে আসে জল।

'আর একটা কথা, বাবা। মা ষষ্ঠীর কাছে মানত করে ওকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। জন্মলগ্নের বিচারে ও নাকি স্বল্পায়ু—এখন যার ধন তিনি যতদিন বাঁচাবেন ততদিনই ওর পরমায়ু। এই ত, ওর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন ওর শাড়ীতে আগুন লেগে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। একটা ফাঁড়া কেটে

গেছে—জল আর আগুন থেকে ওকে সাবধানে রেখো।

'মেয়ে আমাদের কিছু লেখাপড়া শিখেছে, অবুঝ নয়, রাগী বা জেদীও নয়। নিজের মেয়ে বলে বলছিনা। ঐ কিন্তু মিতুর কথা হলে আমি এত জোরের সঙ্গে বলতে পারতাম না। ও আমাদের সব ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা। তোমাকে আর কি বলব, বাবা। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ—তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মেয়ের মন বুঝবে। তুমি ওর সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে নিও।' বলতে বলতে পদ্মিনী দেবী চোখে আঁচল দিয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই কথা বলতে ভুলে গেল। পাশে ঠাকুমা বড়মাসীও চোখের জল মুছতে থাকেন, ওপাশে চোখের জলে শবুর মুখের প্রসাধন সব বুঝি ধুয়ে যায়—কাকীমা দিদিও অশ্রুভরা চোখে আবার তাকে সাজাতে লাগেন।

বড়মাসী বললেন—'তুমি আমাদের জানাশোনা ঘরের ছেলে—তোমার বংশ পরিচয় খুব ভাল। আমাদের মেয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের সংসারে গিয়ে সুখী হবে।'

ঠাকুমা বললেন—'এ মেয়ে আমার নাতনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। তুমি উদার আর পরিশ্রমী। কত সহজে তুমি আমাদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলে। আমরাও তোমাকে ঠকাবার চেষ্টা করিনি। আমাদের আগের অবস্থা আর নেই। সাধ্য থাকলে এত সামান্য উপকরণে কি কেউ ঘরের মেয়েকে পরের হাতে তুলে দেয়? শুনেছি তোমাদেরও দেশভাগের পর দুর্ভোগ চলছে। এ দুর্যোগ নিশ্চয়ই কেটে যাবে, একদিন নিজেদের বাড়ী-ঘর হবে। সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করবে। আমাদের আশীর্বাদ তোমরা সব সময়ই পাবে।'

সকলের কথায় নতুন বর যেন অভিভূত হয়ে পড়ল, ধরা গলায় বলল—

'আপনাদের উপদেশ আর আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। এরকম পরিবার ও পরিবেশে যে আমার বিয়ে হবে কল্পনাও করিনি। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনাদের মেয়েকে সুখী করতে। তবু মানুষ তো তার স্বভাবের ঊর্ধে উঠতে পারেনা—আমার দোষ ত্রুটিও আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। আশীর্বাদ করবেন আমিও যেন আপনাদের মেয়ের উপযুক্ত হতে পারি।'

একই ঘরের মধ্যে কথা হচ্ছে, শবু সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পায়। শুনতে শুনতে সে ভেবে আকুল হয়—ও কেন অমন করে বলছে। শবুর কী গুণ

আছে? মা বলেন ধলীর কেবল ধলা গুণ আছে। লেখাপড়া সে এমন কিছু শেখেনি, গান গাইতে পারে না, বেশী কথা বলতে পারে না, রান্নাও জানে না। কি গুণে একটা মানুষ তাকে ভালবাসবে। মানুষটা কত বড়, লেখাপড়া শিখেছে, নিজে রোজগারপাতি করে, কি সুন্দর কথা বলে, কত উদার। সে কি করে এমন মানুষের উপযুক্ত হবে ভাবতে গিয়ে শবুর দুচোখ বেয়ে আবার জলের ধারা নেমে আসে।

মা পদ্মিনী দেবী শবুকে বললেন—'শুনেছি দীনুর মা কালই এখানে এসে গেছেন। আমরা কাল বিকেলে গিয়ে তোকে দেখে আসব, বেয়াই বেয়ান-দের সঙ্গেও দেখা করব। শাশুড়ী যা বলবেন—সব ঠিক ঠিক করবি, বাড়ীর সব নিয়ম কানুন জেনে নিবি। গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করবি, দেওর ননদদের আদর যত্ন করবি। সুবিধে অসুবিধের কথা শুধু দীনুকেই বলবি—সেই তোকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। ওর আর তোর ভাগ্য এখন থেকে এক।'

মা মেয়ের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বাইরে ভাড়া করা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। বরের বড়ভাই হৃদিনাথ এসে গিরিনবাবুকে বলল—

'মেয়ে জামাইকে এবার রওনা করে দিতে হয়।'

ঠাকুর মশাই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করলেন। মঙ্গলাচরণ সেরে মেয়ে জামাইকে সঙ্গে করে শাঁখ বাজিয়ে ও উলু দিতে দিতে সকলে এসে বাড়ীর গেটে পৌঁছল। এবার যে শবুকে পিতৃঋণ মাতৃঋণ শোধ করতে হবে ইঁদুরের মাটি ও কয়েকটি কড়ি দিয়ে। কি হৃদয়হীন এই অনুষ্ঠান! মা বাবার ঋণত শবু সারাজীবনেও শোধ করতে পারবে না। কেউ কি পারে?

একে একে ঠাকুমা বড়মাসী দুই কাকীমা দিদি জামাইবাবু ও কাকাদের শবু প্রণাম করল, ধাইমা হোতার মাকে করল আলিঙ্গন। এবার শবু দাঁড়াল তার পরম স্নেহশীল পরম শ্রদ্ধেয় বাবার সামনে মাথা নীচু করে—সেই ছোট্ট-বেলাকার শিশু শবুর মত, একদিন যাকে বাবা হাত ধরে বাইরের বারান্দার বেঞ্চের উপর বসিয়ে রেখে এসেছিলেন। সেদিনের শবু কথা বলতে পারেনি, ছিল প্রায় অবোধ, তার সঙ্গে মিশে ছিল বাবার ঘুম ভাঙিয়ে দেবার অপরাধ-বোধ। আজ ত সে কোন অপরাধ করেনি—তবু কেন তাকে এই স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে যেতে হচ্ছে? জন্মে থেকে ছেলে মেয়েরা বাবার সঙ্গে বেশী কথা বলার সুযোগ পায়নি—একটু দূরে দূরেই থেকেছে। নিজে বাবার সঙ্গে মোট কতবার কথা বলেছে শবু বোধহয় আজও তা গুণে বলতে পারে। তবু

কি বাবার স্নেহে আদরে আর শবুর শ্রদ্ধা ভক্তিতে কোন ঘাটতি আছে? লাজলজ্জা সরম সব কোথায় হারিয়ে যায়, আবেগে ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে, শরীর অবশ হয়ে আসছে, কোন রকমে শবু বাবার দুই পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সোহাগী মেয়ের মত বাবার বিশাল বুকে আছড়ে পড়ল, কেঁদে বলল—

'বাবা, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

বাবা গিরিনবাবু কান্নায় উদ্বেল হয়ে আত্মজা স্নেহের পুতলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অবাক বিস্ময়ে ও বেদনায় উপস্থিত সকলেই দেখল, পর্বতের মত অটল বিশালদেহ মানুষটা কেমন শিশুর মত কাঁদছে পথের ধারে এত লোকের মাঝখানে। এর আগে একবারই তিনি কেঁদেছিলেন ভাবুর অকাল বিয়োগে। এ বিদায় ত সে বিদায় নয়। তবে তিনি কেন এত উতলা হলেন? একি শুধুই স্নেহের টান না অবচেতন মনের কোন বেদনার আভাস! আস্তে আস্তে বাবা ও মেয়ে একটু শান্ত হতে বাবা শবুকে তার মার হাতে দিয়ে কান্না-ধরা গলায় শুধু বললেন—

'আমরা তো রইলাম।'

আর সব শেষে মাতৃবন্দনা। মা তাকালেন মেয়ের দিকে, আপন প্রতিচ্ছবির দিকে। মেয়ে চাইল মায়ের পানে, তার জীবনের ধ্রুবতারার পানে। দুজনে মুহূর্তের তরে তাকিয়ে উত্তাল আবেগে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। এবার কে কাকে সামলাবে? দুজনের মনের যত অকথিত ভাষা শ্রাবণের ধারার মত চার চোখ বেয়ে নামতে থাকে। সে জল বুঝি বর্ষার জলধারা, নদীর জলস্রোতকে হার মানায়। একমাত্র সাগরের বিশাল জলরাশির সঙ্গেই তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়—সাগরের জল যেমন লবণাক্ত ও অসীম, বেদনার অশ্রুধারাও তেমনি লবণাক্ত ও অজস্র। মার গলা জড়িয়ে ধরে শবু বলল—

'মা গো, তোমরা আমাকে ভুলে যেয়ো না।'

অনেক কষ্টে মা নিজেকে সংযত করে বললেন—

'পাগলী মেয়ে, মা কি কখনো মেয়েকে ভুলতে পারে? অত কাঁদে না, এতে অমঙ্গল হয়। নে আমাকে প্রণাম কর। প্রণাম করে বাকি স্ত্রীআচারটুকু সেরে দীনুর হাত ধরে হাসিমুখে রওনা হ'। এখন থেকে তোর সব ভার দীনুর উপর।'

শবু কোনরকমে মাকে প্রণাম করে স্ত্রী-আচারটুকু সেরে অবশ শিথিল দেহে মা কাকীমা ও দিদির সাহায্যে গাড়ীতে উঠে বসল। গুরুজনদের প্রণাম করে বরও এসে তার একপাশে বসল আর একপাশে বসল মিতু ও শ্রীলা। নন্দ

কানাই বসেছে সামনের সীটে হৃদিনাথের পাশে। শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে গাড়ী চলতে আরম্ভ করার মুখে শবু শেষবারের মত আত্মীয় স্বজনদের অশ্রু-সজল মুখগুলির মধ্যে মা ও বাবাকে দেখে নিল। গাড়ী চলতে লাগল। শবু মনে মনে মাকে ডাকে—মা গো, আমাকে তুমি ভুলে যেয়োনা, যদি কখনও ঘোর বিপদে পড়ে তোমাকে ডাকি. তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়ো মা গো। —শবুর আকুল প্রার্থনা বুঝি ভগবানের কাছেও পৌছায়।

সামনে মন্দির দেখা যাচ্ছে। মন্দিরে প্রণাম করে আবার গাড়ীতে এক সময় শবু তার বরের সঙ্গে গিয়ে পৌছল তার বাসা বাড়ীতে, আপাতত শবুর শ্বশুর বাড়ী।

পাঁচ

ভিক্টরদের ভাড়াবাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। গেটের উপর লাল কাগজ কেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'শুভ বিবাহ—স্বাগতম্' আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। অভ্যর্থনা, বধূবরণ এসব দিকে শবুর মন নেই—এক নতুন পরিবেশে অপরিচিতদের মধ্যে ভিক্টরদের বাড়ীর গৃহিণী শৈলদেবী, পাশের অপর বাসিন্দা সরকার কাকীমাকে দেখতে পেয়ে তার ভাল লাগছে। শৈলকাকীমা সরকার-কাকীমা মার বন্ধুস্থানীয়া · তাঁরা যেন মায়েরই প্রতিমূর্ত্তি।

বীণাদেবীর সঙ্গে কটক থেকে আসা মেয়েটি বরের বোনের ভূমিকা নিয়ে জল দিয়ে শবুর পা ধুয়ে দিল। শাশুড়ী ঠাকরুন ও বীণা দেবী বধূবরণ করলেন বরণডালা হাতে নিয়ে। শাশুড়ী একটা সোনার আংটি শবুর আঙুলে পরিয়ে ধান দূর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—শবু নিষ্ঠা সহকারে তাঁকে প্রণাম করল। শ্বশুর মশাই কিছু রূপোর টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে ধানদূর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করতে শবু তাঁকেও প্রণাম করল ভক্তিভরে। এরপর হৃদিনাথ ও বীণাদেবী আশীর্বাদ করলে এখানকার ছাদনাতলার কাজ শেষ হল—নববধূকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসান হল।

বর দীননাথ অনুষ্ঠান শেষ হতে অন্য কাজে লেগে গেল। শৈলকাকীমা ও সরকার কাকীমা শবুর সঙ্গে কিছু কথা বলে পাশেই তাঁদের নিজনিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। এখন শবুর পাশে রয়েছে মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই, দুই

মেয়ে সহ বীণাদেবী ও কটকের মেয়েটি। একটু পরেই সুনীল এসে শবুর সঙ্গে খানিক গল্পকরে মিষ্টি মুখ করে মিতু কানাইদের নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। বড়জা বীণা ও কটক থেকে আসা মেয়েটি শবুর সঙ্গে এখন কথা বলছে। বড়জার বড় মেয়েটির বয়স প্রায় বছর পাঁচেক, নাম রেখেছে স্বর্ণা। দ্বিতীয় মেয়েটি দু বছরের নাম—সুবর্ণা।

আজ কালরাত্রি, কাল দুপুরে বৌভাত, রাতে ফুলশয্যা। দীননাথকে বেশী দেখা যাচ্ছে না। সে খুব ব্যস্ত—বৌভাতের সব ব্যবস্থা তাকে করতে হচ্ছে। শাশুড়ী ঠাকরুনকেও বেশী দেখা যাচ্ছে না—তিনি সদাব্যস্ত, মাঝে মাঝে শুধু তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বরুণ এখানেও হাজির, সে অফিসের আরো কয়েকজনকে নিয়ে কালকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছে। আর মাঝে মাঝে একটা গ্রামোফোনে চাবি দিয়ে কয়েকটা গানের রেকর্ড বাজাচ্ছে। আজ আর শবুর করণীয় কিছু নেই। মেয়ের বাক্সে পুঁটুলি করে পাঠানো শুকনো খাবার খেয়ে জল খেয়ে বড়জার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে পড়া। কাল দুপুরে বৌভাতে সবাইকে খাইয়ে স্বামী দীননাথ তাকে নিজে হাতে ভাতের থালা ধরে দিলে তবে বউ খাবে এবাড়ীর ভাত।

পরদিন রবিবার, সামান্য কিছু স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠান হল, দুপুরে নিমন্ত্রতেরা এসে খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। উপহারের তেমন বাহুল্য নেই, অফিসের লোকেরা একটা প্রসাধনের কাস্কেট, একটা সোনার আংটি ও একটা টী-সেট দিয়েছে—বরুণ আলাদাভাবে একটা মোটা গল্পের বই দিয়েছে। দীননাথের কজন বন্ধু, অফিসের লোকেরা—শবুর অচেনা। চেনাজানার মধ্যে শৈল কাকীমা, সরকার কাকীমা তাদের ছেলে মেয়েরা, জয়ন্ত কাকা ও রেবা কাকীমা, শুভেন্দুদারা কভাই। আর দিদি জামাইবাবু সহ শবুর ভাইবোনেরা, বড়কাকা ছোটকাকা। খাবার পরে তপু শঙ্খ পুটু শবুর পাশে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নন্দু কানাই তাদের বন্ধু ভিক্টরের সঙ্গে সারা বাড়ী ঘুরে দেখছে। আর সব ভাইবোন দিদি জামাইবাবুরা শবু ও বীণার সঙ্গে গল্প করছে। বড়কাকা ছোটকাকা বেয়াই মশাই ও হৃদিনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বেয়ানকে নমস্কার জানিয়ে শবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শবু সব সময় পথ চেয়ে আছে কখন মা আসবে।

সন্ধ্যার মুখে এসে পৌঁছলেন মা পদ্মিনী দেবী সঙ্গে দুই কাকীমা। শবুর মনে আনন্দ আর ধরেনা, তবু শশুরবাড়ী ত বেশী উচ্ছ্বাস দেখান বোধ হয়

ঠিক না। মা কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বলে বীণাকে বললেন—

'চল, বেয়ান ঠাকরুনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

বীণা তাঁদেরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। প্রথানুযায়ী নমস্কার বিনিময় ও কুশল প্রশ্নাদি সেরে দেশ ঘরের কথা হতে লাগল। শেষে পদ্মিনী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—

'বেয়ানদিদি, আমাদের মেয়ে আপনাদের পছন্দ হয়েছে?'

বেয়ান ঠাকরুন নিরাসক্তভাবে জবাব দিলেন—

'আমাদের পছন্দ অপছন্দের আর কি আছে? ছেলে ঘর করবে তার পছন্দ হলেই হল।'

জবাব শুনে সবারই কেমন অস্বস্তি লাগে। পদ্মিনী দেবী আবার বললেন—

'তবু আপনারই ত ছেলের বৌ, আপনি ওকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে আপনাদের পছন্দমত করে নেবেন। মেয়ে আমার সকলের খুব বাধ্য।'

বেয়ান ঠাকরুন বললেন—'ওরা ত এখন এখানেই থাকবে। যখন এক সংসারে যাবে তখন শেখানো পড়ানো যাবে।'

আর কি কথা বলা যায়? তিন জায়ে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে 'আচ্ছা, আমরা তবে আসি এখন' বলে উঠে দাঁড়াতে বেয়ান ঠাকরুন বীণাকে ডেকে বললেন—

'বড়বৌমা, এদের একটু চা মিষ্টি খাওয়াও ওঘরে নিয়ে বসিয়ে।'

আবার সকলে এসে শবুর কাছে বসল। বীণা সকলকে মিষ্টি খেতে দিল চা এনে দিল। বেশ কিছুক্ষণ শবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে যথাযথ উপদেশ দিয়ে, বেয়াই মশাইকে নমস্কার জানিয়ে মা কাকীমারা ফিরে চললেন। দিদি জামাইবাবু ভাইবোনরাও সব চলল। শবু ও বীণা রাস্তার ধার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বেয়াই মশাই, হৃদিনাথ ও দীননাথও রাস্তা পর্য্যন্ত এল এগিয়ে দিতে।

ছোটকাকীমা যাবার আগে শবুকে আলাদা করে চুপি চুপি বললেন—'আজ ফুলশয্যার রাত—ভাল হয়ে শুবি।'

'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে'—না হলে কাকীমা এমন কথা বলে? লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে শবুর মুখ—এই কাকীমাই প্রথম বিয়ে হয়ে এসে শবুকে পাঁচ বছর বয়সের সময় দলা করে ভাত মুখে ঠেলে দিয়ে দিয়ে ভাত খাওয়া ধরিয়েছিল, এখন হঠাৎই যেন শবু সমবয়সী হয়ে উঠেছে।

মা আর সবাই চলে যেতে শবুর মন খারাপ হয়ে গেল। ছোটকাকীমা

আবার কি যেন বলে গেল—ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু শরীরে মনে কেমন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে থেকে থেকে। বড়জা বীণার তত্বাবধানে ফুলশয্যা পাতা হল। এক নতুন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রাত কেটে গিয়ে আবার এক সকাল হল। জীবন এক নতুন রূপ রস বর্ণ নিয়ে শবুর সামনে দেখা দিল।

সকালে উঠে শবু সবে স্নান সেরে নিয়েছে, শাশুড়ী ঠাকরুন দীবনাথকে ডেকে বললেন—

'দীনু, আমি আজ দশটার গাড়ীতেই কলকাতা যাব। ননদের বাক্স প্রণামীর জিনিষপত্র সব এখানেই থাক। ওসব ঝামেলা আমার পোষাবে না। বিশ্ব ত আবার যা বদমেজাজী, তাকে ত কিছু জানানো হয়নি। এসব বিয়ের জিনিষপত্তর দেখলে নিশ্চয়ই একটা অনর্থ বাধাবে। নতুন বৌ যখন কলকাতায় যাবে তখন সঙ্গে নিয়ে যায় যেন। বড়বৌমা, তুমি তোমার প্রণামীটা নিয়ে নিও। আর শোন, অষ্টমঙ্গলের অনুষ্ঠান এখানে কে কিভাবে করবে জানি না, আমি বরং আজই সে সব সেরে দিয়ে যাচ্ছি।'

বড়বৌ বীণাকে সঙ্গে করে তিনি নিজেই সব আচার অনুষ্ঠান সেরে বর-কনের হাতের পায়ের মঙ্গলসূত্র কেটে ছাদনা তলার মঙ্গল পুকুরে ভাসিয়ে দিলেন, জোড়ের বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে সামান্য দু একটা কাপড় চোপড়ের একটা পুঁটলি বানিয়ে হাতে করে রওনা হলেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে। বড় ছেলে রিক্সা করে সঙ্গে গেল স্টেশনে উঠিয়ে দিতে। যাবার আগে বীণা ও শবু আভূমি নত হয়ে শাশুড়ীকে প্রণাম করল। দীননাথ মাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে এসে খেয়ে অফিসে ছুটল—আজই তার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। দুতিনটে বাড়ী পরেই সমুদ্রের ধারে তার অফিস।

শবু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল—আচ্ছা, শাশুড়ী ঠাকরুন ত চলে গেলেন। কিন্তু একবারও শ্বশুর-মশাইয়ের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা গেল না, যাবার সময় প্রণামও করে গেলেন না। শুধু যাবার সময় কেন শবু ত প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হল এ বাড়ীতে এসেছে তার মধ্যে একবারও তাঁদের মধ্যে কথা বার্ত্তা হতে দেখা যায়নি। নাতনী দুটোকে একবারও আদর করতে দেখেনি। শবুকেও বধূবরণ করা থেকে তাঁর চলে যাওয়া পর্য্যন্ত কোন কথা বলেননি শুধু অনুষ্ঠানাদির সময় যেটুকু দরকার সেটুকু ছাড়া। কথা যে একেবারে বলেন না তাও নয়। শবুর শাশুড়ী আজই চলে যাচ্ছেন খবর পেয়ে বাবা গিরিন-

বাবু এসে দেখা করে গেছেন, সে সময় 'বেয়াই মশাই' 'বেয়াই মশাই' বলে তাঁকে বেশ হেসে কথা বলতে দেখা গেছে। বাড়ীর কাজ কর্মেও তাঁর গলা ভালই শোনা গেছে। কিন্তু শবু, মা-কাকীমা আর শ্বশুর মশাই এর বেলায় কেমন যেন অন্য রকম। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ত!

বিকেলে দীননাথ অফিস থেকে ফিরলে হৃদিনাথ বলল—

'দীনু, আজ রাতের গাড়ীতে আমি কটক যাচ্ছি, কাল থেকে আমার অফিস। বাবা, আপনি ত এখানে কিছুদিন আছেন, এরা এখানেই রইল, তিন চারদিন পরে এরা যেন দুপুরের গাড়ীতে কটক রওনা হয়। বাসা স্টেশনের পাশেই, নিজেরাই যেতে পারবে।'

রাতের খাওয়া খেয়ে হৃদিনাথ স্ত্রীকে মেয়েদের দিকে নজর রাখতে বলে, একা একা যেন সমুদ্রের দিকে না যায় সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে শেষে শবুকে বলল—

'বৌমা, আমি তাহলে চললাম, এরা কদিন রইল, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

শবু দূর থেকে মাটি ছুঁয়ে বড় ভাসুরকে প্রণাম করল, সঙ্গে উপস্থিত শ্বশুর ও বড়জাকেও। বাবাকে প্রণাম করে হৃদিনাথ মেয়ে দুটোকে আদর করে রিক্সায় গিয়ে উঠল। বীণা স্বামীকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যত্ন নিতে বলতে বলতে রিক্সা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল, সঙ্গে দুই মেয়ে, কটকের মেয়েটি, শবু ও দীননাথ। হৃদিনাথ চলে গেল।

ঘরে ফিরে বীণা বলল—

'যাক বাবা, দুই গোমড়া মুখো—শাশুড়ী আর সোয়ামী—চলে গেছে, এখন আমরা কদিন বেশ হেসে গল্প করে মজা করে কাটাব। বাবাকে কোন ভয় নেই। কাল সকালেই আমরা বেশ সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োতে যাব, কি বল ঠাকুরপো?' বলে মনের আনন্দে হাসতে লাগল।

দীননাথ বলল—'বৌদি, রাস্তাটা পার হলেই ত সমুদ্র, বেশী দূর যেতে হবে না।'

বাবা বললেন—'আমার মাছ তরকারিতে যেন তেল মশলা বেশী না দেওয়া হয়। বেশী তেল মশলা পেটে সহ্য হয় না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

ভিক্টরদের বাড়ীটা একেবারে সমুদ্রের ধারে, সামনে রাস্তা তারপর বিশ পঁচিশ গজ ঢালু বালির পাড় গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। বড়জা, তার দুই মেয়ে আর কটকের মেয়েটি আগে কখনও সমুদ্র দেখেনি। তারা সবাই খুব খুশি। খুব ভোরে উঠে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে ঝিনুক খুঁজে নিয়ে আসে, দুপুরে জেলেদের সাহায্যে সমুদ্রে স্নান করে, বিকেলে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ায়, বালির উপর ছুটোছুটি করে, বালির পাহাড় বানায়, বালি খুঁড়ে জল বের করে, জেলেদের মাছধরা দেখে। শবুরও ভাল লাগে, কিন্তু নিজে কখনও সমুদ্রে নামে না। সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

ঘরে বসে রান্না খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বীণা খুব মজার মজার গল্প করে, সিনেমার গল্প করে—একাই হেসে নেচে গল্প করে একেবারে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। শ্বশুর মশাই সকালে বিকেলে গিরিনবাবুর ডাক্তারখানায় গিয়ে গল্প করে আসেন। বাসায় যতক্ষণ থাকেন, নাতনীদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন, একটা খবরের কাগজ পেলে বিনা চশমাতে চোখের কাছে ধরে খুঁটিয়ে পড়তে থাকেন, মাঝে মাঝে বীণার উচ্চকিত হাসিতে বলে ওঠেন—

'বড়বৌমার দেখ কেবল গল্প আর হাসি, একেবারেই পাগল'—কণ্ঠে তাঁর প্রশ্রয়ের সুর ঝরে।

বীণা শ্বশুরের কান বাঁচিয়ে বলে—'হেসে নিই ভাই যতদিন পারি, কতদিন বাঁচি তার ত ঠিক নাই।'

কানাই নন্দু মিতু শ্রীলারা সকাল বিকেল যখন সময় পায় এসে মেজদিকে দেখে যায় গল্প করে, সুপর্ণাদের সঙ্গে খেলা করে। শবু ওদের কাছে মা বাবা ঠাকুমার খবর নেয়, ওর জন্য কারো মন খারাপ লাগছে কিনা জানতে চায়। দিদি-জামাইবাবুও একদিন বিকেলে এসে সবার সঙ্গে গল্প গুজব করে গেল।

সব চাইতে ভাল লাগে রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়লে দীননাথ আর শবু যখন দোতলার বারান্দায় দুটো চেয়ার পেতে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেকরাত অবধি বসে থাকে। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ, সামনে পূর্ণিমা। হেমন্তের

সুন্দর ঝকঝকে আকাশে চাঁদ ঝলমল করে। একটু দূরেই সমুদ্রের ছোট-ছোট ঢেউগুলো বারবার পাড়ে এসে পড়ে, সাদা ফেনাগুলো সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়। ঢেউয়ের মাথায় সমুদ্রের জলে ফস্‌ফোরাস ঝিলিক দেয়। চাঁদ যে দিকে আছে সেদিক বরাবর একটা লম্বা রেখায় চাঁদের আলো ঝিকমিক করে—যেন হাজার তারার রূপালী এক ছায়াপথ। শীত প্রায় এসে গেছে, দক্ষিণা বাতাসের দাপট কমে এসেছে। পাশাপাশি হাতে হাত রেখে অনেক রাত অবধি খোলা বারান্দায় বসেই কেটে যায়। আদরে সোহাগে জীবনটাকে বড় মধুময় মনে হয়, আনন্দের এক নতুন অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে, কথা যায় হারিয়ে। নববিবাহিত দম্পতির পক্ষে এ এক আদর্শ পরিবেশ। অনেক রাতে নীচে নেমে দুজনে শুতে যায়। পাশের ঘরে বড়জা মেয়েদের নিয়ে তত-ক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদ মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে গেছে, জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

চতুর্থ দিন দুপুরে বড়জা দুই মেয়ে ও কটকের মেয়েটিকে নিয়ে কটক রওনা হয়ে গেল। শ্বশুর মশাই তাদেরকে স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। এদিকে সামনে শবুর টেস্ট পরীক্ষা। দশ বারোখানা ঘর নিয়ে এত বড় বাড়ীতে মাত্র দু তিনটে প্রাণী থাকতে অসুবিধে লাগে, ভয় ভয় করে। দীননাথ অফিস থেকে ফিরে বলল শবুকে—

‘এ বাসাটা বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য নিয়েছিলাম—শেষ অনুষ্ঠান অষ্টমঙ্গল ত মা মিটিয়েই দিয়ে গেছে। এত বড় বাড়ীতে থাকার আর মানে হয়না। তোমার ত সামনে টেস্ট পরীক্ষা, তোমাকে কাল সকালে ও-বাড়ীতে রেখে আসি, পরীক্ষার পড়াশুনা কর। ততদিন বাবা আর আমি আমার অফিসের চিলে কোঠার ঘরে কাটিয়ে দেব আর একটা ভাল দেখে বাসাও খুঁজে নেব। আমি আমার আগের হোটেলেই খাব, বাবাকে দুবেলা মন্দিরের প্রসাদ আনিয়ে দেব।’

দীননাথ তার বাবাকে কথাটা বলতে তিনিও কোন আপত্তি করলেন না। এদিকে শবু পড়ে গেল মহা দোটানায়—বাপের বাড়ী যাবে এতে কোন মেয়েরই বা আপত্তি? তার উপর রান্না খাবার ব্যাপার আছে, বড়জা থাকাতে এ ক’দিন কোন রকমে কেটে গেছে। কাল থেকে যদি শবুকে রান্না করতে হয় পারবে কি? কিছুই ত জানে না, তার উপরে শ্বশুর মশাই আছেন, তাঁর আবার বিশেষ ধরনের রান্না চাই। সেদিক থেকে বাপের বাড়ী গেলে

আপাতত সে নিশ্চিন্ত, এই অবসরে মার কাছে দু চারটে রান্নাও শিখে নেওয়া যাবে।

কিন্তু ঐ যে পরীক্ষার কথা বলছে। মনের বর্ত্তমান অবস্থায় পড়াশুনা কি ভাল লাগে, আর পড়েই বা কি হবে? পরীক্ষা দিতে গেলে একগাদা ফী দিতে হবে। বাবার অবস্থার কথা সে জানে, নিশ্চয়ই এই বিয়েতে আবার কিছু ধার দেনায় পড়ে গেছেন। এখানেও কথাবার্ত্তা শুনে বোঝা যায় আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ। যদি ফেল করে, এতগুলো টাকা জলে যাবে। দেখা যাক, ওবাড়ীতে গিয়ে মার সঙ্গে কথা বলে যা হয় ঠিক করা যাবে।

পরদিন সকালে কিছু জিনিষপত্তর অফিসের ঘরে পাঠিয়ে বাবাকে সেখানে রেখে দীননাথ বাক্স বিছানা সহ শবুকে নিয়ে চলল তার বাপের বাড়ীতে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হতে বাড়ীর সবাই যেমন আশ্চর্য্য হল, খুশি হল তেমনি। দীননাথের অফিস আছে বলে চলে গেল, মা তাকে রাতে এসে খেয়ে যেতে বললেন। বিয়ের পর মেয়ে জামাই প্রথম এসেছে, না খাওয়ালে ভাল দেখায় না। সারাদিন মার সঙ্গে কথা বলে শবুর কথা আর ফুরায় না।

ছোটকাকীমারা ভুবনেশ্বর চলে গেছেন। শবু এসেছে খবর পেয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ঠাকুমা বড় কাকীমা শঙ্খকে নিয়ে এলেন, মা ও দিদি ত আছেই। সবাই শবুর এ ক'দিনের শ্বশুর বাড়ীর অভিজ্ঞতা জানতে চান। শবু তার শাশুড়ীর সব উদ্ভট আচরণের কথা বলল। মা কাকীমারাও সেদিন সন্ধ্যায় কিছু নমুনা পেয়ে এসেছিলেন। ঠাকুমা শুনে মন্তব্য করলেন—

'ঠাকরুনের বোধ হয় তোর শ্বশুরের সঙ্গে গোসা চলছে। তা ওরকম হয় স্বামী স্ত্রীতে, আবার পরে সব ঠিক হয়ে যায়।'

শবু বলল—'জানো মা, আমার বড়জাকে শাশুড়ীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে বলল, আগে ঘর কর পরে বুঝবে। তার প্রথম ছেলেটা হয়ে মারা যাবার কারণ নাকি উনি।'

শুনে সবাই তাজ্জব বনে গেল, এও কি সম্ভব! বীণাই বা মিথ্যা বলবে কেন? মা অনেক ভেবে বললেন—

'এখন ত তোকে ওখানে যেতে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে গেলে বুঝেশুনে কটা দিন কাটিয়ে দিলেই হবে।'

বাবা গিরিনবাবু ঘরে খাটের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, বললেন—

'বেয়াই মশাই ত রোজ দুবেলা আমার ডাক্তারখানায় এসে বসেন, কত গল্প করেন, যাবার সময় আগের দিনের পুরোনো খবরের কাগজটা পড়তে নিয়ে

যান আবার পর দিন ফিরিয়ে দিয়ে যান। একেবারে মাটির মানুষ।'

শবু তাড়াতাড়ি বলল—'হ্যাঁ মা, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। সব সময় 'সেজ বৌমা' 'সেজ বৌমা' মুখে লেগেই আছে!'

ঠাকুমা বললেন—'শ্বশুরের মন পাওয়া সহজ, শাশুড়ীই হল শক্ত ঠাঁই। যার ভাগ্যে যেমন জোটে।'

ভাগ্য এক নিরাকার নিরবয়ব নিরবলম্ব আধার, সেখানে আঁটাতে চাইলে সব কিছুই এঁটে যায়। মনটা সবারই খুঁতখুঁত করে, বিশেষ করে আধ-খেচড়া অসময়ের অষ্টমঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য—ফল কি ভাল হবে?

শবু মাকে জিজ্ঞেস করল—'মা, রাজা রানীকে রামুদাকে দিয়ে দিয়েছ?'

মা বললেন—'হ্যাঁ, রামুকাকা আবার ও দুটো নিয়ে গেছে।'

'আর যাই মা?'

মা বললেন—'রামুকাকাকে ধুতি দিয়েছি, ঘাসউলী হোতার মাকে দুখানা শাড়ী আর একজোড়া রূপোর বালা দিয়েছি ছেলের বৌ এর জন্য। আর বরুণকে দিয়েছি একখানা ধুতি—ঘটক বিদায়। সে ত নেবেই না, অনেক কষ্টে গছিয়েছি।'

অষ্টমঙ্গলের পরে মেয়ে জামাইয়ের জোড়ে ফিরুনী আসা যাকে বলে তা ঠিক হল না। কিন্তু রোজ দীননাথের আসা যাওয়া চলছে। মা বলে দিয়েছেন—

'বাবা দীনু, হোটেলে খাচ্ছ, সে খাওয়া কি ভাল হয়? বেয়াই মশাই মন্দিরের প্রসাদ খাচ্ছেন দুবেলা সেটাও ভাল লাগেনা। কিন্তু তাঁকে এখানে খেতে বলতে সঙ্কোচ হয়, যদি কিছু মনে করেন। তা এখানে আমার বড় মেয়ে জামাই আছে, তুমি রোজ রাতের খাবার আমাদের এখানেই খাবে। বড় জামাই চলে গেলে পরে যা হয় হবে।'

আর রোজ রাতে খেতে এলে মা আর মেজোজামাইকে তার ডেরায় যেতে দেননা, পাশের বাড়ীর একখানি ঘর চেয়ে রেখেছেন সেখানেই মেয়ে জামাইকে শুতে দেন। ফলে শবুর পড়াশুনা মাথায় উঠেছে। এদিকে বাড়ীতে জামাই-বাবু আছে, বলে—

'শবু, আর পড়ে কি হবে, আই এ পাশ করার আগেই ত বিয়ে পাশ করে গেছ, আর মিছিমিছি কষ্ট করে কি হবে?'

এ ভাবে কতদিন চলত বলা যায় না। কিন্তু তৃতীয় রাতে সুশীলের একটা কথায় দীননাথ বুঝি মনঃক্ষুন্ন হল।

সুশীল ঠাট্টা করে বলল—

'মশাই, বিয়ে করার আগে বাসা ঠিক করতে হয়।'

দীননাথও ঠাট্টার সুরেই জবাব দিল—'ঘর ত আমার আছে, অফিসের চিলে কোঠায় সমুদ্রের ধারে আমার দু টাকার যে ঘর আছে তা দুশ টাকায়ও পাবেন না।'

সে শবুকে তার ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিল। যে কয়দিন ভাল বাসা না পাচ্ছে কষ্টেসৃষ্টে ঐ চিলে কোঠার ঘরেই কাটিয়ে দিত, অফিস টাইমে একতলায় অফিস বসে তাইতে যা অসুবিধে। এখন বাবা এখানে আছেন, হয়ত মাসখানেক থাকবেন। এদিকে শবুরও সামনে পরীক্ষা তাই সাময়িক এই ব্যবস্থা।

সে রাতে দীননাথ শবুকে জিজ্ঞেস করল—'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

শবু আগেই ভেবে রেখেছিল পরীক্ষা দেবেনা, দিলে ত নিশ্চয়ই ফেল করবে। বলল—

'কই আর হচ্ছে, আমার পড়তে আর ভাল লাগছে না।'

দীননাথ আর কিছু বলল না।

পরদিন দুপুরে টিফিনের সময় এসে দীননাথ খবর দিয়ে গেল দুর্গাবাড়ীর কাছে 'রাধাকুটীর' বাড়ীতে ঘর ঠিক হয়েছে মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায়। বিকেলে এসে মালপত্র নিয়ে যাবে, এখন সেখানে ঘরদোর পরিষ্কার করা হচ্ছে। আর রাতে এখানে খাওয়া সেরে শবুকে নিয়ে যাবে—আজ থেকেই ওদের রাধাকুটীরে বাস। কাল থেকে ওখানেই শবুর রান্না ও ঘর—গৃহস্থালীর পরীক্ষা।

এ বাড়ীর সবাই বাড়ীটা চেনে। মিতু বলল—

'মেজদির খুব মজা হবে, ওর তিনচারটা বাড়ী পরেই হীরাদিদের ভাড়া বাড়ী।'

দীননাথ সাইকেলে এসেছিল আবার সাইকেলে চেপে চলে গেল। শবুর মাথায় এখন হীরার চাইতে রান্নার চিন্তা বড়। তাকে যে এখন কলেজের পরীক্ষার বদলে রান্নার পরীক্ষা দিতে হবে। সব চাইতে মুস্কিলের ব্যাপার হল স্বয়ং শ্বশুর মশাই বর্ত্তমান।

মা আশ্বাস দিয়ে বললেন—'কিছু ভাবিসনা। যতদূর মনে হচ্ছে ঐ বাড়ীরই একটা অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া আর আভা ভাড়া থাকে। আর এক বিধবা চাটুয্যে গিন্নীও থাকে যার এক ছেলে কলকাতায় সিনেমা টিনেমা করে। আমি

সুবিধে মত গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসব। হাতের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া আর চাটুয্যে গিন্নীর সাহায্য পাবি। ভয় কি?'

ভরসা কতটুকু তাই বা কে জানে? আবার গোছগাছ শুরু হল, আর কঘণ্টা পরেই যেতে হবে। না, এখন আর শবুর কান্না পাচ্ছেনা তেমন। বেশী দূরে যাওয়া ত নয়।

দুই

এবারে শুরু হয়েছে শবুর দস্তুরমত রান্না— রান্না, স্কুলের পরীক্ষার শখের রান্না নয়—রীতিমত হাতাখুন্তি হাঁড়িকড়াই থালাবাসন ঘটিবাটি মাছ তরকারি মশলাপাতি শিলনোড়া বঁটি নিয়ে পুরোদস্তুর ঘরকন্না। ওদের পরিচিত এক ঝি হারার মাকে পাওয়া গেছে, সেই সব বাইরের কাজ, মশলা বাঁটা, মাছকোটা কিসে কি মশলা লাগবে ঠিক করে দেয়া, দূর থেকে যতটা সম্ভব রান্না দেখিয়ে দেয়া (পেঁয়াজ রসুন চলবে না, শ্বশুর মশাই খান না), বাসন মাজা রান্নাঘর পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিয়েছে। তবু মাঝে মাঝেই ছুটে যেতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়াদি আর চাটুয্যে গিন্নীর কাছে। যার কাছে শুনে দেখে এ কয়দিনে একখানা খাতা ভরে লিখে এনেছে রান্নার বিবিধ ফরমূলা। সব মশলার কৌটোয় লেবেল লাগানো হয়েছে—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই।

প্রথম দিন বিষ্ণুপ্রিয়াদি শবুকে দেখে বলল—

'ওমা, তুই নতুন বউ হয়ে এসেছিস? সবাই বলে এক ভদ্রলোকের নতুন বিয়ে হয়েছে সে নতুন বউ নিয়ে এ বাড়ীতে ভাড়া আসছে। শেষে দেখি আমাদেরই স্কুলের মেয়ে শবু বউ হয়ে এসেছে।'

চাটুয্যে গিন্নীর রান্নাঘর শবুর রান্না ঘরের পাশেই, তিনিও প্রয়োজনে দেখিয়ে শুনিয়ে দেন।

কিন্তু সব বৃথা। রোজ দুপুরে খেয়ে উঠে শ্বশুর মশাই মুখশুদ্ধি চিবোতে চিবোতে মৃদু হেসে বলল—

'একেবারে আনকোরা হাত, বেয়ান ঠাকরুন মেয়েকে রান্না শেখান নি।' কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আস্তে আস্তে চলে যান অফিসের চিলেকোঠার ঘরে বিশ্রাম করতে।

এখানে মাত্র একখানা ঘর শোয়া বসার। ঘরখানা অবশ্য মস্ত বড়, তিন

দিকে বড় বড় কাঁচের জানালা, তিনদিকে চওড়া বারান্দা প্রচুর আলো হাওয়া। কোনদিন খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হলে শ্বশুর মশাই খেয়ে উঠে চেয়ারে বসে গল্প করতে থাকেন। সেদিন তাঁকে গল্পে পেয়ে বসে। বলেন নিজেদের অতীতের কথা, বর্ত্তমান অবস্থার কথা। শবু শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায়। শবুর যে তখনও খাওয়া হয়নি সেদিকে কারও হুঁস থাকে না। শবুরও কিছু খারাপ লাগে না। কি সুন্দর নিরভিমান নিরহংকার সরল সাদাসিধে মানুষটি—দু চোখ বুজে মৃদুস্বরে কথা বলেন। শবু নিজের বাবার সঙ্গে বেশী কথা বলার সুযোগ পায়নি। ভগবান তার সে অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। বাবা ঠিকই বলেছেন, একেবারে মাটির মানুষ তার এই বাবা। হঠাৎই চমক ভেঙে শ্বশুর মশাই বলেন—

'ও হো, বৌমা, তোমার ত বুঝি এখনও খাওয়াই হয়নি—আহা, অনেক বেলা হয়ে গেল, তুমি খেয়ে নাও' বলে দ্রুত চিলেকোঠার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ছোট্টখাট্ট মানুষটি, বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি হবে—কিন্তু সারা মুখে আর হাসিতে যেন শিশুর সরলতা।

শ্বশুর মশাইয়ের মুখেই শুনেছে তাঁর বাবার অপঘাত মৃত্যুতে তাঁকে শহরে ওকালতির প্রাক্‌টিস ছেড়ে গ্রামে এসে বসতে হয় বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্ম। নানান কারণে নিজের অনেক ধারদেনা ছিল—তার চাইতে পৈতৃক পাওনা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু পাওনা টাকা বিশেষ আদায় হয়না—আর ওদিকে তাঁর পাওনাদারেরা নালিশ ঠুকে বিষয় সম্পত্তি সব এক এক করে নিলামে চড়াতে থাকে। খুব কষ্টের মধ্যে ছেলেরা সব মানুষ হচ্ছিল। হরিনাথ লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল, যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট। কিন্তু বেশী পড়াবার সামর্থ নেই—থাকলে সে সহজেই ভাল ডাক্তার বা বড় ইঞ্জিনীয়ার হতে পারত। অপরের সাহায্যে সাব-ওভারসিয়ারী পাশ করে চাকরি নিয়ে সংসারটাকে দাঁড় করিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে মাত্র নয়শ' টাকায় শহরের বাড়ী বিক্রি করে দিতে হয়। মেজো ছেলে বিশ্বনাথ লেখাপড়ায় ভাল না, ম্যাট্রিক পাশ করে মিলিটারীতে গেল, সেখান থেকে ফিরে অনেক দিন বসে থেকে অ্যাংলো ঘরে চাকরি পেয়েছে। দীনু আই এস্ সি পাশ করে কলকাতায় একটা চাকরি পেয়ে রাতে কলেজে পড়েছে আবার সংসারকেও দেখেছে। তার মধ্যে দেশ ভাগ হয়েছে, তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন ছেলেদের কাছে। চতুর্থ ছেলে মহীনাথও সরকারী চাকরি নিয়ে কলকাতা এসেছে। দীনু

গ্র্যাজুয়েট হয়ে বর্ত্তমানে এই চাকরি পেয়েছে। মেজো মেয়ের অনেক কষ্টে বিয়ে দেওয়া গেছে, আর তিনটি ছেলেমেয়ে এখনও পড়ুয়া। যখন শরীর আর একটু পটু ছিল তখন তিনিও পাকিস্তানে দূর দূর মফঃস্বলে জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবী বা কোন স্কুলে মাস্টারী করেছেন, সংসারকে সাহায্য করেছেন। এখন আর পারেন না, নানা অনিয়মে দেহের পাকযন্ত্র বিকল প্রায়। এখানে এলেই গিরিনবাবুর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান. যখন বেয়াই সম্পর্ক হয়নি তখন-ও খেয়েছেন এখনও খাচ্ছেন। কিছু উপকারও পাচ্ছেন মনে হয়। অনেক কথার মধ্যে এইগুলো হল মূল সূত্র।

সকালে অফিস বাড়ী থেকে স্নান সেরে একেবারে বেয়াই মশাইয়ের ডাক্তারখানা ঘুরে শশুর মশাই এ বাড়ীতে আসেন। ততক্ষণে দীননাথ খেয়ে অফিসে চলে যায়। তিনি এসে হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন গায়ত্রী জপ করেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক একাজে লেগে যায়। তারপর বসে বসে কেবল গল্প। খাবার আগে, খেতে খেতে, খেয়ে উঠেও গল্প করেন বৌমার সঙ্গে। কোনদিন শবুর খাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন, শবু খেয়ে এলে আবার গল্প চলে। খাটাখাটনির পর শবুর অনেক সময় দু চোখ ঘুমে ভেঙে আসে—তবু নিজেকে শাসনে রাখে, খুব আগ্রহ নিয়ে সব কথা শোনে। শুনতে শুনতে মনে হয় যেন এক শিশুর মুখ থেকে গল্প শুনছে। কি অসীম সারল্যে সব কথা বলেন—কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, শরীর নেই রাগের লেশ। শুধু একটাই ক্ষোভ, বলেন—

'বুঝলে বৌমা, তোমার শাশুড়ী ঠাকরুনটি একটি চীজ।' এর বেশী কিছু বলেন না।

শবু কোন প্রশ্ন করেনা, কথা বলে কম, শুধু শুনে যায়। মনে হয় পরম পূজনীয় এই মানুষটির বোধ হয় কথা বলার লোকের অভাব। যাঁর শোনার কথা তিনি হয়ত শোনেন না। বয়স্ক শ্রদ্ধাভাজন এই শিশুটির অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরে শবুর বুকের ভিতরটা টনটন করে। যতখানি তাঁর সঙ্গ পাওয়া যায় ততখানিই তাঁর সেবা যত্ন করে, নীরব শ্রোতা হয়ে তাঁর মনের সব বোঝা হাল্কা করতে দিয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। মনে মনে ভাবে সে কত সুখী। এখানে শশুরের সেবা করতে পাচ্ছে, স্বামীর ভালবাসা পেয়েছে, হাতের কাছেই বাবা-মা ভাই বোনেরা,—প্রায় রোজই এবেলা ওবেলা দেখা হচ্ছে। এর চাইতে বেশী কি সুখ সে জীবনে আশা করতে পারে? এ বুঝি তার জীবনের স্বর্ণ-যুগ।

হায়রে, মানুষ কত অল্পে সন্তুষ্ট হয়! এ সুখের দিন কতদিন স্থায়ী হবে?

বিকেলে দিদি জামাইবাবু ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বেড়াতে এসেছে। জামাইবাবু আজ রাতের গাড়ীতে কলকাতা ফিরে যাবে, দিদি ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত এখানে থাকবে। দীননাথও অফিস থেকে ফিরল। সুশীল বাড়ী দেখে খুশি হয়ে বলল—

'ব্রেভো ব্রাদার, খুব চমৎকার বাড়ী যোগাড় করেছ। চারদিক কি সুন্দর খোলা মেলা।'

দীননাথ বলল—'তবু আমার চিলেকোঠার ঘর এর কাছে স্বর্গ। ছাদের আলসের উপর বসে থাকলে সমুদ্রের হাওয়ায় দুপুরের রোদ মনে হয় জ্যোৎস্নার আলো, একটু গরম লাগে না। রাতের সমুদ্র ত আরও অপরূপ। আমি এ ক'বছর ওখানে বসে বসে ঢেউ গুণে কাটিয়েছি মহাসুখে।'

সুশীল বলল—'তুমি কি ঢেউ গোণার চাকরি কর?'

'না, চাকরি করে ঢেউ গুণি।' প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝে দীননাথ চটপট জবাব দিল। কথার বাহাদুরীতে সবাই হেসে উঠল। দীননাথ সবার জন্য মিষ্টি আনতে গেল।

এদিকে তপু আর কানাই কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে মেজদির কোলে বসবে বলে। শেষে দু জনকে দু' কোলে বসিয়ে ঠাণ্ডা করতে হল। দিদি বলল—

'স্বামীর ঘর করে শ্বশুরের সেবা যত্ন করে বেশ সুখেই আছিস নারে? আমার শ্বশুর মশাই কিছুতে কলকাতা যাবেন না, আর আমারও এখানে থাকার উপায় নেই। ওদিকে মামীশাশুড়ীর মন যোগাতে আর পারিনা, আমার নাকি কোন কাজের ছিরি ছাঁদ নেই।'

শবু বলল—'এ সুখ কতদিন কপালে টেঁকে দেখ।'

মিতু শ্রীলা নন্দু বাড়ীটা চারদিক ঘুরে দেখতে গেল—কানাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ওদের সঙ্গ নিল। একটু পরে কানাই একা চুপচাপ ডানহাতের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে মেজদির কোলের কাছে আবার বসে পড়ল। কি হল কিছু বোঝা যাচ্ছেনা—জিজ্ঞেস করেও কিছু জানা যাচ্ছে না। একটু পরে মিতু ফিরে এসে বলল—

'জানিস মেজদি, কানাই আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেই পূব দিকটায় গেছে আর সামনেই দেখে বিষ্ণুপ্রিয়াদি তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ব্যস্, সব বীরত্ব শেষ, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাচু, তারপর এক পা এক পা করে পেছুতে পেছুতে

সোজা এখানে এসে তোর কোলের কাছে লুকিয়ে আছে।'

সমস্ত ঘরে হাসির রোল উঠল। দীননাথ জলখাবার নিয়ে ফিরল, তাকেও ব্যাপারটা জানাতে আর একবার সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। কানাই তখনো আঙুলটা মুখে পুরে আছে। চা জলখাবার খেয়ে সবাই চলে গেল। জামাইবাবু আজ রাতের গাড়ীতে কলকাতা যাবে, তাড়াতাড়ি আছে। শবুরা সবাইকে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

পরদিন বিকেলে বেশ বেলা থাকতে মা পদ্মিনী দেবী এলেন, সঙ্গে তপু কানাই আর নন্দু। শবুর আনন্দ আর ধরেনা। মাকে পেলে সে আর কিছুই চায় না। তপু ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে পটপটিয়ে বলল—

'মেদ্‌দি তা কল।'

শবু বলল—'চা করব, জামাইবাবু আসুক।'

তপু মুখ বাঁকিয়ে বলল—'দামাই আথুক!'

মা বললেন—'আড়াই বছরের মেয়ের কি পটপটি কথা হয়েছে দেখছিস?'

শবু তপুকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—'তোর জামাইবাবু এলে তোর জন্য রসগোল্লা আনবে তখন চা খাবি রসগোল্লা খাবি।'

মা বললেন—'কাল এখানে রসগোল্লা খেয়ে গিয়ে বাড়ীতে কি গল্প। এই তপু, তুই আমার সঙ্গে যাবি না মেজদির কাছে থাকবি?'

'মেদ্‌দির কাথে।'

'তুই কাকে বিয়ে করবি?'

'দামাই বাবু।'

ওমা, শুনছো কথা! মা শবু দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে তপুর আধো আধো বোলে পাকা পাকা কথায়। মা বললেন—

'কাল রসগোল্লা খেয়ে ওর খুব ভাল লেগেছে, আর সেই লোভেই জামাই বাবুকে বিয়ে করবে বলছে।'

নন্দু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানাইও। মা জিজ্ঞেস করলেন—

'হ্যাঁরে শবু, ঐ আলনা আর চেয়ারগুলো কবে কেনা রে?'

শবু বলল—'সে কথা আর বোলোনা মা। চাকরিতে ঢোকার কয়েকমাস পরেই অফিসের কিছু ফার্নিচার নিলাম হচ্ছিল। তখনই দুটো আলনা, দুটো চেয়ার আর টেবিলটা কিনে রেখেছিল কবে বিয়ে হবে তখন দুজনের লাগবে

বলে, একটা আলনা অফিসের ঘরেই আছে। আবার একটা মীট সেফের অর্ডার দিয়েছে শিগগীরই তৈরী হয়ে আসবে। এ চৌকিটা অবশ্য বাড়ীওয়ালার।'

মা খুশি হয়ে বললেন—'দীনু দেখি খুব গোছানো ছেলে। চল দেখি রান্না-ঘর কেমন সাজিয়েছিস।'

সবাই গিয়ে রান্নাঘর পরিদর্শন করল, বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে। হারার মা কাজে এসেছে, বলল—

'মু অছি পারা, তম ঝুয় পাঁই কিছি চিন্তা নাহি।'

মা বললেন—'বেশ বেশ, তুমি দেখে শুনে রেখো।'

সেখান থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া ও আভার সঙ্গে কিছু কথা বলে পাশের ঘরের চাটুয্যে গিন্নীর কাছে এলেন। বিধবা মানুষ, একাই থাকেন। চাটুয্যেগিন্নী শবুদের ঘরকন্নার গল্পে একেবারে মুখর। এদের ছেলেমানুষি ঘরকন্না দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয় বুঝি নিজের নাতনী আর নাতজামাইয়ের ছেলেমানুষী দেখছেন। কি রাঁধে, কি খায় তার ঠিক নেই। শশুর ঠাকুরটি ভালমানুষ ঐ রান্নাই সোনা মুখ করে খায়। এখন ত শেখার সময়, তাতে কি হয়েছে? আহা, এমনি করে হেসে খেলে চার পাঁচ বছর যেন কাটাতে পারে—তারপরে যেন ছেলে মেয়ের ভাবনা ভাবে।

মা বললেন—'আপনি পাশে আছেন, আমার এই অনভিজ্ঞ মেয়ে জামাইকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।'

'সে ত একশোবার', বললেন চাটুয্যে গিন্নী ফোকলাগালে হেসে।

দীননাথ অফিস থেকে ফিরল। তপুর জামাইবাবুকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা শুনে হেসে তাকে কোলে করে জলখাবার আনতে গেল, সঙ্গে কানাই।

নন্দু বলল—'মা, এবাড়ীর ঘরগুলো কত সুন্দর, বড় বড়, খোলা মেলা—ঠিক আমাদের পুরোনো বাড়ীর মত, তাইনা?' নন্দু ওদের পুরোনো বাড়ীর কথা ভুলতেই পারে না।

তপুর আজও জলযোগটা বেশ ভালই হল। চা খেয়ে মা ছেলে মেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যার পর রওনা হলেন, দীননাথ সঙ্গে গেল বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে। যাবার আগে মা আড়ালে শবুকে জিজ্ঞেস করলেন—

'দীনু তোকে বেশ আদর সোহাগ করে ত?'

'ধোৎ, মা যে কি বলে'—শবু লজ্জায় ছেলেমানুষের মত মার বুকে মুখ লুকোলো। এ সব ব্যাপারে মা-ও ছেলেমানুষের মত কৌতুহলী। আর এও

জানা যে এখানকার সব কথাই বাবার কানে যাবে। বাবা আর মাতে সব কথাই আলোচনা হয়—কেউ কিছু গোপন করে না।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে দীননাথ বলল—'চল আজ আমরা রিটার্ণ ভিজিট দিয়ে আসি।'

'কোথায় ?'

'কোথায় আবার, শ্বশুরালয়ে। মা কালকে বলে গেলেন মনে নেই ?'

এ ত শুধু বলার অপেক্ষা। শবু তখুনি ভাল শাড়ী পরে প্রস্তুত। ঘরে তালা লাগিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট চার পাঁচেকের পথ—হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে চলল—শ্বশুর মশাইয়ের এ বেলা আসতে এখনো ঘণ্টা দুই আড়াই দেরী আছে।

পথে যেতে শবু দেখাল—'ঐ দেখ আমার বন্ধু হীরা ঐ বাড়ীতে থাকে। একদিন ওদের ওখানে যেতে হবে।'

দীননাথ বলল—'এখন শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। যখন আমরা একটু পুরোনো হয়ে যাব তখন সব জায়গায় যাওয়া যাবে।'

লজ্জায় শবুর মুখ কান লাল হয়ে উঠল—কি যে বলে, কেউ যদি শুনে ফেলে ?

গিয়ে দেখে ঠাকুমা বড়কাকীমাও এ বাড়ীতে হাজির। খুব আনন্দ হাসি গল্প চলতে লাগল। শবু এক সময় জিজ্ঞেস করল—

'ঠাকুমা, আমার কি গণ ?'

ঠাকুমা বললেন—'তোর ত নরগণ। কেন ?'

শবু বলল—'ও বাড়ীতে বাবার কাছে শুনলাম ওর নাকি রাক্ষসগণ। রাক্ষসগণ আর নরগণ হলে কি হয় ?'

ঠাকুমা বললেন—'রাক্ষসগণ আর নরগণ হলে যে নরগণ হয় সে আগে মারা যায়, শুনিসনি রাক্ষসরা মানুষকে মেরে ফেলে ? রাক্ষসগণ আর দেবগণ হলে সারাজীবন কেবল ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে দেবতা অসুরদের লড়াই এর মত—তোর শ্বশুর বোধ হয় দেবগণ আর শাশুড়ী রাক্ষসগণ। দেবগণ আর নরগণ হলে সব থেকে ভাল হয়—দুজনে খুব মিলমিশ থাকে। আর দুজনের গণ যদি এক হয় তবে ত রাজযোটক।'

শবু বলল—'তাহলে ত আমিই আগে মরব সধবা থাকতেই। বেশ মজা।'

মা বললেন—'ষাট ষাট, ও কথা মুখে আনতে নেই, দীনুর মনে ব্যথা লাগবে।'

দীননাথ কাছেই ছিল, বলল—'তোমার নাম ত এখন প্রতিমা—তার মানে—দেবী। দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমিও দেবগণ হয়ে গেছি।'

খুব একটা জব্দ করতে পেরেছে এমন ভঙ্গি করে মাথা দুলিয়ে শবু বলল—

'তা আর হয়না মশাই, বাবা নিজে আমাকে বলেছেন তোমার রাক্ষসগণ।'

ঠাকুমা বাধা দিয়ে বললেন—'আহা, রাক্ষস রাক্ষস বলিস না—প্রাণনাথের প্রাণে কষ্ট লাগছে। বেচারার মুখটা শুকিয়ে গেছে। বল দেবারিগণ, তবু ত রাক্ষসটা বাদ পড়বে।'

দীননাথ শবুকে লক্ষ্য করে বলল—'এবার তোমার রান্নার কথাটা বল।'

শবু বলল—'ও মা হ্যাতো, জানো ঠাকুমা, বড়কাকীমা—মা শোনো—আজ বাজার থেকে আস্ত রুই মাছ এনে বলে, মাথাটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রাঁধ। এই নাও সরু চাল। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। শেষে নিজেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল—জিরে তেজপাতা হলুদ গরম মশলা বাঁটিয়ে তেল ঘি লবণ দিয়ে সে এক অপূর্ব রান্না। বেশী তেল মশলা খাওয়া বারণ তবু বাবা লোভ সামলাতে না পেরে বেশ তৃপ্তি করে খেলেন। না হলে বাবা আমার সব রান্নাতেই একটু খুঁত খুঁত করেন—এ রান্না এ রকম হয় না, ও রান্নার স্বাদ ওরকম হবার কথা নয়।'

মা জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি রান্না জান, দীনু?'

দীননাথ লজ্জিতভাবে বলল—'না, জানিনা, তবে ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে যে ধারণা হয়েছে তাই আর কি।'

ঠাকুমা বললেন—'নিশ্চয়ই তোর শাশুড়ীর রান্নার হাত ভাল, তাইতেই বাপ বেটার নোলা বেড়ে গেছে।'

বড়কাকীমার আবার রান্নার বেলায় যত কুঁড়েমি, বললেন—'বেয়াইমশাইকে পাঠিয়ে দিস, ঝামা দিয়ে নোলাটায় একটু ধার দিয়ে দেব।'

মা ঠাকুমাকে পাশে বসা কিনুকে দেখিয়ে বললেন—

'ভাল কথা মনে হল, সামনের মাসে কিনুকে সাধ দিতে হবে—লোকে বলে নোলা পুজো। মা, আপনি আগে থেকে সাধভক্ষণের একটা দিন দেখে দেবেন।'

চা জল খাবার খেয়ে দুজনে ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে চলল সন্ধ্যারাতের পথ ধরে। বাড়ীটা তালাবন্ধ, শশুর মশাইয়ের আসার সময় হয়ে এল। শবু এখন রীতিমত গিন্নী, তার অনেক দায়িত্ব দুই বাপ বেটাকে নিয়ে।

তিন

পৌষ মাস পড়ার দুদিন আগে শ্বশুর মশাই দুপুরে খেতে বসে বললেন—

'আমি কাল কলকাতা রওনা হব। সেখানে কিছু কাজ আছে, পৌষমাস পড়ে গেলে আর যাওয়া হবে না। একবার পাকিস্তানেও যাওয়া দরকার। এই সময় ক্ষেতের ফসল ধান উঠবে, কিছুদিন আগে পাট উঠেছে। না গেলে চাষীরা সব খেয়ে বিক্রি করে বসে থাকবে—আদায়বাদ কিছুই হবেনা, যা ত সামান্য কিছু পাওয়া যায় তাও পাওয়া যাবে না।'

হয়ে গেল শবুর এত সাধের এবং তৃপ্তির শ্বশুরের সেবাযত্ন করা। অন্তত এখনকার মত ত বটেই। শবুর বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। মাত্র দু সপ্তাহ রইলেন, সেবার সুযোগ দিলেন। কি দরকার আছে একা একা পাকিস্তানে যাবার? বৃদ্ধ বয়েস, অপটু শরীর, পেটে নানা গণ্ডগোল—গিয়ে যদি অসুখ বিসুখে পড়েন সেখানে কে দেখবে? এখানে বাবার ওষুধ খেয়ে শরীরটা বোধ হয় একটু ভাল হচ্ছিল, ক্ষিদেও হচ্ছিল। তবু ত শবু ভাল রান্না করতে পারে না, ভাল করে সেবাযত্ন হয়না। অফিসের ঘরটা একটু দূরে প্রায় মিনিট তিন চারেকের পথ, দুবেলা তাঁকে হাঁটাহাঁটি করতে হয়—অসুবিধে কত। এ বাড়িতে আর একটা ঘরও খালি পাওয়া যায় না। শবু আকুল ভাবে বলল—

'কি দরকার বাবা, আপনি যাবেন না। আপনি এখানেই থাকুন। আমার রান্না খেতে বোধ হয় আপনার অসুবিধে হচ্ছে।'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন—'না না তা নয়—বৌমা। আমার যাওয়া দরকার। ওদিকে ছেলে মেয়েগুলো কি করছে কে জানে। তোমার মাতাঠাকুরানীকে ত চেননা। ছোট মেয়েটার ঘাড়ে সংসার ফেলে রেখে তিনি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। মেয়েটার আবার কলেজ লেখাপড়া আছে। করতে কিছুই পারিনা তবু চোখের সামনে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগে।'

কি অসীম দরদ নিয়ে ছেলে মেয়েদের কথা ভাবেন। নিজে কিছু করতে পারবেন না তবু চোখের সামনে দেখেই সান্ত্বনা পেতে চান। একই হৃদয়ে যেন পিতৃস্নেহ আর মায়ের করুণাধারা বইছে। এমন মানুষকে কি ধরে রাখা যায়? মনপ্রাণ ঢালা শ্রদ্ধা ভালবাসা সেবা যত্ন দিয়ে কি সে বাবাকে

অতখানি আপন করে নিতে পেরেছে—যার জোরে সে বলতে পারে—যেতে নাহি দিব ?

পরদিন বাবা সত্যি সত্যিই রাতের গাড়ীতে রওনা হয়ে গেলেন। শবু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে বাবা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—

'সুখে থাক। তোমার আদর যত্নের কথা আমার মনে রইল। এ বুড়ো ছেলের কথা ভুলে যেয়ো না।'

শবুর বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে, দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। ওর কান্না দেখে বিষ্ণুপ্রিয়াদি এগিয়ে এল সান্ত্বনা দিতে।

বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে স্টেশন থেকে দীননাথ ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। তাকেও খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বাবা চলে যাওয়াতে শবুর মত সেও খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। বলল—

'জানো, আমাদের বাবা খুবই স্নেহশীল, নরম প্রকৃতির। আজ পর্য্যন্ত বাবা বোধ হয় কোন ছেলে মেয়ের গায়ে হাত তোলে নি। মা-ই বরং সবাইকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। ঠাকুর্দা অপঘাতে মারা গেলে অভাবের তাড়নায় বাবার মেজাজ কিছু খিটখিটে হয়ে পড়ে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বড়ই সাদাসিধে, সরল আর সত্যবাদীতায় বোধ হয় যুধিষ্ঠিরকেও হার মানায়।'

রাতে খেতে বসে দীননাথ আবার বলতে লাগল—

'আমাদের পরিবারে তিনটে বড় দুঃখের ঘটনা ঘটেছে। ছোটকাকা ত্রিনাথ ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে এসে বসেছে, বিয়েও করেছে—হঠাৎ ডাক্তার নিজেই ধনুষ্টংকার হয়ে মারা গেল। ডিস্‌পেনসারী পড়ে রইল, কাকীমা বিধবা হয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় শ্বশুর বাড়ীতেই রয়ে গেল। আমার তখন জন্মই হয়নি।

'আমার জন্ম মহকুমা শহরে, বাবা সেখানে ওকালতি করত। একটু বড় হয়ে যখন গ্রামে যেতাম পুজো আর গ্রীষ্মে কোর্টকাছারি বন্ধের সময়, অনেকটা পথ নৌকোয় যেতে হত, সেখানে বড় ও ছোট কাকীমারা খুব যত্ন করে আমাদের দুধ ভাত মেখে খাওয়াতো। পরে বহুদিন পর্য্যন্ত নৌকোয় যাতায়াতের পথে নদীপাড়ের গ্রামগুলো থেকে দুধ জ্বাল দেওয়ার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে এলে আমার দুই কাকীমার কথাই মনে পড়ত। কিন্তু বড় কাকীমাও অকালে চলে গেল।'

'তোমার বড়কাকীমার কি হয়েছিল আমাকে বল'—শবু সব খুটিয়ে জানতে চায়।

দীননাথ বলে চলল—'বড়কাকার স্বাস্থ্য ভাল, স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ার সময়ই কেমন ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরীক্ষা দিতে বসে হাঁ করে কড়িকাঠ গুণছিল, মাষ্টার করে ধমক দিল—ওহে হরনাথ, কড়িকাঠ না গুণে খাতায় মন দাও। কাকা এক লাফে উঠে মাষ্টারকে মেরে ধরে মাটিতে ধাকা দিয়ে ফেলে সেই যে স্কুল ছাড়ল আর ওমুখো হল না। সেই ছেলেকে ঘরমুখী করতে ঠাকুর্দা বয়েসকালে তার বিয়ে দিলেন শ্যামা সুশ্রী একটি মেয়ের সঙ্গে—নাম বঙ্গবাসিনী। কি সুন্দর টানাটানা তার চোখদুটি ছিল, এক দৃষ্টিতেই আমাদের আপন করে নিত। বিয়ে করে বাড়ীতে এসেই বাড়ীর একমাত্র পাকা দালান ঠাকুর্দার শোবার ঘরের ছাদে উঠে কাকা নাকি হাত নেড়ে গান জুড়েছিল—বঙ্গ আমার জননী আমার ·।'

শবু ফিক করে হেসে বলল—'ঠিক আমাদের বড়কাকার মত। তারপর কি হল?'

দুজনেরই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আঁচিয়ে রান্নাঘর বন্ধ করে শোবার ঘরে এল। অফিস টাইম ছাড়া তারা রাতে এক সঙ্গেই খায়, শবু একহাতে পরিবেশন করে আরেক হাতে খায়—এঁটো কাটার বিচার থাকলেও ছোঁয়াছু য়ির বাতিক নেই, শ্বশুর মশাইয়ের খাবার কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে বাঁচিয়ে রাখত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকমন্ত্র গায়ত্রী জপ করেন, তাঁর বেলা শবু কোন অনিয়মই হতে দেয়নি।

দীননাথ আগের কথার খেই ধরল—

'বিয়ের চার বছর পর কাকা কাকীমার একটি ছেলে হল, আমার থেকে মাস ছয়েকের ছোট—নাম টিপু। আমার জন্মের আগে ছোটকাকার বিয়ে হয়েছিল—মারাও গেছে, তার পর পরই ঠাকুমাও পরিণত বয়সে মারা গেছেন। টিপুর বয়স যখন প্রায় বছর দুই সেই সময় ঘটল আর এক অঘটন।

'শুধু ছেলেই হয়েছে, বড়কাকা দিনরাত মৌনীবাবা হয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না। কাকীমার মনে গুমরানো দুঃখ স্বামীর ব্যবহারে। সহ্য করতে না পেরে এক রাতে শোবার ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে স্বামীর উপর জেদ ধরল—কেন তুমি কথা বলনা, কেন তুমি অমন হয়ে থাক, আমি লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। কাকা নীরব। কাকীমা বলল—তুমি যদি কথা না বল আমি গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরব। তবু কাকা নীরব। কাকীমা বলল—আমি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছি না, এই দেখ আমার কাপড়ে কেরোসিন ঢালছি। একবার তুমি কথা বল,

বল কেন তুমি কথা বলনা। তখনও কাকা নীরব—শুধু টিপুকে নিজের কোলের কাছে ধরে রেখেছে। তারপর ত মুহূর্তের ব্যাপার—ঘরে কেরোসিনের কুপি জ্বলছিলই, কাকীমা নিজে হাতে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—ওগো তুমি একবার কথা বল, একবার কথা বল।

'আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, ভয়ে ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কাকা টিপুকে কোলে করে দরজা খুলে বাইরে এসে তাকে উঠোনে ছেড়ে দিয়ে 'আগুন' 'আগুন' বলে বাড়ী থেকে ছুটে পালাল। চিৎকার আগুন আর ধোঁয়া দেখে ঠাকুর্দা ছোটকাকীমা ছুটে এল, পাড়া-পড়শীরা ছুটে এল—ততক্ষণে সব শেষ, শুধু ছেলেটা অসহায়ের মত উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে 'মা মা' বলে। এসব আমার শোনা কথা, আমরা তখন পুজোর ছুটিতে গ্রামে আসার মুখে।'

শুনতে শুনতে শবুর দু চোখ বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে একটি করুণ পরিণতির কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে থাকে! এও কি সম্ভব! একটা জলজ্যান্ত মানুষ, নিজের স্ত্রী, ছেলের মা—চোখের সামনে ধীরে সুস্থে বলে কয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগাল—স্বামী হয়ে একবার বাধা দিল না, আগুন নেভাতেও গেলনা। কথা যে বলতে পারে না তাও ত নয়, আগুন আগুন চিৎকার হল, ছেলেটাকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে আসা গেল অথচ সময়ে একটা কথা বেরোল না মুখ দিয়ে! কি হৃদয়হীন, কি অমানুষিক। এমন ঘটনা ত চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত! অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে শবু জিজ্ঞেস করল—

'তাঁরা এখন কোথায়?'

দীননাথ বলল—'বছর দুই পরে ঠাকুর্দার অপঘাত মৃত্যু হলে টিপুর মামারা এসে টিপুকে নিয়ে যায়, এখনো সে তাদের সঙ্গে আছে। দুটি বছর সে ছোটমার কাছে মানুষ হচ্ছিল। টিপুকে নিয়ে গেলে ছোটকাকীমাও কলকাতায় বাপের বাড়ী চলে গেল। এতকাল আমরা গ্রামের স্কুলে পড়াকালে অসুখে ভুগে মারা যায়—আমরাও তাকে কথা বলতে শুনিনি। সে সময় টিপু দুচারদিনের জন্য গ্রামে এসেছিল।'

শবু বলল—'বাবার কাছেও শুনেছি ঠাকুর্দার অপঘাত মৃত্যুর কথা। তাঁর কি হয়েছিল?'

দীননাথ বলল—'তখন কোন একটা ছুটিতে আমরা গ্রামে এসেছি, সেই সুযোগে ছোটকাকীমা তার বাপের বাড়ী গেছে টিপুকে সঙ্গে করে। একদিন

ভোরে উঠে আমরা দেখি ঠাকুর্দার দালানে উঠোনের দিকে মস্ত বড় সিঁধ কাটা, ঘরের দরজা আধখোলা, আশীবছরের বৃদ্ধ ঠাকুর্দাকে তার বিছানার উপরে গলা টিপে খুন করে রেখে গেছে ডাকাতরা। বাড়ীতে ডাকাত পড়লে যে হৈ হট্টগোল হয় তার কিছুই হয়নি—সব নিঃশব্দে ঘটে গেছে। বাবা তখন বাড়ীতে ছিল না, কি কাজে দুদিনের জন্য শহরে যেতে হয়েছিল। ঠাকুর্দার ছিল তেজারতি কারবার, তাঁকে খুন করে বন্ধকী গয়নাগাটি সোনা-দানা নগদ টাকা পয়সা সব সিন্দুক থেকে লোপাট ডাকাতদের দৌলতে। বাবা শহরে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে বসল।' ··

সে রাতে শবুর আর কিছুতে ঘুম আসে না। সব ঘটনার কথা ছাপিয়ে বারে বারেই মনে হয় কে যেন বলছে-—ওগো, তুমি একবার কথা বল, কথা বল। বিনিদ্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারীমূর্তি। ইষৎ শ্যামবর্ণা, দীর্ঘ আয়ত দুটি কোমল চোখ, কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ, পরনে লালপাড় শাড়ী, মাথায় ঘন কালো চুলে মস্ত বড খোঁপা, ঘোমটা সিঁথির প্রান্তে সীমাবদ্ধ। শবুর দিকে চেয়ে সস্নেহে হেসে বলছেন —তুই এ বাড়ীর বউ হয়ে এসেছিস? তুই ত খুব সুন্দরী, তোর বর তোকে ভালবাসবে, তোর সঙ্গে কথা বলবে। শত দুঃখে পডলেও তুই যেন আমার মত ভুল করিস না। এ নির্মম সংসারে কেউ কারো দিকে তাকায় না, কারো কথা ভাবে না। অপরের মনের বেদনার কথা ভাবতে তাদের বয়েই গেছে। জীবনে কথার যেমন প্রয়োজন আছে, আবার কথার জ্বালাও তেমন তীব্র। ··কিছুক্ষণ পরে মনে হল যেন তিনি কমলাসনে বসে আছেন, চারদিক আলোয় ভরে গেছে। প্রায় না ঘুমিয়েই সারাটা রাত কেটে গেল।

সকালে দীননাথ যখন খেয়ে অফিসে রওনা হবে শবু বলল—

'শুনছো, খেয়ে উঠে আমি একটু ও-বাড়ি যাবো?'

দীননাথ বলল—'বেশত, যেয়ো, আমি অফিস ফেরৎ তোমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসব।'

হ্যাঁ, আজই একবার যেতে হবে। মা বাবাকে সব কথা না জানালে তার মন শান্ত হবে না।

চার

পদ্মিনী দেবী খেয়ে উঠে পান সাজছেন, গিরিনবাবু খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে আছেন। কিন্তু পাশের ঘরে শুয়ে আছে। তপু বাইরে খেলা করতে চাইছে, মা তাকে বাবার পাশে বিছানায় শুতে বলছেন। অন্নদা কুয়োতলায় দুপুরের বাসন কোসন নিয়ে মাজতে বসেছে। হঠাৎ বলে উঠল—

'আরে দেখ কে অসুছি। মুয়া বহু শবুদিদি আসিলানি।'

শবু বলল—'অন্নদা পিসী, ভাল আছ ত?'

'হঁ দিদি, তেমে ভাল ত?'

ততক্ষণে তপু আর মা ঘর থেকে বারান্দায় এসেছেন। মা বললেন—'শবু, তুই হঠাৎ চলে এলি?'

শবু অভিমানের সুরে বলল—'কেন, আসতে নেই নাকি?'

'না, না, একা একা কিনা, তাই। আয় ঘরে আয়।'

শবু বলল—'তোমাদের জামাই অফিস চলে গেল। কাল বাবা কলকাতা গেলেন। মনটা ভাল লাগছিল না, চলে এলাম।'

মা জিজ্ঞেস করলেন—'দীনুকে বলে এসেছিস ত?'

'হ্যাঁ। বলেছে বিকেলে এসে নিয়ে যাবে।'

মা অন্নদাকে বললেন—'অন্নদাদিদি, তুমি একটু ও বাড়ী গিয়ে মাকে খবর দেবে? বলবে, শবু এসেছে, যদি পারেন ত একবার যেন আসেন।'

অন্নদা বলল—'মু যিবি আউ আসিবি। তাঙ্কু সঙ্গেরে নেইকিরি আসিবি।' অন্নদা ঠাকুমাকে ডাকতে চলে গেল।

শবু মাকে জিজ্ঞেস করল—'বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'না, এমনি শুয়ে আছে, আয় ঘরে আয়।'

কথা বার্তা শুনে দিদি কিন্তুও উঠে এসেছে। শবু জিজ্ঞেস করল—'দিদি কেমন আছিস?'

'ভাল। তোর শ্বশুর মশাই চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

পাদ্মিনী দেবী স্বামীকে বললেন—'শুনছো, শবু এসেছে।'

গিরিনবাবু হেসে একবার শবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—

'বেশ ত, তোমরা এই ঘরে বসেই গল্প কর, আমিও শুনতে পাব।'

মা বললেন—'কাল বেয়াই মশাই এ বাড়ীতে এসেছিলেন যাবার আগে দেখা করতে। মিষ্টি আনিয়ে দেয়া হল, খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তোর শ্বশুর বাড়ীর দেশের লোক খুব মিষ্টি খেতে পারে। একটা পান খাবি?'

শবু বাবার উপস্থিতিতে একটু ইতস্ততঃ করে—'খাবো?'

মা বললেন—'খা, সধবা মানুষ খেয়ে উঠে একটা করে পান খেতে হয়।' শবুর কাছে মায়ের উপদেশ বেদবাক্য।

ততক্ষণে অন্নদার সঙ্গে ঠাকুমা এসে পড়লেন বিস্ময় চেপে। পদ্মিনী দেবী শাশুড়ীকে বললেন—

'শুনেছেন মা, কাল শ্বশুর মশাই চলে গেছেন ত মেয়ে মনের দুঃখে ঘরে টিকতে না পেরে এখানে চলে এসেছে। মেয়ের আমার শ্বশুরের উপর বেশ মায়া পড়ে গেছে এ কয়দিনেই।'

ঠাকুমা বললেন—'সেই ত ভাল। অন্তরের টান না থাকলে আর কিসের সম্পর্ক। তা সে লাহিড়ী ত কাল এখানেও এসেছিল, গিরিন আমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। ভারি অমায়িক ব্যবহার, সুন্দর মার্জিত কথাবার্তা। এমন মানুষকে অবশ্যই ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হয়।'

ঘরের মেঝেতে বসে ঠাকুমা, মা, দুই মেয়েতে কথা হচ্ছে, তপু মেজদির কোলে বসে সবার কথা শুনছে—খাটে শুয়ে গিরিনবাবুও সব শুনতে পাচ্ছেন। শবু এই রকম একটা পরিবেশ চাইছিল কথা বলার। শবু আরম্ভ করল—

'জানো ঠাকুমা, জানো মা—কাল ওদের বাড়ীর অনেক কথা শুনলাম। শুনি আর কাঁদি। রাতে আমার ভাল ঘুমই হল না।' বলে কাল রাতে শোনা সব কথা একে একে বলল।

ঠাকুমা মা শুনতে শুনতে চোখ মুছতে লাগলেন, দিদির চোখ দুটো ছলছল করছে। একটি ঘটনায় দুই পরিবারে অদ্ভুত মিল। এখানে যেমন মহিমমৈত্র মহাশয়ের নৌকোডুবিতে অকালমৃত্যু সারা পরিবারকে অকূল পাথারে ভাসিয়েছিল, ওখানেও তেমনি আশী বছরের বৃদ্ধ হরিনাথ লাহিড়ীর অপঘাত মৃত্যু ও ডাকাতের হাতে সব লুঠ হয়ে যাওয়ায় ওদেরও তেমনি কষ্টের আর সীমা ছিল না, এখন ত পাকিস্তান হয়ে বাড়ী ঘরদোর বিষয় সম্পত্তি সবই প্রায় গেছে। নিঃসন্তান বিধবা ছোট বৌ এর জন্যও মন কাঁদে। আর সবার উপরে সেই মৃত্যু—মেজোবৌয়ের আত্মদান। কে কোথায় এমন দেখেছে, শুনেছে! কেউ কি কল্পনা করতে পারে! অন্নদাও দরজার কাছে বসে সব

শুনছিল, সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল—

'সব দেশয়ে বহু মানস্বয় একা অবস্থা।'

ঠাকুমা বললেন—'একজনের অন্তরের জ্বালা কতখানি হলে তবে কোলের শিশু ফেলে নিজের গায়ে আগুন দিতে পারে! শুনেছি ওদের নাকি বাড়ীর পাশেই নদী, সেখানে গিয়ে জ্বালা জুড়োতে পারল না—জ্বলে পুড়ে মরল! শুধু সোয়ামীর কথা না বলা নয়, নিশ্চয়ই আরো কিছু ব্যাপার আছে।'

শবু বলল—'দেখ মা, ও বাড়ীর ঠাকুমা, মেজোমা সধবা গেছেন, আমিও নিশ্চয়ই সধবা…'

শঙ্কিত হয়ে মা শবুর মুখে হাত চাপা দিলেন, বললেন—

'দিনরাত ওরকম জপ করিস না, ওসব অমঙ্গলে কথা মনেও আনিস না—কখন কোন দেবতা কোথায় থাকে ঠিক নেই।'

শবু বলল—'আমি তাঁকে যেন কাল রাতে দেখেছি অপরূপ মূর্তিতে।'

ঠাকুমা বললেন—'ওসব তোর অধিক চিন্তার ফল। ও সব ভাবিস না। মনে রাখিস তোর বাবা মা, এই বুড়ী ঠাকুমা বেঁচে আছে—তাদের মনে কত-খানি ব্যথা লাগবে। সবে তোর বিয়ে হয়েছে, এখনও অনেক সাধ আহ্লাদ বাকি।'

শবু মা ঠাকুমাকে প্রণাম করে বলল—'আমার অন্যায় হয়েছে, আর বলব না। আমি এখনকার কথা বলিনি, ভবিষ্যতের কথা বলছিলাম।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর গিরিনবাবু মন্তব্য করলেন—

'দুই পরিবারে সত্যিই অদ্ভুত মিল। দুই কর্তার অস্বাভাবিক মৃত্যু, দুই কর্তারই তিন ছেলে, কালীনাথ বাবু বড় ছেলে আমিও ভাইদের মধ্যে বড়।'

দিদি মাঝখানে বলল—'কিন্তু বাবা তুমি ডাক্তার আর তিনি উকিল।'

'তা ঠিক। তবে দুজনেরই স্বাধীন জীবিকা।'

স্কুল পড়ুয়ারা সব একে একে এসে পড়ল—কানাই নন্দ শ্রীলা মিতু। অনেক দিন পরে মেজদিকে একা পেয়ে বেশ জমজমাট আড্ডা বসে গেল, সবাই নিজের নিজের স্কুলের ক্লাশের গল্প বলতে লাগল। বাবা ডাক্তারখানায় গেলেন। এদিকে গল্প আর ফুরায় না। অফিস ছুটির পর দীননাথ এল। সেও সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ হৈ চৈ করে চা জলখাবারের পালা শেষ করে শবুকে নিয়ে রওনা হল। শবুর মন এখন অনেকটা হাল্কা হয়েছে।

পাঁচ

এক রবিবার ছুটির দিন দীননাথ বলল—'চল, আজ তোমাকে আমার দু টাকার ঘরটা দেখিয়ে আনি।'

একটু বেলা পড়লে দুজনে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে পড়ল ভিক্টরদের ভাড়া বাড়ীটা—দুজনেই সে দিকে তাকায়। দীননাথ বলল 'শুভ বিবাহ'—শবু বলল 'স্বাগতম্।' আশ্চর্য্য—কাগজের লেখা দুটো এখনো দেওয়ালে লাগান আছে, দু একটা কোণ শুধু একটু আলগা হয়ে গেছে।

মিত্তবর ভিক্টর পাশে তাদের নিজেদের বাড়ীর লনে খেলা করছিল—ওদের দেখে বলল—'জামাইবাবু কোথায় চললেন? শবুদি আসুন আমাদের বাড়ী মা বাড়ীতেই আছে।'

দীননাথ বলল—'আজ না ভাই, আর একদিন আসবো।' পরে শবুকে বলল—'আমারই মিত্তবর আমাকে ডাকছে জামাইবাবু বলে।'

শবু হেসে বলল—'এখানে তোমাকে কে চেনে মশাই? আমি হ'লাম ওদের শবুদি, ওরা চেনে আমার বাবাকে, নন্দু ওর বন্ধু।'

দীননাথ বলল—'তা ঠিক। ঐ বাড়ীটা আমরা প্রায় দশদিন ব্যবহার করলাম, ভিক্টরের বাবাকে ভাড়া দিতে গেলাম ত বলল, আপনি হলেন গিরিনদার জামাই, ভাড়া দিতে হবে না। অনেক সাধাসাধিতে ইলেক্ট্রিকের চার্জ বলে দশটা টাকা ম্যানেজারের কাছে জমা দিতে বলল। অথচ দেখ আমি যে হোটেলে থাই, সরকার বাবু, যে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহানারা সাজিয়েছিল, তার এরকম একটা ভাড়া বাড়ী আছে শুনে কদিনের জন্য দিতে বলেছিলাম, সে পাঁচশ টাকা ভাড়া চেয়েছিল। আর এ ভদ্রলোক প্রায় কিছুই নিল না।'

শবু বলল—'তবেই বোঝ, কে ওদের বেশী আপন। ভিক্টররা কিন্তু খ্রীষ্টান না—ওদের খুব উঁচু বংশ।'

দীননাথ বলল—'জানি।'

অফিসে পৌঁছে গেছে, অফিস ঘরের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চিলেকোঠার ঘর। ঘরের মধ্যে একটা আলনা, লণ্ঠন, এক প্রস্থ বিছানা,

মাটির কলসী কাঁচের গেলাস আর কিছু টুকিটাকি জিনিষ ছড়ানো। জানলা ছুটো খুলে দিতে হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া ঘরে ঢুকতে লাগল। শবু বলল—

'সত্যি, এ ঘরের তুলনা হয় না।'

দীননাথ তাকে একটু আদর করে বলল—'কেমন, আমি বলিনি?'

শবু বলল—'বড়মার স্কুলে পড়ার সময় রোজ এ পথ দিয়ে যেতাম, তখন এ বাড়ীতে কোন অফিস ছিল না।'

'না, মাত্র চার পাঁচ বছর হল হয়েছে।'

দুজনে গল্প করতে করতে রাস্তার দিকে ছাদের আলসের উপর এসে বসল। সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। হাওয়ায় সামান্য শীতের আমেজ। ভ্রমনার্থীরা দলে দলে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্য্যের রোদ পড়ে সমুদ্রের জল চিকচিক করছে, সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে ঢেউগুলো সরল রেখায় এসে বারবার তটপ্রান্ত চুম্বন করে মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিবেশে সকলেরই মনে জাগে কাব্যিক সুখানুভূতি—শবুদের ত কথাই নেই, ওদের যে নতুন বিয়ে হয়েছে। শবুর মন কাব্য ছেড়ে গদ্যে নেমে এল, দুচার কথার পর বলল—

'তোমাদের অনেক কথা শুনলাম সেদিন, আজ তোমার কথা বল।'

দীননাথ ঠাট্টা করে বলল—'আমার জীবনে বলার মত কথা একটাই—তোমার সঙ্গে বিয়ে।'

শবু আব্দার ধরল—'না, সে কথা শুনছিনা, বল।'

এ যেন সমুদ্রের এক পাড়ে বসে অন্য প্রান্তের রহস্য জানার চেষ্টা।

দীননাথ বলল খুব সংক্ষেপে—'ঠাকুর্দার মৃত্যুর কথা ত সেদিন শুনেছ। তারপর থেকে সংসারে দুর্গতির চূড়ান্ত। মাসী পিসী পিসতুতো ভাইদের সাহায্যে বড়দা মেজদা আমার ও মহীর পড়াশুনা চলতে লাগল। বড়দা ওভারসীয়ারী পাশ করে চাকরিতে ঢুকলে তবে একটু সাশ্রয় হল। তা সত্বেও পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঘরের সোনাদানা সব এবং কিছু জমিজমা বেচে আমরা কোনরকমে টিকে রইলাম। সে সময় মেজদা ম্যাট্রিক পাশ করে মিলিটারীতে চলে গেল। আমি ছোটবেলায় কখনও গ্রামে থেকে কখনও বা দিনাজপুরে ছোটমামার বাড়ীতে থেকে স্কুলে পড়েছি। পরে দিনাজপুরে একবছর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। এ সময় একটা ব্যাপার হয়েছিল।

'মেজদা একবছর ম্যাট্রিকে ফেল করলে সে বছর আমি ক্লাশ টেনে উঠেছি। দুইভাই গ্রামের একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়বে কেমন যেন লাগে। বছরের মাঝখানে দ্বিতীয় বারের জন্য আমাকে দিনাজপুরে পাঠানো হল। সেখানে

আমার পুরোনো স্কুল যেখানে আমি শেষবারে সেকেণ্ড হয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলাম সেই স্কুল বা শহরের অন্য কোন স্কুল আমাকে ভর্ত্তি করতে চায়না বছরের মাঝখানে বলে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন। যা হোক করে মেসো মশাইয়ের চেষ্টায় একটা স্কুলের সেক্রেটারীকে ধরে সেখানে ভর্ত্তি হলাম। হেডমাস্টার মশাই বললেন—সেক্রেটারীর চিঠি নিয়ে এসে আমার মাথা কিনে নিয়েছে। একটা পরীক্ষার পর হেডমাস্টারের অপ্রসন্নতা দূর হল—ইংরেজী পরীক্ষার খাতার উপরে লাল কালিতে লিখলেন—ভেরিগুড্, সিওর টু গো ইন দি ফার্স্ট ডিভিশন। রাতারাতিই আমি ক্লাশের সেকেণ্ডবয় হয়ে গেলাম। কি শহর কি গ্রাম সব স্কুলেই আমি ক্লাশে সেকেণ্ড বা থার্ড হতাম। কিন্তু ম্যাট্রিকে আমি রয়্যাল ডিভিশনই পেলাম। পড়াশুনা করতাম না মন দিয়ে, বেশী ঝোঁক ছিল খেলার দিকে।'

শবু বলল—'তারপর বল।'

দীননাথ বলল—'থার্ড ডিভিশন পাওয়াতে বড়দা রেগে গেল, সকলেরই ধারণা ছিল ফার্স্ট ডিভিশন পাব—এল এম এফ ডাক্তারী পড়ব। যুদ্ধের বাজার, একবছর বসে থেকে পিসতুতো ভাইদের দয়ায় রাজশাহীতে তাদের বাসায় থেকে রাজশাহী কলেজে দু বছর আই এস সি পড়লাম। এবারে কলকাতায় আসতে হল চাকরির খোঁজে। ছ মাস পরে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হলাম—না, ডাক্তারী পড়তে নয়, লেবরেটরী এসিস্টেন্টের চাকরি নিয়ে, মাইনে মাসে পঞ্চাশ টাকা, উদ্দেশ্য কোন নাইট কলেজে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া।'

শবু বলল—'তোমার ঝামেলা ত কম হয়নি।'

দীননাথ বলল—'শুধুই কি ঝামেলা কষ্টও কম করতে হয়নি? গ্রামে থাকতে মাথায় ধানের আঁটি উঠাতে হয়েছে, বহুদূর থেকে নৌকোয় বা গরুর গাড়ীতে করে তা ঘরে আনতে হয়েছে, বাড়ীর খামারে সে সব ঝাড়াই বাছাইতে সাহায্য করতে হয়েছে, হাটবাজারে যেতে হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া খেলাধুলা সাও হয়েছে। শেষে গ্র্যাজুয়েট হয়ে কটকে দাদার ঠিকানায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড করি। বার দুই ইন্টারভিউয়ের নামে তামাসা হল। তারপর হঠাৎই এই চাকরির এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম—কোন পরীক্ষা নেই, ইন্টারভিউ নেই—একেবারে বিনা ঝামেলাতে এই সরকারী চাকরি একসঙ্গে বেশ কিছু লোকের উপরে। কাজে জয়েন করে এখানে দাদার এক বন্ধুর বাড়ীতে তিনরাত ছাদে শুয়ে কাটিয়ে শেষে আমার এই দু টাকার স্বর্গধাম!'

পরে দীননাথের অনুরোধে শবুও তাদের পরিবারের ইতিহাস মোটামুটি শোনাল। শেষে বলল—

'আমার বাবা সেদিন বলছিলেন, দুই ঠাকুরদারই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দুটি পরিবারে এসেছে অশেষ দুর্গতি।'

দীননাথ বলল—'সত্যি কথা।'

অফিস বাড়ী থেকে বের হতে সময় অফিসের হেড দারোয়ান কুম্বর সিং ও আরো দু একজনের সঙ্গে দেখা হল—সিংজী পরিষ্কার বাংলায় শবুকে বলল 'বৌমা, নমস্কার'। দীননাথ তার সঙ্গে কিছু কথা বলে শবুকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—

'এই সিংজী লোক খুব ভাল, অনেক বছর বাংলামুলুকে থেকে ভাল বাংলাও বলতে পারে। আমাকে বিয়ের সময় কয়েক শ টাকা ধার দিয়েছে বিনা সুদে।'

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, সমুদ্রের ধারে ভ্রমণার্থীর ভিড় আর বিশেষ নেই। দুজনে নেমে গিয়ে জলের কাছাকাছি পাশাপাশি বসল। এরকম পরিবেশে মুখের ভাষা যায় হারিয়ে। সমুদ্রের বিশালতায়, তার সীমাহীন গাম্ভীর্যে মন আশ্চর্য্য এক প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। সব মুখরতা যায় থেমে। দুটিতে পাশাপাশি বসে হাতে হাত রেখে মনে মনে কথা বলে। ওদের লজ্জা পাবার কিছু নেই, ভয়েরও কিছু নেই—পিছনেই অফিসটা দেখা যাচ্ছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে দীননাথ একসময় বলল—

'সমুদ্রের ধারে বসলেই আমার রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে পড়ে—কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে সাগর মাঝে…। কিন্তু আমি গলা খুলে গাইতে পারি না' বলে গুনগুন করে কয়েকটা লাইন গাইল। পরে বলল 'চল, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।'

গান আসেনা শবুর গলাতেও, গানের সুরে যখন দেহ মন নেচে ওঠে তখনও কণ্ঠে ঝরে না সুর। তবু একটা নতুন জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তি আকণ্ঠ পান করে ভাবে সে বেশ সুখেই আছে।

ছয়

আনন্দে দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ তাতে বাদ সাধল একখানা চিঠি; মেজোভাশুর বিশ্বনাথ লিখেছে—পঞ্চম ভাই ভবনাথের আই এস্ সি পরীক্ষার ফী বাবদ চল্লিশ টাকা পত্রপাঠ পাঠাও।

বিয়ের একমাসও হয়নি, কত যে ধার দেনা হয়েছে এখনো তার হিসেব হয়নি; নতুন সংসার পাতার খরচ গেছে, বাড়ী ভাড়া আছে—এদিকে হাতে একটাও পয়সা নেই। দীননাথ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, শবুর মনটাও দমে গেছে। শুনেছে ছোট দুই ভাই ভবনাথ কলেজে ও সোমনাথ স্কুলে পড়ে ছোট বোন শেফালী পড়ে থার্ড ইয়ারে। টাকা পাঠাতে না পারলে হয়ত ভাইটার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। শবুও একান্নবর্ত্তী পরিবারে মানুষ হয়েছে, বাবা বলতেন, আমাদের একান্নবর্ত্তী সংসার। এখন সে কথার অর্থ বুঝতে পারে। ভাইবোনদের পড়াশুনা দাদারা না দেখলে চলবে কেন?

দুজনে আলোচনা করে দীননাথের বিয়ের আংটি বোতাম শবুর তিনটে আংটি বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠানো হল। দীননাথ শুধু তার নিজের আংটি আর বোতাম বিক্রি করতে চেয়েছিল—কিন্তু হাজার হোক বিয়ের জিনিষ, শবু বিক্রি করতে দেয়নি। নিজের আংটিগুলোও খুলে দিয়েছে বন্ধক দিতে—তবু ত আশা থাকবে একদিন ছাড়িয়ে আনা যাবে, বিক্রি করলে ত চিরদিনের মতই গেল।

শবু ভাবতে লাগল, তাদের সংসারে অভাব অনটন ছিল কিন্তু এরকম ত কোনদিন দেখেনি। শুনেছে মামীদের গয়নাগুলো সব লাটখাজনার আগে কুণ্ডুদের কাছে বাঁধা পড়ত—সে ছিল জমিদারী রক্ষার ব্যাপার, পরে আবার ছাড়িয়ে আনত। কিন্তু এত সামান্য ব্যাপারে সোনা বিক্রি বা বন্ধক দিতে হয়, এ যে একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। ভয়ে ত শবুর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এখনই এই পরে না জানি আরো কি হয়! শবুর জীবনের সুখ সাধ আহ্লাদ বিয়ের প্রথম মাসেই বিরাট এক হোঁচট খেল।

দু তিন দিন পরে শবু দীননাথকে বলে দুপুরের খাওয়া সেরে ওবাড়ীতে গেল দেখা করতে, অফিস ছুটির আগেই ফিরে আসবে। মা বললেন—

'কিরে শবু, তোকে যেন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে?'

শবু বলল—'কই না তো।'

'একদিন দীনুকে নিয়ে আমাদের নতুন বাড়ীতে যাস, ঠাকুমা কাকীমাদের সঙ্গে দেখা করিস।'

দিদি কিন্তুও পাশে এসে বসল। হঠাৎ দিদি বলল—'হাঁরে শবু, হাতের আংটিগুলো কি খুলে রেখেছিস?'

ঐ যাঃ, এখানে সব জানাজানি হয়ে যাবে নাকি? সত্যি কথা বলবে না গোপন করবে? শবুর ইতস্তত ভাব দেখে মা বললেন—

'হারিয়ে যায় নি তো? সোনা হারানো খুব খারাপ। তিনটে আংটি একসঙ্গে হারাবেই বা কি করে?'

শবু আর গোপন করতে পারে না। তার মুখে সব শুনে মা বললেন—

'ঐ ক'টা টাকার জন্য কেন বন্ধক দিল, বললে আমরাই না হয় দিয়ে দিতাম।'

শবু বলল—'না মা, ও কাজ কোরোনা, কিছু বলতেও যেয়ো না—ভীষণ আত্মসম্মান জ্ঞান। জামাইবাবু সেদিন ঠাট্টা করে বাড়ী ভাড়ার কথা বলেছিল পরদিনই বাসা ঠিক করে আমাকে নিয়ে গেল।'

মা সে কথায় না গিয়ে বললেন—'কোন দোকানে বন্ধক দিয়েছে বলত, এখানে সবাই আমাদের চেনা, আমরা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে তোর কাছে গোপনে রেখে দেব।'

শবু বলল—'সে ত জানিনা মা, মনে হয় ওর অফিসের কোন লোক মারফৎ দিয়েছে।'

তবে ত কিছু করার উপায় নেই। মার মন খুঁত খুঁত করতে থাকে, বিয়ের আংটি বোতাম একমাসের মধ্যে বন্ধক পড়ল এ ত ভাল কথা নয়। শেষ পর্য্যন্ত যদি ছাড়িয়ে আনতে না পারে? একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস যেন।

বাবারই হোক আর স্বামীরই হোক পরীক্ষা দিতে দিয়ে ফেল করে কারো অর্থদণ্ড যাতে না যায় সেই ভেবে শবু নিজে আর পড়ল না। এখন ওদের অর্থদণ্ড সত্ত্বেও দেওরটি যদি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারে তবে একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ রক্ষা পাবে।

ধীরে ধীরে সময়ের প্রলেপে এসব কথা মনের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। শবুরা এক এক করে অতি পরিচিতদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করেছে। প্রথমেই নতুন বাড়ীতে গিয়ে ঠাকুমা কাকা কাকীমা শশুর সঙ্গে দেখা করে

এল। সেখানে দোতলার সিঁড়ি তৈরীর কাজ মাঝ গতিতে চলছে। তার পর একে একে মাসীর বাড়ী, প্রীতিলতা, ঠাকুর মশাই, নীলু ও হেমু কাকাদের বাড়ী, হিতেনবাবু, রাধহরি বাবু, ও হীরাদের বাড়ী, ভিক্টরদের বাড়ী, সরকার বাবুর হোটেল বাড়ী। সবখানেই পেল প্রচুর সমাদর।

সব শেষে গেল স্থানীয় পাওয়ার হাউসের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের কোয়ার্টারে। সেখানে ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী শবুকে সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ী বিয়ের উপহার হিসেবে দিল।

দীননাথ বলল—'আমার কই?'

ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে মঞ্জরী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল—'আপনাকে কিছুই দেয়া হবে না। আপনি আমাকে যে বিপদে ফেলেছেন।'

চা মিষ্টি খেয়ে পথে আসতে আসতে শবু ভাবছে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে। মঞ্জরীকে শবু চেনে, মিতুদের উপরের ক্লাশে পড়ে, সেবার ঝাঁসী কণাদের গ্রুপে নেচেছিল। তবে কি···? দীননাথ নিজে থেকেই জানাল, সে গত দু বছর ধরে মঞ্জরীকে পড়িয়েছে বিনে পয়সায়। সামনে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। না, কোনরকম ঘনিষ্ঠতা হয়নি। বিয়ের পরে আর পড়াতে পারবে না বলে বিয়ের কথা পাকা হতেই পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে। বিয়ের সময় ওরা কলকাতায় গিয়েছিল বলে বিয়েতে আসতে পারে নি। এখন মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়েছে, মঞ্জরী সেই কথাই বলছিল।

শবু বলল—'তোমাদের সংসারের ঐ অবস্থা আর তুমি দু বছর ধরে বিনে পয়সায় ওকে পড়ালে?'

দীননাথ বলল—'চাকরির পর অফুরন্ত সময়। শুধু ওকে কেন, ওর ছোট দুই ভাইকেও সেই সঙ্গে পড়া দেখিয়ে দিতাম। আমি বিদ্যা বিক্রি করি না।'

শবুর মনে হয় বাবাকে যেমন সরল ভালমানুষ দেখেছে, হয়ত জীবনে অনেক ঠকেছেন—ছেলেও তেমনি বোকা আর নীতিবাগীশ হয়েছে ঠকেছেও তেমনি।

দিদির সাধভক্ষণ, পৌষ পার্বণ, সরস্বতী পূজো পার হয়ে গেল। এর মধ্যে একবার দুজনে সাক্ষীগোপাল বেড়িয়ে এসেছে। পরেরবারে গিয়েছিল কোনারক, সঙ্গে ছিল মা মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই তপু। সেখানে সেই ডাকবাংলোটাও ওরা দেখেছে যার বারান্দায় বসে দাদু তাঁর তিন আত্মজ ভূতকে পাকড়াও করেছিলেন।

এবারে এসেছে বিয়ের পর শবুর জীবনে প্রথম দোল। সকাল সকাল রান্না সেরে শবু দীননাথের সঙ্গে চলল বাবা মাকে পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে। প্রণাম করা হলে মা বললেন—

'মিতুদের নিয়ে তোরা নতুন বাড়ীতে গিয়ে ঠাকুমা কাকীমাকে প্রণাম করে আয়। বাবা দীনু, ফেরার সময় তোমরা এ বাড়ী হয়ে যেয়ো, আবীর দিয়ে প্রণাম করলে মিষ্টি মুখ করাতে হয়।'

বড়কাকা বাড়ী ছিল না। ঠাকুমা কাকীমাকে আবীর দিয়ে প্রণাম করে সবাই ফিরে আসছে। সিনেমা হলের সামনে কয়েকটা বখাটে ছেলে মিতুকে তাক করে রং দিতে এগিয়ে এল। দীননাথ বাধা দিতে গিয়ে নিজেই রং মেখে ভূত হল। এবার বুঝি ওরা বাকি সবাইকে রং মাখিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করে আর কি।

এমন সময় বড়কাকা হঠাৎ কোথা থেকে এসে পড়লেন। পাড়ায় হৈমবাবুকে সবাই চেনে, তার গায়ের জোরের কথাও সবাই জানে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি তেড়ে এলেন—

'ছেলেরা কেন মেয়েদের গায়ে রং দেবে? দাঁড়া, এক এক আছাড়ে তোদের রং খেলার সাধ ।'

মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা ফাঁকা। বড়কাকা কিছুটা পথ সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

শাহীর মোড়ের ভাড়া বাড়ীতে পৌঁছে শবু বলল—'জানো মা, সিনেমা হলের সামনে কয়েকটা ছেলে মিতুকে রং দিতে এসেছিল। আমি তো ভয়ে মরি। ভাগ্যিস বড়কাকা এসে পড়েছিল, না হলে কি কাণ্ড যে হ'ত।'

মা বললেন—'হ্যাঁ, ঐখানটায় কিছু বাজে ছেলের আড্ডা আছে। দোলের সময় ওখান দিয়ে তোদের পাঠানো আমার ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম দীনু সঙ্গে আছে, কিছু হবে না।'

মাঝখান থেকে মিতু বলল—'কি হ'ত? আমাদের গায়ে রং দিলে আমরাও রং দিতাম।'

মা ধমক দিলেন—'তুই চুপ কর মিতু। এত বড় ধাড়ী মেয়ে এখনো কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না।'

সত্যি মিতুটা বড় চনমনে হয়েছে। ওর জন্যই যে এত কাণ্ড তাও সে বোঝে না।

শবুকে গায়ে রং দিতে আসবে এ শহরে কোন ছেলের সে সাহস নেই।

সে সবার থেকে একটা দূরত্ব ও গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে চলে। কোন ছেলের সাহস হয় নি কোনদিন গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার। গত বর্ষায় কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ জোর বৃষ্টি নেমেছিল। হীরা আর শবু নিজের নিজের ছাতা মাথায় পথ চলছিল। ক্লাশেরই কয়েকটা ছেলে ভিজতে ভিজতে পিছনে আসছিল আর বলাবলি করছিল—

'গোটিএ ছতা যদি আমকু দেই থান্তা'…

'মাগু না? মাগিলে দেই দিব।'

ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই। কেউ আর ছাতা চাওয়ার সাহস করে নি।

দোলের মিষ্টি মুখ করে নিজেদের বাসায় ফিরে শবু দীননাথকে পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করল। দীননাথও তার মাথায় আবীর দিয়ে আশীর্বাদ জানাল, মুখে বেশ করে আবীর মাখিয়ে আদর করল। এসব ত আর সবার সামনে করা যায় না, লজ্জা করে।

আদরে ভালবাসায় শবুর মন ভরে উঠল। যতদিন বাঁচবে, এমনি করে সে যেন হোলির দিনে স্বামীর পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে পারে।

সাত

দীননাথের হুজুগে এবারে দুজনে চলল ভুবনেশ্বরে। কাকা কাকীমাদের বাড়ীতে থেকে খেয়ে দেয়ে বিকেলে এলা বাবু ও পুটুকে নিয়ে মন্দিরগুলো দেখে গৌরীকুণ্ড দেখতে গেল। ফেরার পথে এলা বলল—

'জামাইবাবু রিক্সা করুন।'

দীননাথ বলল—'মাত্র একটা রিক্সা দেখা যাচ্ছে, এদিকে আমরা দুজন তোমরা তিনজন, এতজনকে ত নেবে না।'

এলা রেগে গজগজ করতে লাগল—

'তিনজন নেবে না, চারজন নেবে না। আপনিও বড় জামাইবাবুর মত সিনেমা দেখাবেন না রিক্সায় চড়াবেন না, খালি-খালি হাঁটাবেন।'

জামাইবাবুদের সম্বন্ধে শালাশালীদের ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু দীননাথের পকেটের অবস্থার কথাও শবু জানে। যা হোক শেষে দুটো রিক্সাই পাওয়া গেল।

পরদিন সকালে ছোটকাকা সবাইকে শিশুপাল গড় দেখিয়ে নিয়ে এলেন

—সবে খনন কার্য্য শুরু হয়েছে। এটা কি সেই মহাভারতের এক চরিত্র শিশুপালের রাজধানী ছিল ?

দুপুরে এলা বাবু ও পুটুকে নিয়ে শবুরা বিন্দু সরোবরে স্নান করতে গেছে আর সেখানেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। এলার ডান হাতের তর্জনীতে গরম জলে ফোস্কা পড়ে এমন ফুলে আছে যেন মনে হয় সব সময়ই সে তর্জনী উঁচিয়ে আছে। সে জলে নামবে না। শবু সাঁতার জানে না, বাবু পুটুত ছোট— পাড়ে বসেই ঘটি দিয়ে স্নান সারবে। দীননাথ গায়ের জামা ঘড়ি পেন টাকা পয়সা সহ এলাকে জিম্মা করে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতারের কসরৎ দেখাতে লাগল।

পরে জল থেকে উঠে কাপড় ছাড়তে গিয়ে বলে উঠল—'আরে, শার্টটা কোথায় গেল ?'

এলা কিছু বলতে পারছে না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওর কাছে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে ওকে মুখ ভেংচাচ্ছিল, এক সময় সেও মেয়েটাকে জোর একটা মুখ ভেংচি দিয়ে কিছুক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। তারপর থেকে মেয়েটাকে আর দেখতে পায় নি।

তবে ত ঐ মেয়েটাই মুখ ভেংচে জামা নিয়ে সরে পড়েছে।

থানায় ডায়েরী করে, কাকার বাড়ীতে রাখা অন্য জামা গায়ে দিয়ে, কাকীমার কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা চেয়ে নিয়ে পরদিন শবু আর দীননাথ সকালের গাড়ীতে ফিরে এল। জামার সঙ্গে ঘড়ি পেন টাকা পয়সাই শুধু চুরি যায় নি, বাড়ীর চাবি অফিসের চাবিও গেছে। শবুকে বাপের বাড়ীতে রেখে দীননাথ বিষ্ণুপ্রিয়াদিদের চাবির গোছার সাহায্যে ঘর খুলতে গেল। পরে অফিসে চাবিওয়ালা ডাকিয়ে নতুন চাবি তৈরী করাতে হল। বিকেলে শবু দীননাথের সঙ্গে নিজেদের ঘরে ফিরল। বেড়াতে বেরিয়ে খুব শিক্ষা হল যাহোক।

পরদিন দুপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াদি একটা সরস বর্ণনা দিল শবুকে। বিষ্ণুপ্রিয়াদি তখন স্কুলে। দীননাথ ডাকাডাকি করতে আভা তার ঘরের বাইরে এসেছে। দু জনেই সমান লাজুক, যেমন জামাই তেমন আভা। আভা আবার বাল্যবিধবা, বয়েসও বেশী নয়। শেষে উঠোনে শুকোতে দেওয়া শাড়ীর আড়ালে দুপাশে দুজনে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হল। কাপড়ের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে চাবির গোছার আদান প্রদান হল—ঠিক যেন

ইতিহাসের আলাউদ্দিন আর পদ্মিনীর সাক্ষাৎকার।

রাতে শবু দীননাথকে বিষ্ণুপ্রিয়াদির সরস বর্ণনার কথা শোনাল। দীননাথ শুনে বলল—

'আভা কেন পদ্মিনী হতে যাবে? আমার পদ্মিনী তুমি। না, না, তুমি না—পদ্মিনী ত মা-র নাম। তুমি হলে আমার তিলোত্তমা।'

শবু এতদিন সুযোগ খুঁজছিল, এবার পেয়ে গেল। বলল—

'আচ্ছা, তুমি আমাকে কি দেখে পছন্দ করেছিলে? মা বলে, ধলীর কেবল ধলা গুণ আছে আর কোন গুণ নাই। বলনা, লক্ষীটি।'

দীননাথ শবুকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল—

'তোমার এই লাল ঠোঁট দুটো দেখে—ঠিক যেন পক্কবিম্বাধরষ্ঠৌ, একেবারে কালিদাসের ভাষায়। সুন্দর মুখ, মাথায় একরাশ ঘন চুল, চাঁপার কলির মত হাতের আঙুলগুলো, চরণ যুগলে যেন পদ্মের শোভা। আরো ব্যাখ্যান যদি শুনতে চাও তবে উপমার সাহায্য নিতে হবে। মুখমণ্ডল চন্দ্র-সুষমা মণ্ডিত, কেশদামে মেঘ ভ্রম হয়, টানাটানা ভুরু দুটি যেন যুগল ধনুক, বড় দুটি আঁখিপদ্মে অসীমের আহ্বান, ডালিম ফুলের মত অধর পল্লব দুটি মধুমক্ষিদের মধু পানে আকৃষ্ট করছে, হংসগ্রীব, বাহু দুটিতে শ্বেত মৃণালের কমনীয়তা, অলক্তের লজ্জা উৎপাদনকারী রাঙা চরণ যুগল—দেখলেই বলতে ইচ্ছে করে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। তার উপরে বিদুষী, বীণা নিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর, হাসিতে মুক্তা ঝরে, মৃদু ভাষিণী, চলনে গজেন্দ্র গামিনী। তবে দেহ গজেন্দ্রর মত স্থূল নয়—স্লিম, রোগাই বলা যায়। আর নাক—সে ত অতুলনীয়।'

শবু এতক্ষণ দীননাথের বাক্যবিন্যাস উপভোগ করছিল। হাজার হোক মুখ্যু ত নয়—কলেজে সংস্কৃতে পড়তে হয়েছে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য'। গল্প উপন্যাসও কিছু পড়েছে! গজেন্দ্র গামিনী পর্য্যন্ত সে হেসে হেসে মাথা দোলাচ্ছিল। নাকের কথা শুনেই বালিশে মুখ লুকালো—

'আমার নাক ভাল না, তবে তুমি পছন্দ করলে কেন?'

'সর্বনাশ—আমি আবার খারাপ বললাম কোথায়?'

আরো আদর পাবার আশায় মিছিমিছি কাঁদার ভান করে শবু বলল—

'জানি মশাই, জানি। আমার নাকটা চাপা বলে ছোটবেলা থেকে সবাই আমার পিছনে লাগে।' সেদিন শুভেন্দুদাও সে কথা বলেছিল। গলায় কান্নার রেশ টেনে আবার বলল 'জানো, ঠাকুমা বলেছে, টেপা নাক সোহাগের টেপারী হয়—স্বামীরা আদর করে।'

দীননাথ বলল—'সেই জন্যই ত নাকের কথা বলা। অমন তিলফুল-জিনি-নাসা না হলে কি আদর সোহাগ জমে?' বলে আর এক দফা শবুকে আদর করল।

শবুর কান্না মিলিয়ে গেল। এবার দুষ্টুমী ভরা মুখে সে বলল—

'আচ্ছা অতই যদি পছন্দ তবে দুবার করে আমাকে দেখতে চেয়েছিলে কেন?'

দীননাথ অকপটে বলল—'প্রথম দিনই এত রূপ দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হল, স্বপ্ন দেখিনি ত! এমন রূপবতী কন্যা যে আমার গলায় মালা দেবে বলে অপেক্ষা করছে কল্পনাই করিনি কখনো।'

শবু দুষ্টুমীভরা হাসি হেসে বলল—

'না গো না, আমি বলব? আগের দিন আমি কলেজে পড়ি, ইকনমিক্স পড়ি শুনেছিলে। পরে নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল, ও ত বলে দিয়ে গেলরে, আমার ত বলা হল না বি এ পড়েছি, ইকনমিক্স পড়েছি। তাই বললে, আর একবার দেখব। ঠিক কিনা?'

দীননাথ গোবেচারার মত ভাব করে বলল—

'ধর তাই। কিন্তু বলত, সেই রূপসী মেয়েটি কি দেখে এই অধমের গলায় তার মুক্তোমালাটি পরালো?'

শবু বলল—'না ঠাট্টা নয়, কিসে তুমি আমাকে পছন্দ করলে?'

দীননাথ বলল—'আর কিছু নয়, আমার সামনে একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার মাথা আছে মুখ আছে হাত পা আছে, কানা খোঁড়া অন্ধ নয় বোবাও নয়—সবই এক পূর্ণাঙ্গ মানবীর মত, তাকে কেন অপছন্দ করে তার মনোবেদনার কারণ হব?'

শবু কপট ঈর্ষায় বলল—'তবে তো তুমি আমার বদলে আভাদিকেও পছন্দ করতে পার।'

দীননাথ বলল—'সে ত কালো। তাছাড়া বদলা বদলির দরকার কি? তুমি আমার সামনে আছ, তুমিই থাকো। অন্তরালবর্তিনী অন্তরালেই থাক।' বলে নিবিড় করে আর একবার শবুকে আদর করল।

বসন্ত কাল। উত্তরের হাওয়া নিস্তেজ হয়ে দক্ষিণে সমুদ্রের দিক থেকে বসন্তের হাওয়া বইছে উতলা হয়ে। গাছে গাছে দেখা দিয়েছে নব কিশলয়। আমের মুকুল আর ফুলের সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। পাখীদের কল কূজনে দিনের বেলায় চারদিক মুখরিত হয়। ঋতুরাজ বসন্তের আহ্বানে

ওদের মত নব যুগলও সাড়া দেয় দেহে মনে। কবির ভাষায়—কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে বাঁধে নীড় থাকে সুখে। মর্তেই যেন ছড়িয়ে আছে স্বর্গের অনির্বচনীয় সুধা।

আট

বেশ আনন্দে সুখে দেখতে দেখতে চারটে মাস কেটে গেছে শবুর। মাঝে মাঝে বাবা মা ঠাকুমা ভাই বোনদের সঙ্গে দেখা করতে যায়—বাবা ঠাকুমা ছাড়া আর সবাই আসে এমন কি একদিন বড়কাকাও শবুদের বাসায় এসেছিলেন। সবার সঙ্গে হাসি গল্পে দিন কাটে।

আর সবার আসা যাওয়ার একটা সময় অসময় আছে, কানাইয়ের তা নেই। সে যখন তখন আসে, যেচে বলে 'মেজদি, আজ তোদের বাড়ী আমার নেমন্তন্ন'। কোন দিন তার হাতে থাকে তীর ধনুক, বলে 'সুদামদা আমাকে মারবে বলেছে তাই তীর ধনুক নিয়ে এসেছি।' দুপুরে মেজদির সঙ্গে খেয়ে গল্পকরে পথে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে সন্ধ্যার পর বাড়ী যায়। মা বলেন 'মেজদির বাড়ী নেমতন্ন খাবি বলে গেলি দুপুরের আগে, বিকেলে বাড়ী না এসে সন্ধ্যে করে এলি?' বিকেলে খেলা না করে কেউ যে বাড়ী আসে কানাইয়ের মাথায় তা ঢোকে না। নন্দু সে তুলনায় ধীর স্থির শান্তশিষ্ট অমন হুটহাট করে আসে না, যেচে নেমন্তন্নও নেয় না।

হীরা একদিন এসে শবুর পাকা গিন্নীর মত ঘরকন্না করা দেখে গেল। বলল—

'বেশ আছিস নারে? আবার শুনলাম সাক্ষীগোপাল কোনারক ভুবনেশ্বর ঘুরে এলি। পরীক্ষাটা দিলি না? তোর আর কি, আমাকে ভাই পড়াশুনাই চালিয়ে যেতে হবে, দিদির বিয়েরই কিছু হচ্ছে না। তোরা নাকি লোকনাথের মেলাতেও গিয়েছিলি—তোদের ত খুব সাহস! এখানে কত সব কাণ্ড হয়, গত বছরের সেই কমলা হরণের কথা তোর মনে আছে না?'

শবু বলল—'ও বলেছে, যে অফিসে কাজ করে তার ভয়ে কেউ নাকি কাছে আসতে সাহস পাবে না। বলল বটে, কিন্তু লোকনাথের মেলায় ভিড়ের মধ্যে দীননাথ সঙ্গে থাকতেও যে একটা লোক তার বেশী গা-ঘেঁষে চলার চেষ্টা করছিল আর শবুও যে তোকে আচ্ছা করে খিমচে দিয়েছে সেকথা

সে দীননাথকেও বলেনি হীরাকেও জানাল না। তবে দোলের দিন দীননাথকে পথে রং মাখিয়ে কেমন ভূত সাজিয়েছিল তাই বলে দুজনে হাসাহাসি করল, ভুবনেশ্বরে ঘড়ি জামা চুরির গল্পও হল।

হীরা ওদেরকে সুখে ঘরকন্না করতে দেখে চা জলখাবার খেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

কাছাকাছি ত অনেক ঘোরা হল। এপ্রিলের গোড়াতে দীননাথ শবুকে বলল—'চল, আমরা রাঁচি বেড়িয়ে আসি। আমার অফিসের কাজ হবে তোমারও বেড়ানো হবে।'

কদিনের জন্য বাড়ী তালাবন্ধ করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। রাঁচি যেতে বা আসতে তিনবার করে ট্রেন বদল, বড় লাইনের গাড়ী ছোটলাইনের গাড়ী। পাহাড়, ঝর্ণা, লেক, শাল মহুয়ার বন। রাঁচির পথে হাটে বাজারে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষের আনাগোনা। দীননাথের অফিসবন্ধু গোপেন বাবু তিন চার-দিনের জন্য একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছিল মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়ায়। সেখানেই সামান্য কিছু রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করে শুধুই ঘুরে বেড়ানো—মেণ্টাল হসপিটাল, বাঙালীদের দুর্গাবাটি, পাহাড়ী নদী, ডোবাগুা, লেক, রাঁচিহিল, মোরাবাদি হিল—আর ফটো তোলা। কী শান্ত শহর, কী স্নিগ্ধ তার পরিবেশ!

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বেড়িয়ে গাড়ীর ধকল সয়ে শবুরা ফিরে এসেছে গোপেনবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে। ফিরে এসে সবাইকে রাঁচি বেড়ানোর গল্প বলতে হয়। এক কালে ছোটকাকা পাটনায় থেকে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ত, বাড়ীর আর কেউ আগে বিহারে যায় নি। তাই সবাই আগ্রহ নিয়ে রাঁচির গল্প শোনে, ফটো দেখে। ফটোগুলো তেমন ভাল হয় নি, কাঁচা হাত ত।

গল্প শুনতে শুনতে মা পদ্মিনী দেবী একদিন বললেন—'আমার একবার কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করার ইচ্ছে অনেকদিনের। সে সুযোগ হবে কিনা কে জানে। তোদের ঠাকুমা দাদু বেঁচে থাকতে এখানকার একটা দলের সঙ্গে রামেশ্বর সেতুবন্ধ দেখে এসেছিল, আমার সেখানেও যেতে ইচ্ছে করে।'

অনেকদিন ধরে বেড়িয়ে আর ফিরে এসে গল্প করে করে হয়রান হয়ে শবু আজ ভাবছে দুপুরে খেয়ে উঠে খুব ভাল করে একটা ঘুম দেবে। অফিসের পাট মিটিয়ে সে স্নান সেরে নিল। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে একটা ঘুম লাগাবে। বিষ্ণুপ্রিয়াদি মর্নিং স্কুল থেকে ফেরার পথে কোত্থেকে এক

স্বর্ণকারকে ধরে এনেছে—সে নাকি এখানে বসেই সুন্দর সোনার গয়না গড়িয়ে দেবে পুরোনোর বদলে। সোনা আর গহনার ব্যাপার, কোন্ মেয়েমানুষ সেখানে একবার উঁকি না দিয়ে পারে? শবুও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—

'কিরে শবু, কিছু গড়াবি নাকি? এখানে বসে বসেই গড়িয়ে দেবে।'

শবু কিছু না বলে চেয়ে রইল—লোকটা মনে হচ্ছে স্থানীয় নয়। তাছাড়া বাড়ীতে স্বর্ণকার ডেকে গয়না গড়াতে সে কোনদিন দেখেনি।

লোকটা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলল—'ঐ বৌদির হাতে যে ডিজাইনের চুড়ি আছে আপনারাও সে রকম বানিয়ে নিন।'

বিষ্ণুপ্রিয়াদি বলল—'দেখিরে শবু তোর একগাছা চুড়ি।'

শবুর একগাছা চুড়ি নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া ও আভা তার ডিজাইন দেখতে লাগল। স্বর্ণকার—দেখি আমি একটু—বলে চুড়িটা হাতে নিয়ে খুব মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। শবুর ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক লাগছে—এক-দৃষ্টে স্বর্ণকারের হাতের দিকে চেয়ে আছে।

স্বর্ণকার শেষে বলল—'দেখলাম। তবে এটা ঘণ্টাদুয়েকের জন্য এখানে রাখলে আমার দেখে বানাতে আরও সুবিধে হত।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—'রাখনা শবু, আমরা ত এখানেই আছি।'

শবু শান্ত গলায় বলল—'না, এখন আমি খেতে যাব, তারপরে ঘুমোব'। বলে চুড়িগাছাটা ফেরৎ নিয়ে সোজা রান্না ঘরে চলে এল। তারপর খেয়ে দেয়ে দুপুরে টানা দুঘণ্টা ঘুম লাগাল।

পরদিন দুপুরে আভা আর বিষ্ণুপ্রিয়া মহা হৈ চৈ লাগিয়েছে—আভার গলাই বেশী শোনা যাচ্ছে। শবু এগিয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া শোকাচ্ছন্নভাবে গালে হাত দিয়ে বারান্দায় বসে আছে আর আভা কেবল ফুঁসছে।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?' শবু জিজ্ঞেস করল।

আভা রাগে একেবারে ফেটে পড়ল, বলল—

'ঐ টুকু মেয়ে শবু, সবে বিয়ে হয়েছে—ওর যা বুদ্ধি আছে এই বুড়ী মাগীটার তাও নেই। নিজেও সর্বস্বান্ত হয়েছে, আমাকেও সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। শবু ভরসা করে ঐ লোকটার কাছে একগাছা চুড়ি দুঘণ্টার জন্যও রাখতে পারল না আর উনি তার হাতে ভরি ভরি সোনা তুলে দিয়ে সস্তায় গয়না গড়াতে গেলেন। নাও এখন সব পিতলের পিণ্ডি।'

জানা গেল, লোকটা ঘণ্টা তিনচার বসে গয়না গড়িয়েছিল, তার কাজের

ফাঁকে ওরা এক সময় রান্নাঘরে বসে খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়। পরে লোকটা গয়না ওজন করে হিসেব বুঝিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যায়। আভার মনটা বরাবরই খুঁতখুঁত করছিল—সে নিজে সোনার বেনের ঘরের মেয়ে। পথচলতি অপরিচিত একটা লোকের হাতে সোনার কাজ তুলে দিতে সে চায়নি বিষ্ণুপ্রিয়াই একরকম জোর করে তাকে রাজী করিয়ে তারও কিছু গয়না ভেঙে গড়াতে দিয়েছিল। আজ সকালে আভা নতুন গয়নাগুলো নিয়ে স্থানীয় এক সোনার দোকানে গিয়েছিল যাচাই করাতে, তারা বলেছে সব পিতল, এক পয়সাও দাম নেই।

শবু বলল—'লোকটার চোখ দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া বাড়ীর উপর গয়না গড়াতে আমি কখনো দেখিনি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া সখেদে বলল—'তোর বর ত সরকারী অফিসে কাজ করে, জামাইকে একটু বলে দেখনা, পুলিশে খবর দিয়ে যদি কিছু করতে পারে। সবই আমার গ্রহের ফের।'

সে কি আর এখানে বসে আছে, নিশ্চয়ই কালকের ট্রেনেই পালিয়ে গেছে। দীননাথও শবুর ধারণাকে সমর্থন করল, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই।

শবুর বুদ্ধিতে ঠগের হাত থেকে নিজের গয়না বেঁচে গেছে। কিন্তু বন্ধকের ঘরে যেগুলো পড়ে আছে তার উদ্ধার এখনো হল না। টাকা পয়সার খুব টানাটানি চলছে। বিয়ের সময় যে ধার দেনা হয়েছিল তার কিছুই শোধ হয়নি বরং কিছু বেড়ে গেছে বোধ হয়। অনভিজ্ঞ হাতে সংসার করা, কুটুম্বিতা লোক লৌকিকতাও আছে। মাসে একটা সিনেমা না দেখালে জামাইয়ের শালা শালীদের কাছে প্রেষ্টিজ থাকেনা। মাইনে ত মোটে শ দেড়েক টাকা মাসে।

'শ্রাবণী, দেখ কে এসেছে।'

শবু রান্নাঘরে সকালের চা জল খাবারের পাট সেরে রান্নার যোগাড় নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দীননাথের ডাক শুনে রাস্তার দিকের বারান্দায় এগিয়ে এল।

'দেখ, আমার ভাই, তোমার এক দেওর ভব এসেছে। তোমরা দুজন বোধ হয় এক বয়সী। ভব আই এস্ সি পরীক্ষা দিয়ে এল, আর তুমি ত পরীক্ষাই দিলে না। ভালই করেছ, দিলে নির্ঘাৎ ফেল করতে।' দীননাথ পরিচয় দিল।

ভব ততক্ষণে রিক্সা থেকে নেমে শবুকে একটা প্রণাম করল। সম্পর্কে বড়

ত বয়স যার যাই হোক না কেন।

শবু হেসে ভবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে দীননাথকে বলল—'আমি কোন পরীক্ষায় ফেল করি নি।'

'দিলে বোঝা যেত'—হেসে বলল দীননাথ।

ভব বলল—'সেজবৌদি, বেশ তো চুপেচুপে বিয়ে করলে, আমরা আসতেই পারলাম না।'

শবু হেসে জবাব দিল—'ভাল কথা বললে। তোমার দাদার বিয়েতে কি আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করব?'

ভব একটা ঢোক গিলল—'না, তা নয়। মেজদার জন্যই কারো আসা হয়নি। মেজদাকে সবাই ভয় পায়, তাই তাকে কিছু জানানো হয় নি। তবু মনে হয় মেজদা সব বুঝতে পেরেছে। মাঝখান থেকে আমাদের বরযাত্রী ও বৌভাতের খাওয়া সব মাঠে মারা গেল।' বলছে আর মিটমিট করে হাসছে।

'তোমার বিয়ের সময় শোধ নিও।' কথাটা শবু হেসেই বলল। কিন্তু অচেনা মেজো ভাসুর সম্বন্ধে একটা ভীতি মনে বাসা বেঁধে রইল।

আর যে দেওরটি সদ্য এল সে কেমন? লম্বা নয়—বেশ বেঁটেই বলা যায়। গায়ের রং কালো। চোখ দুটো গোল গোল। মিটমিট করে হাসে। আবার শুরুতেই ঠেস দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

এ বাড়ীতে শবুদের মাত্র একখানাই ঘর; তাই বাবার মত ভবকেও থাকতে দেয়া হল সমুদ্রের ধারে অফিসের চিলেকোঠা ঘরে।

রাতের শোবার সময়টা ছাড়া ভব সারাদিন এ বাড়ীতেই কাটায়, খায় দায়, আড্ডা দেয়। শুভেন্দুদার এক ভাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে, সে-ও দুবেলা আসে। দীননাথ শবুকে পার্টনার করে নিয়ে চারজনে তাস খেলে বিকেলে সন্ধ্যায়। টুয়েন্টি নাইন, ব্রে, ব্রিজ—শবুর এই প্রথম তাস খেলায় হাতেখড়ি।

ভবর আর এক বন্ধু হয়েছে কানাই। সময় অসময় নেই, যখন তখন আসে—ভবকে 'ভবদা' বলে না ডেকে 'ভববাবু' বলে ডাকে। কানাই কত ছোট কিন্তু ভাবখানা এমন দেখায় যেন সে ভবর সমবয়সী। ভববাবুকে শহরের পথ ঘাট চেনাতে নিয়ে যায় গাইডের মত।

মাঝখানে জামাইবাবু সুশীল এসে মাত্র দুদিন শ্বশুর বাড়ীতে থেকে ছেলেসহ দিদিকে নিয়ে গেছে। মাসখানেক আগে দিদির একটি ছেলে হয়েছে, ঠাকুমা থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর সবাই খুশি হয়েছে—দিদির শ্বশুর চাটুয্যে মশাই

নাতির মুখ দেখে খুশি হয়েছেন। জামাইবাবু যেন আগের চেয়ে কিছুটা গম্ভীর হয়েছে। দিদি আবার বলছিল—এবার গিয়ে ওরা নাকি আলাদা সংসার পাতবে, মামা-মামীদের সংসারে আর থাকবে না। শবু চিন্তায় পড়ে গেছে দিদি একা একা বাচ্চা নিয়ে কি করে সংসার চালাবে।

আম জাম পেকে কাঁঠালও পাকতে শুরু করেছে। জামাই ষষ্ঠী এসে পড়ল। শবুর বিয়ের পর এই প্রথমবার। দিন পনরো আগে সুশীল চলে গেল বলে মা-র খুব আফশোষ। এখন বড় মেয়ে জামাই নাতি না থাক—মেজো মেয়ে, জামাই ও তার ভাই ভবরও নেমন্তন্ন হয়েছে।

মা থালা বাটি ভর্তি করে খাবার সাজিয়ে জামাই ও তার ভাইকে খেতে দিয়েছে—দুজনে খাচ্ছে। শবুরা ক ভাইবোন সেই ঘরে বসে ওদের খাওয়া দেখছে—ও বাড়ী থেকে ঠাকুমাও এসেছেন।

হঠাৎ কানাই বলল—'দেখুন ভববাবু, আমরা কী খাই। আর আপনারা নেমন্তন্ন করে কী যে খাওয়ান!'

কানাইকে নিয়ে আর পারা যায় না, একটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

ভব হেসে বলল—'তোমাকে আবার নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হল কবে? তোমার ত নেমন্তন্ন লাগে না।'

সবাই হাসছে কানাইয়ের বোকামীতে। মা তাড়াতাড়ি বললেন—

'তুমি কিছু মনে কোরোনা, বাবা। ওর কথাবার্ত্তা ঐরকমই।'

মা মেয়ে জামাইকে শাড়ী ধুতির সঙ্গে ভবনাথকেও একটা ধুতি দিলেন।

শবু ভবকে বলল—'বরযাত্রীর খাওয়া জামাই ষষ্ঠীতে পুষিয়ে দেয়া হল, বুঝলে? সঙ্গে একখানা ধুতি ফাউ।'

জামাই ষষ্ঠীর সপ্তাহ তিনেক পরে রথ। এই মন্দির শহরের রথের খুব নাম ভারত জুড়ে—লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসে রথ দেখতে। মা প্রতি বছরই পুঁঠিয়ার রাণীর মন্দির থেকে রথ দেখে, এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ খুব। শবুরাও সঙ্গে যেত—বছর চারেক আগে পুলিশ-নাগাসন্ন্যাসীতে যে ভীষণ মারপিট হয়েছিল তারপর থেকে শবুরা আর যায় না। এবার দীননাথ বলেছে সে পাস যোগাড় করেছে মঠের ব্যালকনি থেকে সবাইকে রথ যাত্রা দেখাবে। রথের দিন মা ভাইবোনদের নিয়ে শবুরা গিয়ে ব্যালকনিতে বসল।

ব্যালকনি থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে রথে তোলার অনুষ্ঠান 'পহণ্ডি' খুব ভাল দেখা গেল। মা সবাইকে কার কোনটা রথ চিনিয়ে দিলেন—ষোল

চাকার সব চাইতে বড় রথ হল জগন্নাথের—নাম নন্দীঘোষ, চৌদ্দ চাকার তালধ্বজ নামের রথ হল বলভদ্রের আর বারো চাকার দেবীদল রথ হল সুভদ্রার। দারুমূর্তি সব রথে তোলা হলে রাজা এসে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মার্জনা করে গেলেন। মন্দিরের বড় পাণ্ডা পুরোহিতের নির্দ্দেশে এবারে রথের টান শুরু হল, লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল রথের রশিতে টান দিতে। প্রথমে বলভদ্রের রথ কিছুটা এগিয়ে গেলে টান পড়ল সুভদ্রার রথে। সবশেষে ষোল চাকার জগন্নাথের রথের পালা। একসঙ্গে বেজে উঠল সহস্র কাঁসর ঘণ্টা ধামা ঢোলক খোল করতাল মৃদঙ্গ খঞ্জনী শঙ্খ শিঙা ডমরু বিষাণ, আওয়াজে আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে, পাখীরা সব ভয়ে উড়ে পালাচ্ছে, সকলের কানে লাগছে তালা। ভক্তরা আওয়াজ তুলছে 'জয় বলভদ্রজীকি' 'জয় সুভদ্রা মাইকি' 'জয় জগবন্ধু—জগতের নাথ'। জগন্নাথের রথও এগিয়ে চলল। ভক্তরা সব পথের ধুলায় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এখানকার অনুষ্ঠান শেষ। তিনটি রথ এগিয়ে চলেছে গুণ্ডিচা বাড়ীর দিকে। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই, কোন জাতি অচ্ছুৎ নয়—এসেছে সাধু সন্ত, সন্ন্যাসী গৃহী, বৈষ্ণব শৈব শাক্ত, শক্ত অশক্ত, ধনী নির্ধন দেশ জাতি ভাষা নির্বিশেষে এমন কি সাগর পারের লোকও এসে যোগ দিয়েছে এই রথযাত্রা উৎসবে। রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। সবাই দুর্লভ পুণ্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

নয়

ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে আবার আসছে শ্রাবণ মাস—শবুর জন্ম মাস। শবুদের বাড়ীতে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ নেই, দীননাথের পরিবারেও নাকি ওসবের চল নেই। সুতরাং বিয়ের পর শবুর জন্মদিনটি সবার অগোচরেই এসে চলে যাবে। তবু যাহোক দিনগুলো হেসে খেলে ঘরকন্না করে একরকম কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু শবুর ভাগ্যে যে সবই বিপরীত ফলে।

কলকাতা থেকে একঝাঁক চিঠি এসেছে—দুঃসংবাদ আর দুঃসংবাদ। চিঠি এসেছে বাবা কালীনাথের কাছ থেকে, দেওর মহীনাথের কাছ থেকে আর ছোট ননদ শেফালীর কাছ থেকে। সব চিঠির মূল কথা—ভব পরীক্ষায় ফেল করেছে, আর মেজো ভাসুর বিশ্বনাথের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মহীনাথ

একটা বস্তিমত বাড়ী ভাড়া করে বাবা মা ভাইবোনেদের নিয়ে সেখানে উঠেছে। দীননাথের উপর চাপ এসেছে মাসে মাসে বেশী করে টাকা পাঠাতে হবে, ভবকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করাতে হবে।

ভাগ্যের কি পরিহাস! শুধু শুধু অর্থদণ্ড যাবে বলে শবু পরীক্ষা দিল না, আর আংটি বোতাম বন্ধক দিয়ে যার পরীক্ষার ফী পাঠানো হল সে-ই পরীক্ষায় ফেল করে এখানে মুখ চুন করে বসে আছে। সে বন্ধক এখনো ছাড়ানো যায় নি, ধার দেনাগুলোও মাসে মাসে বেড়ে চলেছে বিনা সুদেই। বেশী করে টাকা পাঠানো অসম্ভব। দিশেহারা দীননাথ রাতে শবুকে বলল—

'আমাদের একবার কলকাতা যাওয়া দরকার যদি কিছু মিটমাট করা যায়। ভবকে কলেজে আবার ভর্ত্তি হতে এখনই কলকাতা যেতে হবে—তুমিও তার সঙ্গে কলকাতা যাও। দিন দশেক বাদে আমার রাঁচি যাবার কথা আছে যাতায়াতের পথে দুবার কলকাতা যাব, ফেরার সময় তোমাকে নিয়ে আসব। পনেরোদিন মত তোমাকে ওখানে থাকতে হবে। পারবে না?'

না পারলেও পারতে হবে শবুকে, বিয়ে যখন হয়েছে, অন্য সংসারে এসেছে তখন সেখানকার ভালমন্দও তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। 'না' বললে ত চলবে না। দীননাথ আরও জানাল—পূজোর সময় কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে পরে আবার কলকাতায় যাবে। তবে ত ভাবনা চিন্তা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে—শবুই বা অন্য মতামত কি দেবে?

পরদিন দুপুরে শবু ওবাড়ীতে গিয়ে মা বাবাকে সব কথা বলল। সবার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল। তবু একটু ভরসা যে প্রথমবারে সে যাচ্ছে মাত্র দু সপ্তাহের জন্য, পূজোর সময়ও ছুটিতেই যাবে আবার তারা ফিরে আসবে। মার মন তবু খুঁত খুঁত করে—মেয়ে প্রথমবার শশুর বাড়ী যাচ্ছে দেওরের সঙ্গে, স্বামী সঙ্গে থাকবে না। অবোধ মেয়েটা বুঝি বা কি বিপদেই পড়ে।

আর একদিন পরে শবুকে কলকাতা যেতে হবে। সেখানে কি দেখবে আরো কি ঘটবে কে জানে। তার উপরে কথা হল বিয়ের পর এই প্রথম শবু স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকবে—বুকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করে চোখে জল আসে। রাতে শবুকে কাঁদতে দেখে দীননাথ ব্যথিত হয়ে বলল—

'কি করি বল। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারই কি ভাল লাগবে? কটা দিন পরেই আমাদের দেখা হবে—তুমি ভেবো না।' আদরে শবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার বলল 'যত যাই হোক না কেন তুমি আর আমি সব

সময় এক থাকব, কেউ কাউকে ভুল বুঝব না। তাহলে আমরা সুখে না থাকলেও আমাদের শান্তি নষ্ট হবে না কিছুতে।'

শবু পরম নির্ভয়ে স্বামীর বুকে মাথা গোঁজে—একে অপরের কাছে পেতে চায় আশ্বাস আর সান্ত্বনা। শবু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার স্বামীর উপর আর স্বামীও শবুকে মনে করে একান্ত আপন, একমাত্র অবলম্বন। দুটি লতা যেন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইছে, বেড়ে উঠতে চাইছে।

রওনা হবার আগে সারাটা দিনই শবু মার কাছে কাটাল—সেখান থেকেই খেয়ে রওনা হবে। শবু কলকাতা যাচ্ছে শুনে ঠাকুমা, বড়মাসী এসে নানা কথায় তার মনে সাহস যোগাতে লাগলেন। মা শ্বশুরবাড়ীতে করণীয় কাজ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। ভাই বোনেরা তাদের আদরের মেজদি কতদিনের জন্য কত দূরে চলে যাচ্ছে বলে খুব মনমরা। বাবা নিয়মমত চারটের সময় ডাক্তারখানায় গিয়েছিলেন, রওনা হবার একটু আগে আবার বাড়ীতে এলেন। এটা বাবার পক্ষে বিশেষ ব্যতিক্রম—আদরের মেয়ে শবু আজ প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে, তিনি কি না এসে পারেন? সবাইকে প্রণাম করতে গিয়ে শবু কেঁদে ভাসাল। মা আদর করে চুমু খেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

'অত কাঁদে না মা। দেখতে দেখতে দু সপ্তাহ কেটে যাবে, দীনু তোকে সঙ্গে করে ফিরে আসবে—তখন তোর কাছে সব শুনব।'

দীননাথ নন্দু কানাই ও তপুকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে উঠিয়ে দিতে এসেছে। গাড়ী ছাড়ার মুখে তার মুখটাও করুণ দেখাচ্ছে ভীষণ। শবু দীননাথকে প্রণাম করল, সে তার ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে অল্প একটু উঁচু করল সবার অলক্ষ্যে।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গাড়ী এগিয়ে যেতে লাগল—জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা শবুর দৃষ্টি দীননাথকে দেখতে দেখতে নিজেরই চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল। দীননাথ সঙ্গে থাকলে সে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে। তার দু চোখ বেয়ে হু হু করে জলের ধারা বয়ে চলেছে। পাশের সীটে ভব বোকার মত বসে বসে দাঁতে নখ খুঁটছে। প্রায় সারাটা পথই কেঁদে ও না ঘুমিয়ে সকালে শবু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল।

দশ

কলকাতা শবুকে অভ্যর্থনা জানাল বড় অদ্ভুত ভাবে। হাওড়া স্টেশনে নেমে শোনে সেদিন সারা রাজ্য জুড়ে হরতাল ধর্মঘট—দোকান পাট বন্ধ, গাড়ী-ঘোড়া অচল। অথচ যেতে হবে প্রায় দশ মাইল দূরে কলকাতার উত্তর উপ-কণ্ঠে দমদমে। বলতে গেলে শবুর এই প্রথম শ্বশুর বাড়ি আসা—আর এসেই এই বিভ্রাট! সারা কলকাতা যেন অচল অবসন্ন—একি শবুর ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্দেশক!

ট্রেন থেকে যত লোক নেমেছে সবাই অসুবিধায় পড়েছে। প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে বলে আবার শবুর সঙ্গে আছে ট্রাঙ্ক বেডিং। মাঝে মাঝে দু একটা ট্যাক্সি আনাগোনা করছে। হরতালকারী স্বেচ্ছাসেবকরা ওদের মালপত্তর দেখে ও অনেক দূর দমদমে যাবে শুনে একটা ট্যাক্সি ধরে দিল।

গাড়ী কোন পথ দিয়ে কোন দিকে চলেছে শবুর কোন ধারণা নেই, প্রায় লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়া শূন্য ফাঁকা পথ দিয়ে গাড়ী চলেছে। পাশে বসে ভব হাওড়া পুল থেকে আরম্ভ করে পথের ধারের বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে ও বলে যাচ্ছে। শবুর চোখ কান সেদিকে থাকলেও মন পড়ে আছে পিছনে ফেলে-আসা আজন্ম পরিচিত শহরে, বাবা মা ঠাকুমা ভাই বোন আর জীবন-সাথী দীননাথের চিন্তায়।

নতুন বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী আসা যাকে বলে শবু তা আসেনি—সাত আট মাসের পুরোনো হয়েই এসেছে। তাই মঙ্গলঘট শঙ্খ উলুধ্বনি ধান দূর্বা নিয়ে কেউ অভ্যর্থনা করবে না সে জানে। এরা আবার এ পাড়ায় নতুন তাই প্রতিবেশীরাও ফিরে তাকাবে না এইটাই ত স্বাভাবিক। সে সবই ঠিক আছে। কিন্তু এ কি বাড়ী, একি সংসারের চেহারা!

বস্তিমত এক ব্যারাক বাড়ী, লোকে বলে এককালের মিলিটারী ব্যারাক চিঠির ঠিকানাতেও সে কথা লেখা থাকে। তারই এক প্রান্তে দুখানা ঘর নিয়ে এদের আস্তানা। বর্ষাকাল—চারদিকে জলকাদা। উঠোনে ইট পেতে কয়েক পা গিয়ে একটা রান্নাঘরের চালা, তার পাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা চটের পর্দা টাঙানো একটা বাথরুমজাতীয় কিছু। পায়খানাটা অনেকটা দূরে এক ডোবার ধারে—বহুলোকের ব্যবহার্য্য, আর ঐ ডোবার জলেই স্নান ও অন্যান্য

কাজ। শবুরা দাদুর বাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে যে বাড়ীতে উঠে এসেছে তার চেহারাও খুব একটা ভাল নয়—যদিও সেখানে সব ব্যবস্থা অন্যরকম। এটা ত ভাড়া বাড়ী, কি করা যাবে।

এ সব ত বাইরের ব্যাপার। কিন্তু বাড়ীর মানুষগুলো কেমন? হরতালের দিন তাই সকলে বাড়ীতে আছে, শুধু মহীনাথ তিন মাইল দূরে তার অফিসে হেঁটেই রওনা হয়ে গেছে।

শবু শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। বাবা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বিড় বিড় করে কি উচ্চারণ করলেন ঠিক বোঝা গেল না। মাকে মনে হল এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে প্রণাম নেবারও তাঁর অবসর নেই—কুশল প্রশ্ন ত দূরের কথা। শেফালী ও সোমনাথ একটু হেসে প্রণাম করল—ঐ টুকুই শবুর অভ্যর্থনা। পরে বাবা একটু একটু করে কিছু কুশল প্রশ্নাদি করলেন।

পিছন দিকে বহুদূর পর্যান্ত ধানের ক্ষেত ঠিক বাড়ীর সীমানা থেকেই। সেখানে চাষীরা মাঠে কাজ করছে। আশ্চর্য্য, চাষীরা সব বাংলায় কথা বলছে! শবুর ধারণা তার ধাইমা হোতার মা, রামুদার মত ভাষা ভাষীরাই বুঝি চাষ আবাদ করে। মাঠের বুক চিরে একটা রেললাইন চলে গেছে।

বেলা দশটা এগারোটার মধ্যে রান্না সেরে কারো খাওয়া না হতেই নিজে খেয়ে নিয়ে মা একটা পুঁটলিতে কি যেন বেঁধে নিয়ে বেরোবার মুখে হরতাল-ওয়ালাদের মুণ্ডপাত করে গজগজ করতে লাগলেন—

'আজ সব গাড়ী ঘোড়া বন্ধ, ট্রেন পাব কিনা, হয়ত সারাটা পথ হেঁটেই যেতে হবে কে জানে।' পরে হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে 'কাল ভোরে আসব' বলে পুঁটলি হাতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

পরে শবু শুনল শেফালীর মুখে—'দুঃখে কষ্টে মা ঐ রকম হয়ে গেছে।'

'কোথায় গেলেন?'

'রোজ ঐ রেললাইনের ট্রেনে করে পাঁচ ছ মাইল দূরে এক রিফিউজী কলোনীতে মার এক দাদা থাকে সেখানে যায় আর পরদিন সকালে আসে।'

বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! শাশুড়ীর অবর্তমানে শ্বশুর মশাই অনেক কথা বার্ত্তা বললেন, পাকিস্তানে কবে গিয়েছিলেন, সেখানে কি কি হল, কবে নাগাদ ফিরলেন এই সব আর কি। শুনতে শুনতে শবুর মন কিছুটা হাল্কা হল। দুপুরে স্নান খাওয়া বিশ্রামের মাঝে শবু তার দেওর ও ননদ সবার নামের সঙ্গে ভালকরে পরিচিত হল—মহীনাথ—মহী, ভবনাথ—ভব, সোমনাথ—সোনা আর শেফালী থেকে শেলী, গল্পও হল সারাদিন। শেলী হল ভব

সোনার ছোড়দি কিন্তু ওরা তাকে শুধুই দিদি বলে।

মহী ফিরল প্রায় সন্ধ্যায় সময়। এরা সবাই তাদের বৌদিকে প্রথম দেখছে। মহী বলল—

'আরে বৌদি, আপনি এসে গেছেন? বেশ বেশ' বলে একটা প্রণাম করল। হরতালের মধ্যে কি করে ওরা হাওড়া থেকে এল শুনে বলল— 'দেখুন দেখি, আপনি প্রথম কলকাতায় এসে কি ঝামেলায় পড়েছিলেন। আমি ভাবতে পারিনি আজ কেউ হাওড়া থেকে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে নিশ্চয়ই।'

এই দেওরটিকে প্রথম দর্শনে শবুর মন্দ লাগল না—বেশ যেন সরল সাদা-সিধে আর লাজুক প্রকৃতির। কিছুটা ছেলেমানুষ গোছের। শেলী ভব সোনা শবুকে তুমি বললেও শবু লক্ষ্য করল মহী তাকে আপনি বলছে। শবু ঠিক করল সেও তাকে আপনি বলবে—বয়সে ত শবুর থেকে বড়ই, হলই বা দেওর। শেলীও শবুর থেকে বড়।

পরদিন থেকে শেলী ভব ও সোনা তাদের সেজবৌদিকে নিয়ে পায়ে হেঁটে সারা দমদম বরানগর চষে বেড়াতে লাগল। দুপুরে মা রান্না-খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে, অবশ্যই শবু হেঁসেলে ভর্তি হয়েছে কিছু নতুন ধরনের রান্নায় হাতেখড়িও হচ্ছে, মহী খেয়ে অফিস চলে গেলে পর যথারীতি মা বেলা এগারটা নাগাদ খেয়ে বেরিয়ে যান। বাবার স্নান আহ্নিক হয়ে গেলে শবু তাঁকে যত্ন করে খেতে দেয়। তারপর বাকি চারজনে খেয়ে বেড়াতে বের হয় যত সব আত্মীয় স্বজনের বাড়ী।

ওদের ছোটমাসী, এক বড়কাকীমা-যাঁর স্বামী রাঁচির হাসপাতালে আছেন তিনি, তাঁর মেয়ে জামাই আর কিছু দূর সম্পর্কের আত্মীয়—সব খানেই শবুর পরিচয় সেজবৌদি—শ্রাবণী বৌদি। সেজ বৌদি এসেছে খবর পেয়ে মেজোননদ ননদাই প্রথম মেয়েটিকে কোলে করে এসে দেখা করে গেল। মেজোননদ কর্তারা থাকে কালীঘাটে ভাড়া বাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসুর দেওর ননদদের নিয়ে। সবাই শবুর রূপের প্রশংসা করে শুধু ছোটমাসী একটু ঠোঁট বাঁকালেন—

'হ্যাঁ সুন্দরী, তবে বড্ড রোগা পাতলা—আমার সীতুর মত ফিগার নয়।'

পথে আসতে শেলী বলল—'মাসীমা একটা বিশ্ব-নিন্দুক যাকে বলে।'

শবু ভাবে, মা কি কিছু ব্যতিক্রম? কথাই তেমন একটা বলেন না, প্রশংসা ত নেই-ই।

দু তিনটে সিনেমা দেখাও হয়ে গেল। সব চাইতে অসুবিধে হয় শবুর ঐ ডোবাটায় স্নান করতে সবার সামনে, আর তার উপর সে সাঁতার জানেনা। ঘাটে বসে দুচার ঘটি জল গায়ে মাথায় ঢেলে স্নান সারতে হয় না হলে বালতি করে জল নিয়ে গিয়ে বাথরুমজাতীয় ঐ ঘেরা জায়গাটায় স্নান করা। আর পায়খানার কথা না বলাই ভাল, ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি যেতে পারল ত ভাল, না হলে সেটাও বাদ।

কোনরকমে দশটা দিন যেতে দীননাথ এল। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে তার খুব ভাল সম্পর্ক, সবার সঙ্গে হাসি গল্প করল। মা বাবার সঙ্গে কিছু কথা বলল। বিকেলে শবুকে নিয়ে ছোটমাসীর বাড়ী গিয়ে দেখা করে এল। মাসীর বড় ছেলের বিয়ে হবে সামনের অঘ্রানে। শবু প্রথমবার শেলীর সঙ্গে এসে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে গেছে মাসীকে, ননদের বাক্স শেলীর দখলে গেছে। রাতে মহীর সঙ্গে দীননাথ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল।

ছোট ঘরটায় মেঝেতে শবুদের বিছানা পাতা হয়েছে। সে রাতে দীননাথ শবুক জিজ্ঞেস করল—'এখানে কেমন লাগছে?'

শবু বলল—'অনেক জিনিষই কেমন অদ্ভুত আর নতুন নতুন লাগছে।'

দীননাথ বলল—'প্রথম প্রথম ত তাই।'

পরদিন সকালে দীননাথ কোথায় বেরিয়ে গেল, ফিরল দুপুরে। বিকেলে রাঁচি রওনা হয়ে গেল, বলে গেল তিন দিন পরে ফিরবে।

আবার শবু এত লোকের মাঝেও একা। কবে দীননাথ ফিরবে সেই আশায় বসে আছে। কেমন যেন দমবন্ধ করা অবস্থা মনে হয় তার। বাবা ও দেওর ননদ সব মোটামুটি একরকম—কিন্তু মা এসে যেটুকু সময় থাকেন তখনই যেন পরিস্থিতিটা কেমন অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সব সময় সবাইকে ধমক দিয়ে কথা বলেন, উচ্চ স্বরগ্রাম, সবাই যেন তটস্থ তাঁর উপস্থিতিতে। বাবার সঙ্গে একবারও কথা বলতে দেখা যায় না।

পরদিন বেলা দুটো নাগাদ এক ভদ্রলোক এলেন, অফিসের পোষাক পরা মাথায় টুপী, ধপ-ধপ করছে গায়ের রং, নাকটা খাড়া উঁচু। শেলী সোনা তাকে ঘরে নিয়ে এসে বসাল। ইনিই কি শেলীদের মেজদা?

শেলী পাশের ঘরে এসে শবুকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'মেজদা'।

শবু তবে ঠিকই আন্দাজ করেছে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে সে দূর থেকে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করল। হঠাৎ একটা দরদী কণ্ঠ শোনা গেল, মেজদা বলছে—

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবার খাওয়া হয়েছে ত?'

মা বাড়ীতে নেই, মহী অফিসে গেছে। মেজোভাসুর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—'মহী ঝগড়াঝাটি করে এরকম একটা বস্তিতে সবাইকে নিয়ে এল আর আপনারাও তাই মেনে নিলেন। ওদিকে অতবড় বাড়ীটা নিয়ে আমি একা আছি। দীনু কাল আমার ওখানে গিয়ে দেখা না পেয়ে আমাকে চিঠি লিখে রেখে এসেছে। তারও এই বস্তির পরিবেশ পছন্দ নয়। শেলী সোনা তোরা বৌমাকে নিয়ে চল এখন ওবাড়ীতে, অনেক কথা আছে।'

বাবা আর ভব বাড়ীতে রইল, শবু শেলী সোনা মেজদার পিছুপিছু ওবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

বরানগরে একটু বর্দ্ধিষ্ণু এলাকায় দোতলায় একখানা ফ্ল্যাট। পাশেই ন্যাশানাল সাউণ্ড স্টুডিও, সেখানে নাকি সিনেমার ছবি তোলা হয়। বড় ছোট মিলিয়ে তিনখানা ঘর, ছাদে চিলেকোঠার পাশে রান্নাঘর। মেজদা ডিউটি করে ক্যান্টিনে খেয়ে এসেছিল। শেলী শবু রান্নাঘরে চা করতে গেল, সোনা গেল দোকান থেকে সিঙাড়া মিষ্টি আনতে। রান্নাঘরে চা করা থেকে শোবার ঘরে এসে চা জলখাবার খাওয়া পর্য্যন্ত মেজদা ওদের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে আর অনর্গল কথা বলছে। ঘরে একটা কাঁচের আলমারী, চৌকি, একটা চেয়ার ও টেবিল, টেবিলের উপর একটা অর্ধসমাপ্ত রেডিও কেবিনেট খোলা অবস্থায়। মাঝে মাঝে সেটার সুইচ ঘোরাচ্ছে, কখনো বাজছে বা নানা শব্দ বের হচ্ছে রেডিও থেকে আবার সুইচ বন্ধ করে খুটখাট করছে, আবার চালাচ্ছে, আবার বন্ধ করছে। কথা বলছে সব স্বগতোক্তির মত—

মহী একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে সবাইকে নিয়ে চলে গেল। দীনু বিয়ে করে এখন বিশেষ টাকা পয়সা পাঠাতে পারছে না। দুজনের রোজগারে সাতজনের সংসার, একটু টানাটানি চলছেই। ভব পরীক্ষায় ফেল করল, আর দুজনের পড়াশুনার খরচ আছে। এরই মধ্যে গুছিয়ে চলতে পারলে চলে। কিন্তু কে চালাবে? .....

বাড়ীটার একটা বাঁধন নেই, মা উড়নচণ্ডী—শেলীর ঘাড়ে সংসারের দায় চাপিয়ে তার কোন এক দাদা আছে, পাতানো না দূর সম্পর্কের, তার দেখা-শোনা নিয়ে ব্যস্ত। দুটো পয়সা হাতে এলেই সেই দাদার সংসারে ঢালবে। সে মাতুল নাকি মস্তবড় জমিদার ছিল অথচ দীনুকে প্রথম কলেজে পড়ার জন্য তার পাবনা শহরের বাড়ীতে রাখতে রাজী হয়নি, আর এখন থাকে এক রিফিউজী কলোনীর জবর দখল করা জমিতে। আমাদের কষ্টের পয়সায় ভাগ না বসালে তার সংসার চলে না।......

আর এক মস্তর দেনেওয়ালী হলেন ছোটমাসী, কাছাকাছি থাকে দিনরাত কুট পরামর্শ দিচ্ছে আর বড় বড় বাক্যি ঝাড়ছে। সংসারটা গোল্লায় যেতে বসেছে।… ..

দাদা করবীর বিয়ের দশভরি সোনার দায় মাথায় নিয়ে আছে, বিদেশে থাকে। তার কাছ থেকে এখন কিছু আশা করাই অন্যায়। আর সে যদি কিছু পাঠায়ও, সব ত যাবে ঐ মাতুল গুষ্টির পেট ভরাতে, কলোনীতে তাদের বাড়ী তৈরী করতে।…

সব কথা শবু অবাক হয়ে শুনে যায়, কোন কথা বলেনা, বলার অধিকার-ও নেই এসব ব্যাপারে। এ সংসারের সে কতটুকুই বা জানে? শেষে মেজদা শেলীকে বলল—

'দীনু রাঁচি থেকে ফিরলে বলিস সবাইকে যেন আবার এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ঐ বস্তিতে কি কেউ থাকতে পারে? একান্নবর্ত্তী হয়ে না থাকলে এ বাজারে ভদ্রভাবে বাঁচা যাবে না।'

বরানগর থেকে বাড়ী ফিরতে ওদের বেশ রাত হয়ে গেল। শবু ভাবতে লাগল, শাশুড়ীর মুখে শুনেছিল তাঁর মেজোছেলে নাকি ভীষণ রাগী, বদমেজাজী। এতক্ষণ যে ওরা তিনজন ওবাড়ীতে ছিল, কাউকে ত কোন রাগ দেখায়নি। বরং পথে আসতে শেলীদের মুখে শুনেছে মেজদা সব সময় তাদের ভালমন্দর কথা চিন্তা করে, শুধু রেডিওর কাজ করার সময় ঠিকমত না হলে নিজের উপরই রেগে যায়, গরম আয়রণ দিয়ে নিজের হাতেই ছেঁকা দেয়, কাছে থেকে সাহায্য করতে সময় ভব সোনারাও অনেক আয়রণের ছেঁকা খেয়েছে। সে ত অন্য ব্যাপার। কিন্তু কথাগুলো যা বলেছে, সত্যি হলে ত খাঁটি কথাই বলেছে। বোধ হয় স্পষ্ট কথা বলে বলে' কেউ কেউ পছন্দ করে না। সত্যিই ত, মেয়েমানুষ যদি এরকম হয় তবে ঘরের বাঁধন থাকবে কি করে?

যথা সময়ে দীননাথ রাঁচি থেকে ফিরল। সেদিন রবিবার। রাতের গাড়ীতেই শবুকে নিয়ে কার্য্যস্থলে ফিরে যাবে। মেজদার কথা সব শুনে মহীকে বলল—

'তোরা সব বরানগরে ফিরে যা, এভাবে আলাদা থেকে বাঁচা যাবেনা।'

মহী বলল—'একসঙ্গে থাকতে পারি তবে ও বাসায় নয়, সেদিনের ঘটনায় পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে না।'

দীননাথ বলল—'দুটো বাড়ীর ভাড়া গুণে আলাদা সংসার কি করে চলবে? আমি ত থাকি বাইরে।'

মহী বলল—'ঠিক আছে, আর সবাই ও বাড়ী চলে যাক। আমি এবাসা ছেড়ে দিচ্ছি, যতদিন অন্য বাসা ঠিক না হয় আমি মেসে হোটেলে খেয়ে থাকব। অন্য বাসা ঠিক করুক তারপর আমি আসব।'

কি আর করা যাবে, সবাই নিজের নিজের মত আঁকড়ে থাকলে কিছু করার থাকে না। মাকে সে কথা জানাতে তিনি বললেন—

'আমিও সে বাড়ীতে যাব না ঐ দুর্মুখ মেজোছেলের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে। যদি অন্য বাড়ীতে সবাই একসঙ্গে থাকে তবে যেতে পারি।'

এই কি মায়ের মত কথা! কোথায় তিনি সংসারটাকে এক করে সবাইকে মানুষ করার চেষ্টা করবেন, তা নয়, তাঁর মুখেও ভাঙনের সুর। দীননাথ বিরক্ত হয়ে বলল—

'এ রকম হলে কি করে চলে? আমরা এত কিছু রোজগার করিনা যে সবাই আলাদা থাকব আবার বাবা মা ভাই বোনদের দেখব পড়াশুনার ব্যবস্থা করব। বড়দা আর আমাকে চাকরির জন্য বাইরে থাকতে হচ্ছে—এখানে যারা আছে সবাইকে একখানে থাকতে হবে তবেই এদের পড়াশুনা ঠিকমত চলতে পারে।'

মা বললেন—'তোদের যা ইচ্ছা হয় কর। যতদিন ওবাড়ীতে থাকবে মাঝে মাঝে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে আসব। নতুন বাসা ঠিক হলে তখন দেখা যাবে।'

মা খেয়ে দেয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দীননাথ শেলী ভব সোনাদের মনোভাব জানতে চাইল—তাদের কোন আপত্তি নেই, বরং ও বাড়ীতে থাকার আগ্রহই বেশী প্রকাশ করল। দীননাথ তখন বাবাকে বলল—

'বাবা, আপনি এদেরকে নিয়ে বরানগরে চলে যান মেজদার বাসায়, মহী এবাড়ী ছেড়ে দেবে। আর ওদিকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য বাসা খুঁজে নিতে বলবেন।'

বাবা একেবারেই ভালমানুষ, অশক্ত, নাই কোন রোজগারপাতি—ছেলেরা যা সিদ্ধান্ত নেবে তাঁর বলার কিছু নেই শুধু সবাইকে কাছে পেলেই তাঁর শান্তি। ছেলে মেয়েদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ—তারাও বাবাকে কোন অসম্মান করে না। দীননাথ জানালো, পূজোর আগ দিয়ে মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে আবার আসবে তখন যা হয় দেখা যাবে।

এইসব ঠিকঠাক করে রাতের গাড়ীতে দীননাথ শবুকে নিয়ে কার্য্যস্থলে রওনা হল। শবু এদিকে বাবা মা ভাই বোনদের দেখতে পাবে ভেবে আনন্দিত। আবার শ্বশুর মশাইয়ের অসহায় অবস্থা ছোট দেওর ননদদের দুর্গতি দেখে মনে ব্যথা পায়। মনটা পড়েছে দোটানায়। এর মধ্যে শবুর জন্মদিন কবে এল আর গেল খেয়ালই রইল না।

মন্দির শহরে এসে শবু মা বাবার কাছে রইল, সারাদিন সেখানে থেকে রাতে খেয়ে রাধাকুটীরে যাবে। খবর পেয়ে দুপুরে ও বাড়ী থেকে ঠাকুমা এসেছেন।

মা বললেন—'জানিস শবু, মাস দুয়েকের মধ্যে নতুন বাড়ীর দোতলায় দুখানা ঘর তৈরী হয়ে যাবে, তখন আমরাও সেখানে চলে যাব।'

খুব ভাল কথা, এতদিনে সকলে আবার একখানে হবে। কিন্তু কলকাতায় ঐ সংসারের যে হাল দেখে এল তার কি উপায় হবে ?

ঠাকুমা বললেন—'এখানকার কথা পরে হবে। সেখানে গিয়ে নাতনী আমার কি সব দেখে শুনে এল তাই শুনি। বল শবু।'

শবু এক এক করে দিয়ে সব ঘটনার কথা বলে গেল। মা ঠাকুমা গালে হাত দিয়ে সব শুনলেন। ঠাকুমা মন্তব্য করলেন—

'আশ্চর্য্য, এমন মেয়েমানুষও হয় নাকি! নিজের সোয়ামী ছেলে মেয়েদের জন্য কোন টান নেই—কোন এক দূর সম্পর্কের ভাই না দাদা তার জন্য যত দরদ! তোর মেজোভাসুর ত কোন অন্যায় কথা বলেনি।'

মা জিজ্ঞেস করলেন—'তোর শাশুড়ী তোর সঙ্গে কথাটথা বলেছে ত ?'

হ্যাঁ, তা বলেছেন বৈকি, সে সবই রান্নার কথা না হয় বাড়ীর কাজকামের কথা। সে ত লোকে বাড়ীর ঝি চাকরের সঙ্গেও বলে। নাই কোন আন্তরিকতা, নাই আবাহন—নাই বিসর্জন।

বাবাও সব কথা শুনছিলেন, বললেন—'শবুর কপালে বোধহয় সুখ নেই। দীননাথ যদি ভাল হয় তবেই যেটুকু ভরসা।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

এবারে বোধহয় মাসখানেকও থাকা হল না। দীননাথের পয়লা তারিখ থেকে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। তিন মাস শুধু শুধু ভাড়া না গুণে রাধাকুটীয়ের বাসা ছেড়ে দেওয়া হবে, ছুটি থেকে ফিরে নতুন বাসা খুঁজে নেবে। এখন টাকা পয়সার খুব টানাটানি, তবু ত মাসে ত্রিশটা করে টাকা বাঁচবে।

দীননাথ শবুকে বলল—'এবারে আমরা কলকাতার পূজো দেখব। তুমিত দেখনি, দেখবে।'

শবুর তাতে খুব কমই উৎসাহ। বিয়ের পর প্রথম পূজো, বাপের বাড়ীতে থাকতে পারবে না—ভাবতেই খারাপ লাগে।

ওদিকে সে কথা শুনে মা'র বুক আশঙ্কায় কাঁপছে—কি এক অজানা বিপদ বুঝি একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আদরের মেয়েটার দিকে। একদিন জামাইকে বললেন—

'বাবা দীনু, সরকারী চাকুরেরা শুনেছি বদলি নিতে লম্বা ছুটি নেয়। তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না? তাই বদলির চেষ্টা করছ কি?'

দীননাথ আন্তরিকভাবে বলল—'না, মা, এর মধ্যে বদলির কোন কথা নেই। বাড়ীতে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে, দেখি ছুটিতে গিয়ে যদি কোন সুরাহা করতে পারি।'

মা বললেন—'সে ত ঠিকই, নিজের বাবা মা ভাইবোনদের কথাও ত ভাবতে হবে।'

শবুরা আবার কলকাতা যাবে শুনে ভাই-বোনরা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল। নন্দু রীতিমত কাঁদতে লাগল। সে চিরকালই লাজুক আর মুখচোরা প্রকৃতির কোন আনন্দের ব্যাপারেও কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না-খুবই সংযত। কিন্তু মেজদি যাবে শুনে সে এত কাঁদছে কেন? মেজদিকে সে যে এতখানি ভালবাসে আগে বোঝা যায় নি। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করল শবু, বলল—

'পরে যখন তোর কলকাতা যেতে ইচ্ছে হবে বলবি। আমরা ছুটিছাটাতে

কলকাতায় পরেও যাব, তোকে নিয়ে যাব, কেমন ?'

কতদিনের জন্য কলকাতায় যাবে, মা বাবা ভাইবোনদের দেখতে পাবে না—শবুর ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে। একদিন দীননাথকে বলল—

'শুনছো, আমার একটা কথা রাখবে ?'

'কি কথা ?'

'ভাবছি একদিন বাবা মা ভাইবোনদের নেমন্তন্ন করে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবো। তুমি কি বল ?'

'কভু কি অপূর্ণ রয় প্রিয়ার বাসনা' বলে দীননাথ হেসে সম্মতি জানাল।

শবু খুশিতে ডগমগ হয়ে সেদিন দুপুরেই চলল মা বাবাকে বলতে।

গিয়েই শবু মাকে ছেলেমানুষের মত জড়িয়ে ধরে বলল—

'মা গো, আমার ইচ্ছে আর তোমাদের জামাইয়েরও ইচ্ছে একদিন বাবা আর তুমি আমাদের ওখানে খাবে, আমি রেঁধে বেড়ে তোমাদেরকে খাওয়াব। পরে আবার কবে কখন সুযোগ পাব। মিতু শ্রীলা নন্দু কানাই তপুও খাবে।'

শুনে মা খুব খুশি হলেন, কিন্তু লোকাচারের কথা মনে হতেই মুষড়ে পড়লেন। বললেন—

'নাতির মুখ না দেখে বাপমাকে মেয়ের বাড়ী খেত নেই, অকল্যাণ হতে পারে।' শবুর মন খারাপ হয়ে গেল।

বাবা বিছানায় শুয়েছিলেন, সব কথা তাঁর কানে যাচ্ছে। মা শবুর দুঃখ দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন 'ওগো শুনছো, শবু আমাদের খাওয়াবে বলছে। যাবে কি ?'

বাবা প্রশ্রয়ের স্বরে মৃদু হেসে বললেন—'আমি ওসব মানিনা। খাওয়াতে চায়, বেশ ত, খাব।' সব চেয়ে আদরের মেয়ে শবু আগ্রহ নিয়ে রেঁধে খাওয়াতে চাইছে তিনি কি না করতে পারেন ?

মনে দ্বিগুণ খুশী নিয়ে শবু বাসায় ফিরল। দীননাথ অফিস থেকে ফিরতে তাকে সুখবর শোনাল…

'বাবা মা রাজী।'

দীননাথও খুশি হয়ে বলল—'তবে আর কি, লেগে পড়, সামনের রবিবারেই।'

আজ শবু প্রথম বাবা মাকে রেঁধে খাওয়াবে। তার মনের ভিতরটা আনন্দে তোলপাড় করছে। ফর্দমত সব জিনিষপত্র যোগাড় হয়েছে। হায়ার

মা মাছ কুটে, মশলা বেঁটে যোগান দিয়ে যাচ্ছে। শুধু বাবা মা-ই ত নয় সঙ্গে ভাইবোনরাও আছে। মা ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটু সকাল করে এলেন। তারপর মা মেয়েতে মিলে মহা উৎসাহে রান্না ও গল্প চলতে লাগল। শবু তার মধ্যে এক দুই পদ শাশুড়ীর কাছে শেখা রান্নাও রেঁধে ফেলল।

বাবা স্নান সেরে দুপুরে এসে রিক্সা থেকে নামতে শবু ও দীননাথ তাঁকে ঘরে বসতে দিল। বাবা মজবুৎ চৌকিটায় বসলেন, ওসব পলকা ডেকচেয়ার তাঁর দেহের ওজনের পক্ষে যথেষ্ট মজবুৎ নয়। রান্না হয়ে গিয়েছিল। মস্ত শোবার ঘরের একপাশে শশুর জামাই নন্দু আর কানাইকে শবু পরিপাটি করে খেতে দিল। মেয়েরা পরে খাবে, তপু এখন খাওয়ার ব্যাপারে এলেবেলে।

মা পদ্মিনী দেবী খাবার সামনে বসে জিজ্ঞেস করলেন—

'রান্না কেমন হয়েছে?'

বাবা অর্থবোধক ভাষায় বললেন—'এক রকম রান্না খেয়ে মুখ মরে গেছে—শবুর রান্নায় কিছু নতুনত্ব আছে।'

শবু কুণ্ঠিত হয়ে বলল—'বাবা, আমি নতুন রান্না শিখেছি তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না।'

বাবা বললেন—'না রে রান্না ভাল হয়েছে। আমার খুব ভাল লাগল বিশেষ করে এই দুটো তরকারি।'

শবু দেখল বাবা যে দুটো জিনিষ ভাল বললেন তার একটা শশুর বাড়ীতে শেখা অন্যটা মা পদ্মিনী দেবীর পরামর্শ মত তৈরী। মার দেখানো রান্নাটা ভাল হয়েছে তাইতেই শবু খুশী, নিজের রান্না যেমন তেমন হোক না কেন।

খেয়ে উঠে বাবা কয়েক মিনিট বসে বিশ্রাম করলেন। মা পান সেজে দিলেন শবুর পানের ডাবর থেকে—মার হাতে সাজা পান না হলে বাবার পছন্দ হয় না। শবু একটু একটু পান খাওয়া অভ্যাস করছে মার কথা মত। এক সেট ছোট্ট ছোট্ট পানের ডাবর, জাঁতি, চুনের খুঁটি, শুপুরী খয়েরের কৌটো যোগাড় করেছে—ঠিক যেন খেলনার সরঞ্জাম সব। মারও ছোট ছোট জিনিষ খুব পছন্দ, বাড়ীতে এরকম জিনিষ পেলে যত্ন করে রেখে দেয়। শবু ত সারাদিনে দুটো কি তিনটে পান খায়, তবে ঘরে দোক্তা জর্দার কোন ব্যবস্থা নেই। কোন অসুবিধে নেই, বাবার পকেটে দোক্তার কৌটো আছে। নিজে প্রয়োজন মত দোক্তা নিয়ে মার জন্য কৌটোটা রেখে বাবা একটা রিক্সা ডেকে বাড়ী মুখো রওনা হলেন দুপুরের বিশ্রাম করতে। মেয়ে জামাইয়ের বিছানায় ত আর শোয়া যায় না।

মা মিতু শ্রীলা ও তপুকে নিয়ে পরে শবু খেয়ে নিল। দীননাথ তার শালা শালীদের সঙ্গে হাসি গল্প করছে। মেঝেতে শতরঞ্চী বিছিয়ে পান মুখে দিয়ে মাতে আর শবুতে শুয়ে শুয়ে কেবল গল্প আর গল্প। এমন মা-মেয়ে বুঝি দেখা যায় না, যেন একাত্মা এক প্রাণ। কিন্তু বেশীক্ষণ গল্প করা গেল না, চারটের সময় বাবা যাবেন ডাক্তারখানায়, বাড়ীতে আর কেউ নেই, মা গেলে তবে তিনি বের হবেন। এখন চা খেতে গেলেও দেরী হয়ে যাবে। মা ছেলে মেয়েদের নিয়ে রওনা হলেন, দীননাথ রিক্সা ডেকে দিল।

যাবার আগে কানাই বলল—'মেজদি, আজকের খাওয়াটা ভাল হয়েছে।'

তপু বলল—'আবাল আতবো।'

শবুর জীবনে আজ সব থেকে সুখের ও তৃপ্তির দিন। সে নিজে হাতে রেঁধে বেড়ে বাবা মা ভাইবোনদের পরিতৃপ্ত করে খাইয়েছে। আজ তার জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হল। এ দিনটির কথা সে বহুদিন ভেবেছে—আজই তা সার্থক হ'ল। শবুর এধরনের কথা শুনে মা বলেছিলেন, জীবনে আরও কত বড় বড় সাধ আহ্লাদের দিন আসবে। কবে কি আসবে, আসবে কি আসবে না, তার জন্য আজকের এই পরিপূর্ণ তৃপ্তিকে সে ছোট করে দেখতে পারে না, সামান্য ত নয়ই।

রাতে শবু দীননাথকে নিজের মনের সুখের কথা, তৃপ্তির কথা জানাল। স্বামীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় বলল—

'তুমি খুব ভাল। আজ যে আয়োজন করলে, বাবা মা'কে রেঁধে খাওয়াতে পারলাম এ শুধু তোমার জন্যই সম্ভব হল।'

দীননাথ বলল—'অমন করে বোলো না। তুমি সুখী হলেই আমার সুখ। একে অপরকে সুখী করব বলেই ত আমাদের জীবন এক সূত্রে বাঁধা।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে কি যেন ভাবতে থাকে।

দীননাথকে ড্যাবডেবে চোখ করে ভাবতে দেখে শবু বলল—

'ড্যাবা খিড়স্। কি ভাবছ বল ত?'

'ভাবছি, এখানে আমরা দুজনে বেশ সুখে ঘর বেঁধে আছি। বেশ আনন্দে কটা বছর কেটে যাবার কথা। অথচ দেখ একটা বছরও হয়নি—একসঙ্গে এত সমস্যা দেখা দিয়েছে যে কোনদিক কিভাবে সামলাব ভেবে পাচ্ছি না।'

শবু ভাবে, এক বছর কোথায়, মাত্র ন' মাস হল তাদের বিয়ে হয়েছে। এখানেই চাকরি, একই সঙ্গে স্বামীর ঘর ও বাপের বাড়ীর টান দুটোই রক্ষা পাচ্ছে। তা আর কতদিন থাকবে কে জানে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি তার

ভাগ্যকে যেন কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। একদিকে ঋণের বোঝা, সোনা বন্ধক, ভবর পরীক্ষায় ফেল করা, তার উপর শ্বশুর বাড়ীর যে সঙ্কটের চেহারা দেখে এসেছে সে ত আরো মারাত্মক। চিন্তায় চিন্তায় মানুষটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে।

এবার দীননাথের পালা, শবুকে গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখে হেসে বলল—'ভেবি থিঙ্কস্। কি ভাবছ?'

শবু বলল—'না হাসি নয়। তোমার শরীর কত রোগা হয়ে গেছে, অত চিন্তা কর কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিন্তা এখন দুজনেরই মাথায়—কিভাবে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে উভয়েরই এখন সেই ভাবনা।

পয়লা তারিখ এসে গেল। ঘরে যে কটা ফার্নিচার ছিল অফিসের ঘরটাতে রেখে, বাসা ছেড়ে দিয়ে, বাক্স বিছানা সুটকেস্ ইত্যাদি নিয়ে দীননাথ আর শবু কলকাতা রওনা হল। আসার দিন বাসনপত্র সব মার কাছে রেখে এল।

মা বললেন—'দীনু, তোমরা আবার ফিরে এসো কিন্তু।'

দীননাথ বাবা মা ঠাকুমাকে প্রণাম করতে করতে বলল—

'নিশ্চয়ই আসব। আমরা ত ছুটিতে যাচ্ছি।'

যাবার সময় আবার শবুর চোখে জল—তিন মাস বড় লম্বা সময়, কতদিন বাবা মা ঠাকুমা ভাইবোনদের দেখতে পাবে না। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, আর বুঝি এখানে ফিরে এসে সংসার করা হবে না। বাসা ছেড়ে দেয়া হল নিছক আর্থিক কারণে—অন্তত একশ টাকার মত সাশ্রয় হবে তিন মাসে। এসে আবার অন্য বাসাও পাওয়া যাবে, অফিসের দু টাকার ঘরখানা ত আছেই। তবু বাসা ছেড়ে দেয়া মানেই বাস উঠিয়ে দেয়া। বদলি নিয়ে ওরা যাচ্ছে না সত্যি, স্বামী তার কাছে কিছু গোপন করে না। বদলির সামান্য আভাস থাকলেও নিশ্চয় তা শবুকে জানাত এটুকু বিশ্বাস এই ক' মাসের বিবাহিত জীবনে তার জন্মেছে। দীননাথের মনের সব কথা হয়ত তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়—কোন মানুষই অপরের মনের সব কথা জানতে পারে না, পারে শুধু অন্তর্যামী। তবু দীননাথ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে যেখানে তাদের দুজনের কথা জড়িত তা অবশ্যই শবুকে বলে। তাই এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মনের চিন্তাকে ত বশে রাখা যায় না—মন অনেক সময় কু-গায়। কি ঘটতে পারে, কি হতে পারে তার কোন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না কেবলই

যেন মনে হতে থাকে—একটা কিছু হবে। নানান আশঙ্কার কথা মাকে আর বলা হয় না, মনের কথা মনেই গোপন করে ঠাকুমা মা বাবাকে প্রণাম করে ভাইবোনদের আদর করে শবু কলকাতা রওনা হল। ভয় কি? সঙ্গে এবার দীননাথ আছে, সে তার স্বামী তার রক্ষাকর্তা। স্বামীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে তার মনে কোন দ্বিধা নেই, বরং স্বামীর উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে সে পরম সুখ পায়, নিশ্চিন্ত থাকে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শবু মাকে বলল—

'আসি মা, আবার আসব।'

মা বললেন—'আসবি বৈকি, দীনু তোকে নিয়ে আসবে। সাবধানে থাকিস, পৌঁছা সংবাদ দিস। দীনু তুমিও চিঠি দিও।'

চোখের জল মুছতে মুছতে শবু ষ্টেশনে এল, ট্রেন যখন চলতে লাগল তখনও সে চোখ মুছে চলেছে।

দুই

বরানগরের সেই ভাড়া বাড়ীটায় মেজদা বিশ্বনাথ ছাড়াও আছেন বাবা কালীনাথ, শেলী, ভব ও সোনা। মহী এ বাড়ীতে আসেনি, অন্য বাসা ঠিক হলে সেখানে আসবে। মা মঙ্গলাদেবীর এখানে আসা যাওয়া কম। একেবারে নাই বললেই চলে।

শবু এখন এ বাড়ীর হালচাল অনেকটা বুঝতে পেরেছে। আসলে মা মঙ্গলাদেবীকে কেন্দ্র করেই ভাইয়ে ভাইয়ে এত গণ্ডগোল, মনোমালিন্য। বিশ্বনাথের বক্তব্য—তুমি মা, মায়ের মত থাক, সংসারটাকে গুছিয়ে নিয়ে চালাও। তাই বলে এই অভাবের সংসারের টাকা এদিক ওদিক করে মাতুলের সংসার টানা চলবে না।

মহী আবার অতটা বোঝে না—মা যদি মনে দুঃখ পায়, ওদেরকে যদি না দেখে তবে ঘর সংসার আগলাবে কে তা সে বুঝতে পারে না। শেলীর কলেজ লেখাপড়া আছে, বাড়ীতে একটা বৌ নেই, সংসার আগলাবে কে?

এই নিয়েই যত সমস্যা যত ঝগড়া তর্ক, কোন বিশেষ ঘটনা ত উপলক্ষ মাত্র। এখন মেজো ছেলের দুর্ব্যবহারের কথা বলে তিনি দূরে দূরে আছেন, বাড়ীতে কোন বৌ থাকলে দোষটা বৌদের ঘাড়ে চাপত কিনা বোঝা যায় না।

এবারে সকলে আসার পর খরচের হাল শক্ত হাতে ধরেছে স্বয়ং বিশ্বনাথ, কোন অপচয় কোন নয়-ছয় হতে দেবে না। মা না থাকাতে ঘর সংসারের সব দায় পড়েছে এখন শেলীর উপর। সে ঘর সামলাচ্ছে, কলেজ করছে, পড়াশুনা করছে। মিলিটারী ব্যারাকের বাড়ীতে থাকতেও দেখা গেছে মা শুধু সকালের রান্নাবানা করে দরকারে কিছু সেদ্ধ কাচাকুচি করে চলে যেতেন একবেলার বেশী কোনদিনই থাকতেন না। এখন শবু আসাতে শেলীর অনেক উপকার হ'ল। সংসারের রান্নাবান্নার ভার শবুই নিয়ে নিল। মাত্র তিন মাসের জন্য হলেও যেটুকু পারে অবশ্যই করবে। শেলী তার সেজ বৌ-দিকে তার কৃতজ্ঞতা জানায়। শান্তিপ্রিয় বাবা কালীনাথ খুশি হন।

দীননাথের এখন ছুটি, সে হাটবাজারের দিকটা সামলায় শবুর কাজে সাহায্য করে, বাবা মেজদা ভাই বোনদের সঙ্গে গল্প করে, অবসর মত শবুকে কলকাতার নানা জায়গা দেখিয়ে আনে।

একবার সেই মাতুলালয়েও গেল বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে ঘরমুখো করতে। শবুকেও সঙ্গে নিয়ে গেল যদিও তার করার কিছু ছিল না। দেখল একটা রিফিউজী কলোনীতে তিন চারটে ছেলেমেয়ে, এক ছেলের বৌ গোটা দুই নাতিসহ মাতুলের সংসার। মা আবারও জানালেন, ও বাড়ীতে গিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না শুধু মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করবেন, বাসা বদল হলে তখন দেখা যাবে, এই কচি বৌটার-উপর দাদার এত বড় সংসার চাপিয়ে দিয়ে তিনি যেতে পারেন না। ওদিকে কচি মেয়ে শেলী কি করে পাঁচ সাত জনের সংসার টানছে? তা তিনি কি করবেন, তাই বলে ত তিনি ছেলের দুর্মুখ শুনতে, যেচে অসম্মান নিতে সেখানে যেতে পারেন না।

নিজের সংসার নিজের স্বামী ছেলেমেয়ে, সেখানে অপমানের কথা আসে কি করে শবু বুঝে পায় না। একি শুধুই মান সম্মানের প্রশ্ন না টাকার উৎস বন্ধ হয়ে গেছে বলেই! মাতুল লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লাগল না যদিও প্রণাম একটা করতেই হল। মা মঙ্গলাদেবী আবার আশপাশের দু চারটা বাড়ীতে শবুকে নিয়ে গেলেন—

—এই দেখ আমার সেজ ছেলের বৌ, রূপে গুণে একেবারে স্বয়ং সরস্বতী।

শবু সরস্বতী কিনা জানে না, তবে আর কদিন পরেই দুর্গাপূজা।

আর কোনদিন পূজোর সময় কলকাতায় থাকলে ভিড়ের মধ্যে শবু পূজো

দেখতে যাবে না। এই পুজোর মধ্যেই যা কাণ্ড হয়েছিল—মাথায় থাক তার ঠাকুর দেখা।

একে ত এখানকার রকমারী প্যাণ্ডেল, লাইট, মাইকের গান ও প্রতিমা দেখে তার চক্ষুস্থির। অধিকাংশ পুজোই রাস্তার উপর, কারো নেই নিজস্ব মণ্ডপ। সে তুলনায় মন্দির শহরের পুজো কত ছিমছাম শান্ত ভক্তি ভালবাসায় ভরা। এখানে বড় উদ্দাম ও চোখ ঝলসানো ব্যাপার।

তার উপর নবমীর রাতে দীননাথ তার দুই মাসতুতো ভাই ও শবুকে নিয়ে গিয়েছিল—ফায়ার ব্রিগেডের পুজো দেখতে। কলকাতার খুব নাম করা পুজো আর ডেকরেশন।

বাস থেকে নেমে দেখে—কী ভিড় কী ভিড়! শেলী এই ভিড়ের ভয়েই আসতে রাজী হয় নি।

ভিড় ঠেলে দড়ির লাইন ধরে শবু মূর্ত্তির সামনে পৌঁছল। মেয়ে আর পুরুষদের আলাদা আলাদা লাইন। শবু তখন মেয়েদের ভিড়ে একা—দীননাথকে পুরুষদের ভিড়ে দেখতে পাচ্ছে না। মাসতুতো ভাইদেরও পাত্তা নেই। ঠাকুর দেখবে কি, ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেছে।

কোনরকমে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে দড়ির পাশে এসে চেনামুখ খুঁজছে—কিন্তু সেই প্রচণ্ড ভিড়ে তাদের কোথায় খুঁজে পাবে! একখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না, মেয়েদের ভিড়ের ধাক্কায় বারবার ছিটকে পড়ছে। শেষে ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে দড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল। তবু কারো দেখা নেই।

এর পর কি হবে! কি করবে? আর এক পা এগোলে ত জনসমুদ্র—তখন কে শবু, কে দীননাথ—পথ ঘাটও সে চেনে না, হাতে নেই একটি পয়সা। শবু শেষ শালের খুঁটিটাকে প্রাণপণে চেপে ধরে জন-স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

কতক্ষণ মেয়েদের ধাক্কা সামলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। হঠাৎ দেখতে পেল দীননাথ কিছুটা দূর থেকে শবুকে দেখতে পেয়ে জনস্রোত উজান ঠেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। শবু আনন্দে শিউরে উঠে বাঁ হাত তুলে নাড়াতে লাগল। অনেক কষ্টে দুজনে কাছে এল, একে অপরের হাত শক্ত করে ধরল, ভয়ে বিবর্ণ শবুর মুখে হাসি ফুটল।

দীননাথ গভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল—'খুব ভয় পেয়েছিলে, তাই না?'

অভিমানী গলায় শবু বলল—'ভয় করবে না? পথঘাট কিছু চিনি না,

আর এই প্রচণ্ড ভিড়। কোথায় হারিয়ে যেতাম আর একটু হলে!'

দীননাথ চিন্তিতভাবে বলল—'আমিও ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, তোমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তবে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। ভাবছিলাম প্রতিমা দেখতে এসে বুঝি আমার সোনার প্রতিমা হারিয়ে গেল।'

'আহা, এখন আবার ঠাট্টা করা হচ্ছে! যদি সত্যি সত্যিই প্রতিমা বিসর্জন হয়ে যেত?' হাসিকান্না মেশানো গলায় শবু জবাব দিয়েছে।

মাসতুতো দুই ভাইকে খুঁজে না পেয়ে শবুরা বাড়ী ফিরে এসেছে—তাদের জন্য কোন চিন্তা নেই, পথ চেনে।

আর সে রাতে অনেক আদর করে দীননাথ শবুর ভয় ও অভিমান ভাঙায়। শবুর অনুরোধে সে কথা দিল, আর কোনদিন ওসব ভিড়ের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবে না।

বিজয়া দশমীতে শবুর ভীষণ মন খারাপ। বিয়ের পর প্রথম দুর্গা পুজো। সে ভেবে রেখেছিল বিজয়ার বিকেলে মা কাকীমাদের সঙ্গে গিয়ে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরাবে। সেই সঙ্গে মা কাকীমাদেরকেও। তার চোখে যে মাদুর্গা ও মা অভিন্ন। কিন্তু তা না হওয়াতে সব যেন কেমন বিস্বাদ লাগছে। কোন রকমে পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়ে এল। অবশ্য কিছু অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে সিঁদুর বিনিময় হয়েছে—কুমারী শেলী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

পুজোর দিন দুয়েক বাদে বরানগরের বাসায় এসে উপস্থিত হল রাঁচির বন্ধু সেই গোপেনবাবু।

মনে পড়ে গেল মাস ছয় আগের রাঁচিতে বেড়াতে যাবার সেই দিনগুলির কথা। পাহাড়ে ওঠা, ঝর্ণা দেখা, ফটো তোলা, পথে পথে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষের দল বেঁধে আসা যাওয়া। কলকাতার এই ভিড়ের মধ্যে সে যেন এক স্বপ্নের দেশ মনে হয়।

দীননাথ রাঁচিতে তোলা ফটোগুলো বের করে গোপেনকে দেখাল। ফটো ভাল না হলেও যা হোক চেনা যাচ্ছে, প্রথম ভ্রমণের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

'তারপর কি ব্যাপার, কলকাতায় ছুটিতে এসেছেন নাকি?' দীননাথ জানতে চাইল।

গোপেন বলল—'রাঁচি থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছি এক সপ্তাহ আগে, খুঁজে পেতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

আরও জানাল, এখানকার অফিসে দীননাথের উপযুক্ত একটা পদ খালি আছে। ইচ্ছে করলে দরখাস্ত করে দেখতে পারে। চা জলখাবার খেয়ে গোপেন চলে গেল।

শবুর বুকের ভিতরটা ধুকপুক করতে থাকে—কি খবরই শোনাল! যা ভেবেছে ঠিক তাই। রাতে শোবার সময় দীননাথ চিন্তিতভাবে বলল—

'এখানে একটা পোস্ট খালি আছে বলল। সংসারের এই হাল। দূরে থেকে কিছু করাও যাচ্ছে না। কলকাতায় আসতে পারলে কিছু টাকাও বেশী পাওয়া যাবে—আবার সংসারটাকেও দেখা যাবে। একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি? তুমি কি বল?'

শবু আর কি বলবে, সে ত কোন দিকই ফেলতে পারে না—না বাপের বাড়ী না শ্বশুর বাড়ী। তবু শ্বশুর বাড়ীটা যদি আর পাঁচটা বাড়ীর মত হত, তা হলে এখানেই মন প্রাণ সঁপে দিয়ে সংসারের সেবা করতে পারত! বিয়ে যখন হয়েছে, দীননাথের সঙ্গে তার জীবন অবিচ্ছেদভাবে জড়িয়ে আছে। এ সংসারের ভাল মন্দের সঙ্গে তার ভাগ্যও জড়িয়ে গেছে। এখানে তার প্রয়োজন একটা দায়িত্বও আছে।

দীননাথ শবুকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল—

'বাবা মা ভাইবোনদের থেকে দূরে থাকতে হবে ভেবে ভাল লাগছে না, তাই না? আমারও এতটুকু ইচ্ছে করছে না অমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে এই পরিবেশে এসে থাকতে। তবে সংসারের হাল ত তুমি নিজের চোখে দেখছ, এখানে আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। এ অবস্থায় কি করি বল ত?'

এবার শবু বলল—'যা ভাল মনে হয় কর, আমি আর কি বলব। সকলের কথাই ত ভাবতে হবে।' তার চোখের সামনে একান্নবর্ত্তী সংসারের ছবি—বাবা বলতেন, আমাদের একান্নবর্ত্তী সংসার। বাবার মাথাটা ত সবার সামনে হেঁট হতে দিতে পারে না—সকল শক্তি দিয়ে সে বাবার একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরবে, তার জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে সে প্রস্তুত।

শবুর সম্মতিতে দীননাথ অভিভূতের মত তাকে জড়িয়ে ধরে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল—

'এই ত আমার জীবনসাথীর কথা, সহধর্মিণীর কথা। তোমার অমতে আমি কিছু করতে পারি না। তবু তুমি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না। কথা দিচ্ছি যদি কলকাতায় বদলি হয়, যতদিন এখানে থাকব প্রতিবছর না হলেও এক বছর পর পর তোমাকে অন্ততঃ একমাস দেড়মাসের জন্য বাবা মার কাছে

নিয়ে যাব। কেমন, খুশি ত?'

শবু কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলল—'ঠিক?'

'ঠিক।'

পরদিনই বদলির দরখাস্ত দিল্লীর পথে রওনা হয়ে গেল থ্রু প্রপার চ্যানেল।

দিদি কিঙ্কিণী ও জামাইবাবু সুশীল কলকাতায় এখন মামাবাড়ী ছেড়ে আলাদা বাসায় থাকে। সেখানে বিজয়ার পর দেখা করতে যাবার প্রস্তাব দিল দীননাথ। শবু তৎক্ষণাৎ রাজী। দিদির কাছেই সে অনেক মনের কথা বলতে পারবে। মা কাছে নেই, দিদি তাকে মায়ের মত স্নেহ করে সেই ছোটবেলা থেকেই।

শবুরা গিয়ে দেখা করতে কিঙ্কু ও সুশীল দুজনেই খুশি। অনেকদিন পর দুই বোন এক ভিন্ন পরিবেশে দেখা হতে গল্পে মেতে উঠল। কলকাতায় বদলির কথা হচ্ছে শুনে সুশীল বলল—

'খুব ভাল। ওখানে সমুদ্রের ধারে পড়ে থেকে কি হবে? এখানে লাইফ আছে।'

দিদি বলল—'তোমার ত ইষ্টবেঙ্গল টীম আর ওয়াইফ থাকলেই লাইফ। এ দিকে মেয়েদের যে বাপের বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদে সে কথা বোঝ কি?'

শবুও বলল—'হ্যাঁ জামাইবাবু, আপনারা বড় স্বার্থপর—সবাই।'

দীননাথ বলল—'দাও ফিরে সেই সমুদ্র। আমরা তবে সমুদ্রের তীরেই ফিরে যাই।'

দিদি বলল—'তা কেন? আমরা বলছি তোমরা শুধু মেয়েদের মনটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর।'

সুশীল দীননাথকে নিরস্ত করতে বলল—'মেয়েদের বাপের বাড়ীর কথা উঠলে আর কোন কথাতেই চিড়ে ভিজবে না। অতএব ও চেষ্টা ছেড়ে দাও ভায়া।'

অনেকক্ষণ চা দেয়া হয়েছিল, সুশীল চায়ের কাপে হাত না দিয়ে দীননাথের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের সিগারেটটা ছ সাত মাসের ছেলের মুখের কাছে ধরে বলছিল—'বাবা, একটা টান দিবি?'

শবু বলল—'ও জামাইবাবু আপনার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।'

সুশীল হেসে বলল—'আমার ঠাণ্ডা চা-ই ভাল। কোল্ড টী এণ্ড ওল্ড ওয়াইফ আর এভার হার্মলেস্। কোন ক্ষতি করে না।'

কিঙ্কিণী ফোঁস করে উঠল—'ওল্ড ওয়াইফ নয়, বল—আগলি ওয়াইফ। কালো কুচ্ছিৎ বৌএর দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না—নিশ্চিন্ত।'

সুশীল নির্বিকার ভাবে মেনে নিল—'ঠিক কথা'। পরে দীননাথকে বলল 'তুমি কিন্তু নিজের সুন্দরী বৌকে নিয়ে সাবধানে চলাফেরা কোরো।'

দীননাথ বলল—তা আর বলতে। এই ত সেদিন পূজোর ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টায় খুঁজে পেয়ে তবে প্রাণে বাঁচি।'

ফেরার পথে দীননাথ বলছিল, এদের বাসাটা বিশেষ ভাল না যদিও এলাকাটা ভবানীপুর। শবু আর তার কি করবে, এ রকম জায়গায় চল্লিশ টাকায় ঘর পেয়েছে তাই ঢের। শবু ভাবছে অন্য কথা। যদি বদলি হয়ই তবে দিদির মত একজন আপন লোক হাতের কাছে পাওয়া যাবে। দুটো মনের কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

তিন

বাবা মার কাছ থেকে বিজয়ার চিঠি এসেছে। শবুরাও এসে পৌঁছা সংবাদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিল—কিন্তু এই প্রথম বাবা মার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে শবুর আনন্দ আর ধরে না। মা লিখেছেন, সবাই মিলে নতুন বাড়ীতে উঠেছে দোতলার দুখানা ঘরে। বারবার করে সে চিঠি পড়ল, একটা লাইন একটা শব্দও বাদ যায় না, যেন পড়া মুখস্থ করছে।

অনেকবার পড়ে তার পরে বসল কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে। প্রথমে ত কি করে চিঠি লিখতে হবে বলে দেবার জন্য দীননাথকে অনেক সাধাসাধি করে কোন রকমে বাবাকে কয়েক লাইন চিঠি লিখে ফেলল। তার পরে মাকে লিখতে গিয়ে শেষে লেখা আর ফুরোয় না। 'এবারে ইতি টান, অনেক লিখেছ, আর বেশী লিখলে খামে বেশী টিকিট লাগবে' এসব বলে দীননাথ ঠাট্টা করতে থাকলেও সে মার চিঠি সংক্ষেপ করতে পারল না। লেখা শেষ করে দীননাথকে বলল—

'দেখ ত, কোন ভুলটুল আছে কিনা। আমার আবার বাংলাভাষায় যা জ্ঞান।'

দীননাথ পড়ে দেখে বলল—'এই ত তুমি বেশ গুছিয়ে চিঠি লিখতে পার। তবে আবার আমাকে দেখিয়ে দিতে বলছিলে কেন? কখনো আমাকে চিঠি

লিখতে হলে এই রকম লম্বা চিঠি দিতে হবে কিন্তু।'

শবু আদুরে গলায় বলল—'সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন এটা খামে পুরে খামের মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করে ঠিকানা লিখে পোষ্ট করে দাও। বাবার নামটা স্পষ্ট করে লিখবে—ডাঃ গিরীন্দ্র কুমার মৈত্র—ডাক্তার কথাটা বড় বড় করে লিখবে।'

দীননাথ কপট বিরক্তি দেখিয়ে বলল—'বাবা রে বাবা! বাপের বাড়ীর চিঠি, এতটুকু ত্রুটি থাকার উপায় নেই।'

স্বামীর কাছে শবু কোন কিছু গোপন করে না, তার অগোচরে কোন কথা সে বাপের বাড়ীতে লিখতে চায় না। স্বামীকে সে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, একাত্ম করে ভাবে। প্রতিদানে তার কাছে পায় গভীর মমতা আর ভালবাসা।

কদিন ধরে ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে চলল কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখা। হাতের কাছের দক্ষিণেশ্বর বেলুড় মঠ থেকে আরম্ভ করে পরেশনাথের মন্দির, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক, গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন, বটানিক্যাল গার্ডেন। বটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে থাকেন দীননাথের একমাত্র পিসী মহামায়া দেবী। তাঁর বাসাতেও যাওয়া হল। পিসীর এক নাতনী অরুর সঙ্গে দেখা হল সেখানে—তার গলায় সব সময় খেয়াল ঠুংরির তান লেগেই আছে। শিগগীরই নাকি সে রেডিওতে গাওয়া শুরু করবে। শবুর বন্ধু সুনন্দাও ত নাকি এখন বড় গাইয়ে হয়ে উঠেছে, রেডিওতে গায় কি না কে জানে।

অরু—অরুন্ধতী মেয়েটা বেশ ভাল, খুব সরল। অল্প সময়ের মধ্যে শবুকে 'শ্রাবণীকাকী' বলে ডেকে ডেকে খুব আপন করে নিয়েছিল।

সামনে দেওয়ালী আসছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোজাগরী পূর্ণিমাতে এ বাড়ীতে কোন লক্ষী পুজো হল না। সবাই বলছে, দেওয়ালীর অমবস্যায় নাকি লক্ষী পুজো হবে।

শ্বশুর মশাই কালীনাথ বললেন—'এটাই আমাদের পরিবারের রীতি। গ্রামে ঐ নিয়মই চালু ছিল পূর্বপুরুষদের আমল থেকে—পঞ্জিকাতেও বিধান আছে ঐ তিথিতে মহালক্ষী ও অলক্ষী পুজার।'

কিন্তু সে দিনও ত প্রায় এসে গেল, পুজোর যোগাড় কে করবে, কি কি করতে হয় শবুর কিছুই জানা নেই।

শেলী তাকে আশ্বস্ত করে বলল—'মা ঠিক পুজোর আগের দিন আসবেই,

আর তখন সব ব্যবস্থা হবে।'

একদিন আগে এসে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কি জানি বাবা।

শেলীর কথাই ঠিক হল। পুজোর ঠিক আগের দিন বেলা দশটা নাগাদ শাশুড়ী ঠাকরুন এলেন, সঙ্গে পুজোর কিছু জিনিষপত্তর, দুধের খোয়া-ক্ষীর। এসেই দীননাথকে ডেকে এক বিরাট ফর্দ লিখিয়ে বলে দিলেন দুপুরের মধ্যে সব জিনিষ যোগাড় করে আনতে—চিড়ে খই তিল নারকেল, আতপ চাল গুড় চিনি বাতাসা ডাল আটা ময়দা আরো সব কি কি। দীননাথ ফর্দ হাতে সোনাকে নিয়ে বাজারে দৌড়ল। এদিকে কয়েকটা ইঁট পেতে মাটি দিয়ে লেপে অস্থায়ী উনুন বানিয়ে তাতে আঁচ পড়ে গেল। তিনি খেয়ে এসেছেন, শবুদের খাওয়া মিটতে মঙ্গলাদেবী নতুন উনুনে শুকনো খাবার তৈরী শুরু করে দিলেন—চিড়ের মোয়া, খইয়ের মুড়কী, তিলের নাড়ু নারকেলের নাড়ু, চাল ভেজে গুঁড়ো করে তার লাড্ডু, ক্ষীরের পেঁড়া, ছাঁচে তোলা নারকেলের আর ক্ষীরের তক্তি। শেলী শবু ভব সোনা এমনকি দীননাথও তাঁর নির্দেশ মত কাজ করে চলেছে, কেউ নারকেল কুরছে, কেউ চালভাজা গুঁড়ো করছে, খইয়ের ধান বাছছে, হাতে হাতে নাড়ু মোয়া পাকাচ্ছে, ছাঁচে ফেলে তক্তি ওঠাচ্ছে। অদ্ভুত তাঁর হাতের তাক, কোন জিনিষ একটু খারাপ হচ্ছে না বা নষ্ট হচ্ছে না। তারই ফাঁকে আর এক ফর্দ তৈরী করালেন কালকের পুজোর জিনিষপত্রের। সন্ধ্যার মুখে মেজননদ আর ননদাই কোলের মেয়েটাকে নিয়ে এসে গেলে ননদ কররবীও কাজে হাত লাগাল। সব শেষে মূর্ত্তির বদলে লক্ষ্মীর কাঠা সাজিয়ে রেখে রাত বারোটা নাগাদ সবাই শুতে গেল। রান্না ঘরটাকেই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে তারই একপাশে লক্ষ্মীর কাঠা বসানো হয়েছে, মঙ্গলাদেবী রাতে সেই ঘরেই শুলেন।

পরদিন সকালে উঠেই আবার শুরু হল কাজ। ঘরদোর লেপা পোঁছা, আলপনা দেয়া, ফুলদূর্বা চন্দন নৈবেদ্য সাজান, ভোগের খিচুড়ি তরকারি লুচি মোহনভোগ পায়েস, ফলমূল কাটা সব একেবারে মেশিনের মত চলছে। সন্ধ্যার মুখে পুরুতঠাকুর এসে পুজো সেরে দিয়ে গেলেন। তারপরে লক্ষ্মীর কথা শোনা হল—টুসনা-টুসনীর কথা। শেষে আশপাশের আত্মীয় স্বজন যারা এসেছিল সবাইকে খাইয়ে বাড়ীর লোকেরা খেয়ে শুতে শুতে আবার রাত বারোটা। মঙ্গলাদেবী সে রাতেও লক্ষ্মীর কাঠার পাশে শুয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন সকালে উঠেই তিনি মাতুলালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যে ঘরে লক্ষ্মীর কাঠা বসান আছে সে ঘরে তিনরাত্রি বাড়ীর

কোন বৌকে শুতে হয়, তিনি একরাত্রি থেকে গেলেন, আর দু'রাত্রি যেন সেজবৌ শেলীকে নিয়ে শোয়। দুদিন পরে এসে তিনি কাঠা তুলে দিয়ে যাবেন। মঙ্গলাদেবী চলে গেলেন—দু দিনে সারা বাড়ীতে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

দুদিন ধরে শবু আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, কি প্রচণ্ড খাটার ক্ষমতা—গায়ে যেন অসুরের শক্তি। কাজে কর্মে কোন ত্রুটি নেই, খাবার তৈরী ও রান্নার ব্যাপারে একেবারে পাকা হাত। সবই ভাল কিন্তু মুখ চলে অনর্গল, মুখের সামনে কে দাঁড়াবে? শবু ত সব সময় ভয়েই জড়সড। অনর্গল মুখ চললেও একটা কথা নেই শ্বশুর মশাই ও মেজো ভাশুর বিশ্বনাথের সঙ্গে। কাজ করার ক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। আছে কর্ত্তব্যজ্ঞান—নাই আন্তরিকতা, আছে মুখ—নাই মমতা। ছোট ছেলে সোনা, তাকেও একবার আদর করে দুটো কথা বলতে শোনা গেল না। চলে গেলেন, ছেলেমেয়েরা কেউ একবার তাঁকে থাকতেও বলল না। সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে—বলে লাভ হবে না, তিনি থাকবেন না।

শবুর অবশ্য একটা লাভ হল, বাড়ীর নিয়ম কানুন কিছু জানা হয়ে গেল। এ বাড়ীতে এখন নাকি শুধু লক্ষ্মীপূজো ও সরস্বতী পূজো হয় আর পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠেপুলি। অন্য কোন পূজো আর্চা হয় না।

বাবা কালীনাথ বললেন—'গ্রামে থাকতে বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হ'ত, শালগ্রাম শিলার নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। নগুণ হবার পর বিশ্ব, দীনু, মহী সবাই এককালে নারায়ণ পূজা করেছে।'

এখন দেখলে তা মনেই হয় না। দীননাথ ত কোন মন্দিরে গিয়ে মাথা পর্য্যন্ত ঠেকায় না।

সে কথার জবাবে বাবা বললেন—'ওটা একটা কালাপাহাড়। পোলিটিক্স শিখে বাবু হয়েছেন মার্ক্সিষ্ট—নাস্তিক কালাপাহাড়।'

শবু কিন্তু যতটা বুঝেছে দীননাথ ঠিক নাস্তিক নয় শুধু পূজোর নামে বাহুল্য আর ভড়ং পছন্দ করে না আর মন্দিরগুলোতে ভক্তির নামে চলে ব্যবসা।

ভাইফোঁটা এল, গেল। শেলী করবী ভাইফোঁটা দিল। তারপর করবী মেজো ননদাই ও মেয়েটাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। শবুদের ভাই হবার পর এই প্রথম শবু ভাইফোঁটা দিতে পারল না। মা চিঠিতে লিখেছিলেন, নন্দুর কি একটা অসুখ করেছে তাই নিয়ে সবাই চিন্তিত। এমন সুন্দর বুদ্ধিমান শান্তশিষ্ট ভাইটার কি অসুখ করল ভেবে শবুর বুকের ভিতরটা

টনটন করে। ভাবু অকালে চলে গেছে, এখন আবার নন্দুর জন্য চিন্তা। বিয়ের পর প্রথম বছরেই বিজয়া দশমীর সিঁদুর খেলায় মাকে কাছে পেল না, কেমন এক অদ্ভুত অমাবস্যার লক্ষ্মীপূজো হল, আবার ভাইফোঁটা দেয়াও হল না—শবুর মন খুঁত খুঁত করে।

পূজোর পর থেকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে, পরে বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো ভাইফোঁটা নিয়ে শবু এতই অন্যমনস্ক ছিল যে দীননাথের বদলির দরখাস্ত পাঠানোর কথা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় গোপেন এসে হাজির হতেই শবুর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল—তবে কি…?

গোপেন দীননাথকে জানাল দিল্লী থেকে এ অফিসে তার বদলির অর্ডার এসেছে।

শবুর আশঙ্কাই সত্যি হল। মার সেদিনের সেই আশঙ্কাও ঠিক ফলে গেল। শবুর মনে যেটুকু আশা ছিল বদলি হয়ত হবে না, তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। এ বাড়ীর লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী পূজোর পুণ্য ফল প্রায় হাতে হাতে ফলল। এ লক্ষ্মী অলক্ষ্মী পূজো বুঝি তার জীবনকে শুধু ওলট-পালটই করে দেবে। গোপেন রাঁচিতে ওদের অনেক উপকার করেছিল, এখন তাকে আর একটুও ভাল লাগছে না। কেন যে লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল!

গোপেন চলে গেলে দীননাথ শবুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলল—'সত্যিই যে বদলি এত সহজে হয়ে যাবে ভাবিনি। খবরটা এসে যেতে ওখানকার জন্য মন কাঁদছে। আমরা ওখানে কি সুন্দর নিরিবিলিতে ছিলাম। সবেরই মূলে আমাদের দারিদ্র্য। দূরে থাকতে গেলেও আবার সংসারটাকে দেখা হয় না। কি যে করি।'

এখন আর বলে কি হবে? লোকে বলে, ভগবান যা করে—মঙ্গলের জন্য। এ ত আর ভগবান কিছু করেনি, দরখাস্ত করেছিল বলেই ত। এখন আর দুঃখ করে কি হবে? দেখা যাক ভগবান কার কি মঙ্গল করে। কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী পূজোকে দোষ দিয়েছিল বলে মনে মনে ঠাকুরের কাছে শবু বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দীননাথ আবার বলল—'এখনই একমাস ছুটি বাতিল করে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা দু'দিনের মধ্যে মন্দির শহরে ফিরে যাব। সেখানে গিয়ে তোমার একমাস বাবা মার কাছে থাকা হবে, আমারও একমাস ছুটি বাঁচবে, কিছু টাকা পয়সার সুবিধে হবে বদলি-ভাতা পেয়ে, বন্ধকের সোনাগুলো

ছাড়িয়ে আনা যাবে, কুম্বর সিংএর দেনাও কিছুটা শোধ করা যাবে। তা ছাড়া আসার সময় মাকে কথা দিয়েছিলাম ফিরে আসব, সে কথাটা ত রাখতে হবে।'

এতক্ষণে শবুর মুখে হাসি দেখা দিল—বেশ ভাল কথা বলেছে। একেবারে চলে আসার আগে বাবা মা ঠাকুমা ভাইবোন কাকা কাকীমা সবার সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে। সেই সঙ্গে এখানকার দুমাসের অভিজ্ঞতার কথাও মা ঠাকুমাকে জানানো যাবে।

অতএব দুদিন পরে ওরা ফিরে চলল মন্দির শহরে। যাবার আগে দীননাথ বাবা ও মেজদাকে বলল—

'আমরা একমাস পরে বদলি হয়ে আসছি। শ'খানেক টাকায় তিন চারখানা ঘরসহ অন্য বাসা ঠিক করে মহীকে নিয়ে সকলে সেখানে যান।'

সোনা ভব শেলী ওদের বদলির খবরে খুব খুশি। শবুর মনটাই শুধু খারাপ—বাবা মাকে আর কাছে পাবে না। সবার চেয়ে আপনজন সব থেকে দূর হয়ে যাবে।

ছুটিতে আসার আগেই দীননাথ নোটিশ পেয়েছিল—এইদিনে ভুবনেশ্বরে জামা ঘড়ি ইত্যাদি চুরি মামলায় তাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে খুরদা কোর্টে, চোর নাকি ধরা পড়েছে। ছুটিতে থাকলে সে হয়ত একা সেখানে যেত—কিম্বা একেবারে না-ও যেতে পারত—নিজের দায়ের করা মামলা, আসামী ত নয়। লাগসই দিনক্ষণ পেয়ে ব্রেকজার্নি করে দীননাথ শবুকে নিয়েই চলল সাক্ষী দিতে। খুরদা রোড ষ্টেশন থেকে বাসে খুরদা শহর বেশ কয়েক মাইল দূর। কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে এক ঝাঁকড়াচুলো লোককে—অথচ চুরি করেছিল ত মনে হয় একটা বাচ্চা মেয়ে। না, ঐ লোকটার ঘরে বেশ কিছু চোরাই মাল পাওয়া গেছে যার মধ্যে দীননাথের সেই শার্টটাও ছিল।

কোর্টে অসামীপক্ষের উকিল অনেকগুলি শার্ট দেখিয়ে দীননাথকে প্রশ্ন করল—'ইহা ভিতর কোন শার্ট আপনঙ্কর কহি পারিবে কি?'

দীননাথ—'এই ডোরাকাটা ফুলশার্টটি আমার।'

বিচারক—'দেখিবে আউ কিছি বিশেষ চিহ্ন অছি কি?'

দীননাথ—'আজ্ঞে, ধোপাবাড়ীতে দেয়া '।॰' এইরকম চিহ্ন আছে।'

শার্টটা সঠিক চিহ্নিত হল কিন্তু তা ইঁদুরে কেটে এমন শতছিদ্র করেছে

যে তার আর কানাকড়ি মূল্যও নেই।

দীননাথ জানতে চাইল—'ঘড়ি পেন টাকা পয়সা অফিসের চাবি—সেসব কোথায়? সেগুলোই ত আসল।'

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার উত্তর দিল—'সে সব কিছি মিলি নাহি।'

উত্তরটা কোর্টে উপস্থিত সকলেরই হাসির খোরাক যোগাল।

তবে আর কি হবে? প্রায় দেড়শ টাকার জিনিষ চুরি গেল তার কিছুই নাই শুধু একটা ইঁদুরে কাটা শার্ট আছে। এখন চোর শাস্তি পাক আর না পাক তাতে ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই। সাক্ষী দেওয়ার ভ্রমণ ভাতা প্রায় তেইশ টাকা নিয়ে, নাকের বদলে নরুণ পাওয়ার আনন্দে সারাটা দুপুর বিকেল কোর্ট কাছারী করে হোটেলের খাবার খেয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শবু ও দীননাথ সন্ধ্যার গাড়ীতে মন্দির শহরে এসে নামল।

চার

ছুটি ফুরোবার একমাস আগেই অসময়ে সন্ধ্যাবেলায় শবুরা হঠাৎ নতুন বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল। মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'হ্যাঁরে শবু, ছুটি শেষ হবার এত আগেই এলি, কিছু হয়নি ত? ওখানকার খবর সব ভাল ত?'

শবু মা ঠাকুমাকে প্রণাম করতে করতে কেঁদে ফেলল, বলল—'মাগো, তোমার জামাইয়ের কলকাতায় বদলি হয়েছে।'

শবুর মুখে বদলির কারণ সব শুনে মা-ও কেঁদে ফেললেন—'বেশ কাছে কাছে ছিলি, এবেলা ওবেলা দেখতে পেতাম কি ভাল লাগত। দু' মেয়ের বিয়ে হ'ল দু'জনেই কলকাতা চলে গেল। আমাদের কপালে ভালটা হয়না।'

ঠাকুমাও অনেক দুঃখ করে শেষে বললেন—

'এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে। সরকারী-চাকরি বদলির চাকরি। অন্য কোথাও কবে হয়ত বদলি করে দিত। তার চাইতে কলকাতায় বদলি হয়েছে, নিজেদের সংসারটাকেও দেখতে পারবে। একরকম ভালই হয়েছে।'

মা বললেন—'হ্যাঁ, আপনাদের ত সবেতেই ভাল। দেখছেন না, নতুন বাড়ীতে এলাম আর নন্দু কি রকম হয়ে গেল।'

শবু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে মা, নন্দুর কি হয়েছে?'

মা বললেন—'দুঃখের কথা আর কি বলব, মা। আমরা যেদিন ওখানকার বাস তুলে দিয়ে নতুন বাড়ীতে এলাম, মালপত্তর সব আগে পাঠানো হয়েছিল, আমরা এসে রিক্সা থেকে নেমে দরজার কড়া নাড়তে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল গঙ্গারাম, যে আমাদের কাপড় কাচে। সেই থেকে আমার মনে খটকা লেগে রইল—এ আসা বোধ হয় শুভ হল না। লোকটার আবার অপয়া নাম আছে, আর ঠিক ঐ সময়ই ওর এখানে কাপড় নিতে আসতে হল? দু সপ্তাহও গেল না একেবারে হাতে হাতে ফল ফলল। সুস্থ সুন্দর ছেলে নন্দু পড়াশুনায় বেশ ভাল ক্লাশ সেভেনে পড়ে, এখানে আসার কদিন পর থেকে কেমন হঠাৎ অস্বাভাবিক হয়ে গেল—কারো সঙ্গে কথা বলে না, শুধু নিজের মনে বিড়বিড় করে। ওর বন্ধু সুদাম আর ভিক্টরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঝে মাঝেই নন্দু আমাদের পুরোনো বাড়ীটায় যেত। সেই তোরা ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেলি তখন থেকেই ও যেন কেমন ছটফট করত। বলত, মেজদি এখানে নেই আমার কিছু ভাল লাগে না। তোকে ও সব থেকে বেশী ভালবাসত, তোরা যাবার পর ওর সে কি কান্না। আমরা কত করে বলি, মেজদি নেই আবার তিন মাস পরেই আসবে—তা কিসের কি। আর এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই ও বারবার করে কখনো বন্ধুদের সঙ্গে কখনো একাই সকাল সন্ধ্যায় পুরোনো ঐ খালি বাড়ীটায় যেত। মনে হয় কোন এক সন্ধ্যাবেলা একা একা সেখানে গিয়ে কিছু দেখে ভয় পেয়েছে কিম্বা কেউ তুকতাক করেছে।' বলতে বলতে মা ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

ঠাকুমাও কেঁদে বললেন—'ও যে তোদের দাদু, আগের বাড়ীর মায়াতেই এ সংসারে জন্মেছে। তাই ঐ বাড়ীর টানেই বারবার ওবাড়ীতে যেত। আমাদের বলত—এ বাড়ীর ঘরগুলো কেমন ছোট ছোট ঘুপচি, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ও বাড়ীতে কত সুন্দর বড় বড় ঘর, খোলামেলা, চল আমরা ও বাড়ীতে যাই। সে বাড়ীতে যে ওর নাড়ী পোঁতা আছে।'

এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! ঠাকুমার কথা শুনে শবুর আরো ধাঁধা লাগে। সব ছাপিয়ে বুক থেকে ঠেলে ওঠে কান্না। ছুটে গেল দোতলায় নন্দুর কাছে। নন্দু বিছানার উপর একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। শবু গিয়ে তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল—

'নন্দু, লক্ষী ভাইটি আমার, এই দেখ আমি এসেছি। আমার দিকে তাকা।'

নন্দু শবুর দিকে একবার তাকাল, ফিক করে একটু মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বলল 'হুঁ।'

শবু আবার ওর মুখটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল—'বলত আমি কে? আমাকে চিনতে পারছিস না?'

নন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট স্বরে বলল—'মেজদি, শ্রাবণী।'

শবু হেসে কেঁদে নন্দুকে জড়িয়ে ধরল—

'ওমা, এই ত তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস। তুই আমার সঙ্গে একটু কথা বল, আগের মত গল্প কর।'

নন্দু আর কিছু না বলে নিজের মনে একটু একটু মাথা দোলাতে লাগল। তাকে হাসাবার জন্য মা বললেন—

'শবু, তুই ওকে একটু গান গেয়ে শোনা ত।'

শবুর গান গাওয়া এ বাড়ীতে সবার হাসির খোরাক। শবু গান ধরলেই ভাই বোনেরা এমন কি মা ঠাকুমাও হেসে গড়িয়ে পড়ে। মার কথায় শবু সঙ্গে সঙ্গে যা মনে আসে একটা গান ধরল বেসুরো গলায়। এক লাইন গাইতেই নন্দু ফিক করে হেসে ডান হাতে মুখ চাপা দিয়ে বলে উঠলো—

'তুমি চুপ কর।'

শবু আনন্দে কেঁদে নন্দুকে আবার আদর করে বলতে লাগল—'লক্ষ্মীটি, আরো কথা বল, অনেক কথা বল।'

নন্দু আস্তে করে শবুকে ঠেলে দিয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল—'না'।

মা বললেন- 'তুই এসেছিস, তাই এত কথা বলল, না হলে কোন কথাই বলে না। শুধু খিদে পেলে আমাকে ডাকে—মা খেতে দাও। ওকে নিয়ে যে আমি কি করি!' বলে মা আবার কাঁদতে লাগলেন।

শবু কাঁদে অনর্গল ধারায়, কেঁদে বলে—'মাগো, এর কি কোন চিকিৎসা নেই? কেমন শান্তশিষ্ট ভাইটি কিরকম হয়ে গেছে—এ যেন সে মানুষই নয়।'

মা বললেন—'তোদের বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে, দেখা যাক কি হয়। না হলে হয়ত কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে সময় সুযোগ করে।'

দুর্ভাগ্য যেন পরিবারটিকে তাড়া করে ফিরছে। গিরিনবাবু সবে একটু গুছিয়ে বসতে চাইছেন, বাড়ীটা কোন রকমে দাঁড় করানো গেছে। কোন কিছু নেই, একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত। কি যে হবে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নন্দুর অসুখের বিবরণ এক অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। আরো একটা জিনিষ শবুকে বিস্মিত করে তুলল।

ঘণ্টাখানেক হল শবু এ বাড়ীতে এসেছে। নীচে থাকতেই সে বড়কাকীমাকে দেখে এসেছে রাতের রান্না করতে, তাঁকে প্রণাম করেছে কথাও হয়েছে। এতক্ষণ মা নন্দুর ঘরে কথা বলছিলেন, হঠাৎই 'দেখি রান্নাটা একটু দেখে আসি' বলে নীচে না গিয়ে ছাদের অপর অংশটায় একটা চালা-ঘর মত আছে সেখানে চলে গেলেন। শবু ভাবল, এক জায়গায় বুঝি ঠাকুমার রান্না, অন্যটায় আর সকলের। না, তা কি করে হবে? ঠাকুমা ত বিধবা, তাঁর জন্য আবার রাতের রান্না? ছুটে গেল মার কাছে, সেখানে এক প্রস্থ পুরোদস্তুর রান্নার আয়োজন। ভয়ে ভয়ে শবু মাকে জিজ্ঞেস করল—

'কি ব্যাপার মা?'

আর এক তাজ্জব ব্যাপার জানা গেল, শবু যা কখনো কল্পনাও করেনি। অবাক হয়ে মার মুখ থেকে সব কথা শুনতে লাগল। · ···

সব ঠিকঠাক। পরদিনই সবাই এ বাড়ীতে চলে আসবে। মালপত্তর টানাটানি হচ্ছে ওবাড়ী থেকে এবাড়ী। গিরিনবাবু ডাক্তারখানায় বসেই সব খবরাখবর করছেন। বেলা প্রায় এগারোটা। ডাক্তারখানায় বসে আছেন রাখহরি বাবু, নীলুবাবু, ঘটকবাবু, ব্রজবাবু ও আরো দু একজন। হঠাৎ হৈম সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলের সামনে বলল—দাদা, তাহলে কাল তোমরা ও বাড়ীতে যাচ্ছো? গিরিনবাবু বললেন—হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই ত করছি, আজ সব মালপত্তর যাচ্ছে।

হৈম একটু ইতস্তত করে বলল—দেখ দাদা, তোমরা যাচ্ছ ভাল কথা—আমার কিন্তু ছোট সংসার।

ডাক্তারখানায় হঠাৎ যদি বাজ পড়ত তাতেও কেউ বোধহয় ততটা আশ্চর্য্য হত না যতটা হল হৈমর কথায়। কথার ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট—ঘর সুদ্ধ লোক হতবাক! বিস্ময় কাটিয়ে রাখহরিবাবু অনেক করে বোঝালেন ·

—দেখ হৈম, মহিম ছিল আমার বন্ধু, ভাইএর মত। সেই সূত্রে গিরিন অবিনাশ তুমি সবাই আমার পুত্রস্থানীয়। অবিনাশ চাকরির খাতিরে বাইরে সংসার পাততে বাধ্য হয়েছে। তোমার চাকরি যখন এখানেই, হাঁড়ি আলাদা করে শুধু শুধু সংসারটা ভাঙবে কেন? সুখে দুঃখে ভাইয়ে ভাইয়ে এক হয়ে থাক।

না, হৈমর সেই এককথা। শেষে রাখহরিবাবুই বিধান দিলেন—হৈম,

তুমি যখন আমার কথা, এখানে উপস্থিত আর কারো কথা শুনছোই না তখন এক কাজ কর। তোমাদের মাকে তোমার মেজোছেলেই রাখ, তাঁর পক্ষে এই বয়েসে ত আর বারবার উপর নীচ করা সম্ভব নয়।

হৈমর তাতে কোন আপত্তি নেই, মা ত বৌকে হাতে হাতে কাজে সাহায্যও করতে পারবে। আর মার টানটাও বিয়ের পর থেকে মেজবৌয়ের প্রতিই একটু বেশী। হৈম নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ হৈম ছিল বেদনায় গিরিনবাবুর মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বের হয়নি।......

শেষে মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন—'আসলে এ সবই মেজবৌয়ের পরামর্শে হয়েছে।'

তাজ্জব হয়ে শবু জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা মা, বাবা শুধু চুপ করেই রইল কিছু বলল না?'

মা বললেন—'না, ঠাকুরপোর সামনে 'সে' কিছুই বলতে পারেনি। সেদিন ডাক্তারখানা থেকে ওবাড়ীতে ফিরে তার সে কান্না যদি দেখতিস। একবার কাঁদে আর একবার বলে—আমার একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি সবাইকে গর্ব করে বলতাম—আমরা তিনভাই চিরকাল এক অন্নে থাকব। সারা শহরের লোক আমাদেরকে দেখিয়ে আদর্শ পরিবারের কথা বলত, উদাহরণ দিত। আমার সে গর্ব ধুলোয় মিশে গেল। মহিম মৈত্রের পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

'আমিও ত কত বছর হ'ল বিয়ে হয়ে এ সংসারে এসেছি, এদের তিন ভাইয়ের মত এমন মিল কোথাও দেখিনি—ঠিক যেন তিন বন্ধুর মত।'

শবু জানতে চাইল—'আর ছোটকাকা?'

মা বললেন—'ছোট ঠাকুরপো আর কি করবে? খুব দুঃখ করে চিঠি দিয়েছিল, বড়ঠাকুরপোকেও অনেক বুঝিয়ে চিঠি লিখেছিল। কে কার কথা শোনে? একবার ভেঙে গেলে কি আবার জোড়া লাগে, না আগের মত হয়? ভাঙা সহজ, গড়াটাই কঠিন।'

হায়রে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরতে নিজে মনে মনে রক্তাক্ত হয়েও শবু দীননাথের বদলির প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল, আর আজ তার কি দশা! এখানে এসে এ দৃশ্য দেখতে হবে সে কল্পনাও করেনি। এখানকার একান্নবর্ত্তী পরিবারের ছবি মনের মধ্যে রেখে ওখানকার সংসারকে বাঁচাতে শবু হাড়িকাঠে গলা দিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু কার জন্য এতসব

করা? দাদু মারা যাবার পর বড়কাকা ছোটকাকা কারো চাকরি নেই, বাবা হোমিওপ্যাথির পুরিয়া বিক্রি করে যে পয়সা পায় প্রায় তাই দিয়ে সংসার চলত। পরে অবশ্য কাকারা চাকরি পেয়েছে, ছোটকাকাকে দূরে যেতে হয়েছে। বড়কাকাকে শবুর বেশী ভাল লাগত, কেমন সরল আপন-ভোলা মানুষ—সেই কাকা শুধু বৌয়ের বুদ্ধিতে ভিন্ন হল? কেন? বাবার সংসার বড় বলে? বাবার আয় ত এখন খারাপ নয়। পুরোনো সব আদর্শ, মূল্যবোধ যেন ধসে পড়ছে। শবুও ত তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সেবা করতে যাচ্ছে। কি ফল পাবে সে সেবার? পাবে কি ঐ অদ্ভুত চরিত্র শাশুড়ী ঠাকরুনের মন, কি প্রতিদান পাবে সে আজকের পড়ুয়া ননদ দেওরদের কাছ থেকে?

সবচাইতে খারাপ লাগে-একই বাড়ী, দুটো আলাদা হাঁড়ি, ভিন্ন হেঁসেল। মা সেই কোন অল্প বয়েসে এ বাড়ীতে বউ হয়ে এসেছিল, দেওর দুটিকে নিজের ভাইয়ের মত আপন করে নিয়েছিল। বাবার ত কথাই নাই, তিন ভাইয়ে এত মিল একসঙ্গে ওঠাবসা গান বাজনা হাসি গল্প আড্ডা—এ সবই শবুর নিজে চোখে দেখা। বড় ছোট কোন ভেদ নাই, বাইরের বন্ধু যারা তারা তিন ভাইয়েরই বন্ধু—কারো কোনো আলাদা বন্ধু পর্য্যন্ত নাই। সেই বাবা মার মনে কত ব্যথাই না লেগেছে। আর ঠাকুমা? তিনিই বা হেঁসেল আলাদা হতে দিলেন কি করে, সহ্যই বা করছেন কি ভাবে?

রাতে গিরিনবাবু বাড়ী ফিরলেন। দীননাথ আগেই ডাক্তারখানায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বদলির ব্যাপার সব জানিয়েছে। শবু বাবাকে প্রণাম করে মাথা নীচু করে দাঁড়াল—বাবার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না। বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললেন—

'দেখছিস ত সব? আমরা কি সুখেই আছি!'

এ ত কথা নয়, যেন অন্তরের হাহাকার, বুক ফাটা আর্ত্তনাদ। শবু কেঁদে বলল—

'বাবা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'কেঁদে আর কি করবি? ভেবেছিলাম তোরা এসে আবার এখানে থাকবি, তোদের মা বুকে একটু বল পেত তুই কাছে থাকলে। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হয়েছি, নন্দুর কি এক অদ্ভুত অসুখ করল। তোরাও নাকি চলে যাচ্ছিস।'

শবু কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল—

'বাবা, আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। এখন সব ঠিকঠাক—আর ফেরাব কি করে? আমি বাধা দিলে এ বদলি হয়ত নিত না। শুধু ঐ সংসারের কথা ভেবেই আমি বাধা দিইনি।'

'আমিও ত প্রায় পনরোটা বছর একান্নবর্ত্তী পরিবারের সাধনায় প্রাণপাত করলাম। তার ত এই ফল হ'ল। এখন দেখ তুই সেখানে কতটুকু কি করতে পারিস।' বলে বাবা অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে পোষাক পাল্টে মুখহাত ধুতে গেলেন।

ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে কে যে কোথায় ছিটকে পড়বে কেউ জানে না।

পাঁচ

একটা মাস শবুদের ঐ নতুন বাড়ীতেই থাকা—অনেকটা যেন মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছে। দীননাথ এখনও এখানে চাকরি করলেও শুধু একমাসের জন্য তাকে বাসা নিতে বলা যায় না। উপরের দুখানা ঘরেই কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দেওয়া আর কি। উপরের দু-খানা ঘরে বাবা মা নন্দু তপু-কানাই-শবু-আর-দীননাথ। নীচের দুখানা ঘরে ঠাকুমা মিতু শ্রীলা—বড়কাকা কাকীমা শঙ্খ। উপরে নীচে আলাদা আলাদা রান্না, আলাদা ঝি। এক কলতলা, এক বাথরুম। তপু আর শঙ্খ একসঙ্গে খেলা করে। মিতু শ্রীলা মেয়েদের স্কুলে পড়ে—মিতু সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। কানাই আগের মতই বড়মার স্কুলে পড়ে, খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়। নন্দুর এ অবস্থায় পড়াশুনার কথাই ওঠে না।

কানাইয়ের সবই অদ্ভুত ব্যাপার, কখনই সোজা পথে বাড়ীতে ঢুকবেনা বা বেরুবে না। একবার সামনের প্রাচীর ডিঙোয় ত অন্যবার পিছনের প্রাচীর। মা চিৎকার করেন, 'ওরে কানাই প্রাচীরে উঠিস না, পড়ে যাবি বাবা'—কে কার কথা শোনে। দেখে শুনে তপুও কানাইকে সব সময় চোখে চোখে রাখে। যেই সে প্রাচীর ডিঙোতে যায় অমনি তপু চেঁচিয়ে ওঠে—

'মা, দাদা আবাল পাতিলে উথেথে।'

মা পড়ি কি মরি করে ছুটে আসেন—'বাবা কানাই, নেমে আয় বাবা, পড়ে গেলে হাড়গোড় ভাঙবে।'

ঠাকুমা চিৎকার করেন—'ওরে ডানপিটে, নেমে আয় শিগগীর নইলে তোর বাপকে বলে দেব।'

কানাইয়ের কোন কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই। শবুও কাকুতি মিনতি করে—

'আয় ভাই নেমে আয়, অত উঁচু প্রাচীরে উঠিস না।'

কানাই প্রাচীরের উপর বসে বসে নিরুপায় মেয়ে মানুষগুলোর উদ্বেগ ব্যাকুলতায় মজা অনুভব করে, ঠিক যেন বংশীধারী ব্রজের রাখাল গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করে কদমগাছের ডালে বসে নির্বিকার চিত্তে বাঁশী বাজায়। কানাই প্রাচীরের উপরেই বসে বা দাঁড়িয়ে এমন ভান করে যেন এই বুঝি পড়ে গেল, আর নীচের মেয়েমানুষগুলো হায় হায় করতে থাকে। নন্দুর ঐরকম অবস্থা, ডাবু করেই চলে গেছে, বলতে গেলে সেই এখন বাবা-মার শিবরাত্রির সলতে পড়ে গিয়ে তার যদি কিছু হয়, কে রক্ষা করবে? বাবার কানেও কথাটা গেল।

একদিন আবার প্রাচীর টপকাতে গেছে, তপুও চিৎকার শুরু করেছে 'মা, দাদা আবাল পাতিলে উথেথে।' বাবা বাথরুমে ছিলেন, বেরিয়ে এসে কানাইকে হাত ধরে টেনে নামালেন। কানাইয়ের মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে—তার ধারণা ছিল বাবা ডাক্তারখানায় চলে গেছে। বাবা বাড়ীর এককোণ থেকে একটা মোটা বাঁশ যোগাড় করতে করতে বললেন—

'আজ আমি হয় তোর ঠ্যাং ভাঙবো নয়ত তোর মাথা ফাটাবো।'

মা ঠাকুমা হাউমাউ করে ছুটে এলেন কানাইকে বাঁচাতে, শবুও ছুটে গেল—'বাবা মেরো না, মেরো না।' বাবা কানাইকে মারতে গিয়ে বুঝি মা মেয়েকেই দু এক ঘা মেরে বসলেন, শবুর হাতে এক জায়গায় কালসিটে পড়ে গেল। বাবা অপ্রস্তুত হয়ে বাঁশ রেখে দিলেন।

ঠাকুমা চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে এরই মধ্যে মন্তব্য করলেন—

'তোরাও ঐরকম ছিলিরে, গিরিন।'

গিরিনবাবু কপট রাগ দেখিয়ে বললেন—'মা, তুমি কিছু বলবে না।'

'কই আর কি বললাম' বলে ঠাকুমা আবার চোখ দুটো পিটপিট করলেন।

গিরিনবাবু বাইরে যেতে যেতে বলে গেলেন 'বাপ এককালে মাতাল ছিল বলে কি ছেলেকে মদ খেতে বারণ করবে না?'

মাঝখান থেকে শবুর কালসিটে পড়া জায়গায় জলপটি বাঁধতে হল—বেশ জোরেই লেগেছে, ওর আবার ফর্সা রং, একেবারে নীল হয়ে ফুটে উঠেছে। এতক্ষণে কানাই লজ্জা পায়, গুটি গুটি মেজদির পাশে এসে ঘন হয়ে বসে,

মেজদির গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। বাঁশের একটা ঘা-ও বুঝি কানাইয়ের গায়ে লাগেনি, মা ঠাকুমা দিদিরা সব চারদিক থেকে আগলে রেখেছিল—ওই যে এখন তাদের একমাত্র আশার প্রদীপ।

এরই মধ্যে এক রাতে দুর্গাবাড়ীতে নাচ গান হবে—শ্রীলার সেখানে ওড়িষি নৃত্যের অনুষ্ঠান আছে। বিকেলে শ্রীলা শবুর বিয়ের বেনারসীটা চেয়ে নিয়ে দুর্গাবাড়ী চলে গেল সাজতে। পরে দুর্গাবাড়ীতে গিয়ে শ্রীলার নাচ দেখে শবুরা ত মুগ্ধ—বেশ ভাল নাচ শিখেছে। শবুদের আমলে বড়মার স্কুল ছাড়ার পর থেকেই মেয়েদের নাচ গানের ইতি। মিতু পর্য্যন্ত সেই ধারাই চলে এসেছে—শ্রীলাদের আমলে তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। মা ঠাকুমাদের শ্রীলার নাচ দেখা হল না—নন্দুকে একা ফেলে আসতে পারেন নি। বাবা বড়কাকা সময় করে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবা কাকা হেঁটে বাড়ী ফিরছেন। সঙ্গে দীননাথও আছে।

দীননাথ বাবা কাকাদের কান বাঁচিয়ে শ্রীলাকে বলল,—'তোর নাচ দেখে অবাক হয়েছি, তুই যে নাচ শিখছিস জানতাম না ত।'

মিতু বলল—'আমার নাচগান শেখার কত ইচ্ছে ছিল, শিখতে দিল না।'

কিছুটা পথ চলার পর বড়কাকা বললেন—'নাচ শিখেছে ভাল, কিন্তু শ্রীলা এখন বড় হয়ে গেছে, স্টেজে নাচা ভাল দেখায় না।'

বাবা বললেন—'ঠিক, ওর আর দুর্গাবাড়ীতে নাচা চলবে না—মেয়েদের স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলে নাচতে পারে।'

ব্যস, হয়ে গেল শ্রীলার নাচে ইতি।

পরদিন সকালে হঠাৎ মনে পড়তে শবু জিজ্ঞেস করল—

'এই শ্রীলা, আমার বেনারসীটা কই?'

তাইত! এতক্ষণে সবার মনে পড়ল কাল ফেরার সময় বেনারসীটা শ্রীলা হাতে করে আসেনি। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল।

শ্রীলা বলল—'নাচের শেষে আমি গ্রীনরুমে বেনারসীটা ছেড়ে যেন কার হাতে দিয়েছিলাম মনে পড়ছে না ত।'

এসব নাচ গানের ব্যাপারে বিপাশা—বিদিশাদিরাই দায়িত্বে থাকে। সবার কাছে খোঁজ করা হল—কেউ কোন হদিশ দিতে পারল না। গেল বিয়ের বেনারসীটা।

ঠাকুমা খুব আফশোষ করতে লাগলেন—'বিয়ের বেনারসী বলে কথা।

হারিয়ে গেল! এখনও বিয়ের একবছর পূর্ণ হয়নি। একি আর পূরণ হবে?"

শবুর মনের অবস্থা বলার নয়।

অবসর সময়ে মা ঠাকুমা শবুর কাছে তার শ্বশুর বাড়ীর দুমাসের অভিজ্ঞতার কথা শোনে। ঠাকুমা সব শুনে বললেন—

'কাজ কামের দিক থেকে ঠাকরুনের সবই ভাল। কিন্তু বাড়ীসুদ্ধ লোক যে তরাসে মরে। মেয়েমানুষ একটু কোমল নরম প্রকৃতির না হলে কি সংসার মানায়? শক্ত হতে হয় পুরুষমানুষদের। দেখিস নি, মোয়া বা নাড়ু বানাতে গেলে গুড় বা চিনি গলিয়ে নরম আঠার মত করে নিতে হয়, তবেই ভাল দানা বাঁধে। মেয়েদেরও তেমনি নরম কোমল হতে হয় তবে সংসারে বাঁধন থাকে।'

মা বললেন—'পুজোর সময় দীপু, ঠাকুরপো-রা এসেছিল। দীপু এতদিনে দীনুদের গাঁয়ে বিয়ে হওয়া তার দিদির কাছে জানতে পেরেছে, তোর শাশুড়ীর নাকি অসীম মনের জোর, খাটতেও পারে প্রচণ্ড—এক এক ব্যাপার বাড়ীর পুরো রান্না একাই রেঁধে উৎরে দেয়। স্বামী একটু নরম প্রকৃতির বলে ঠাকরুন একাহাতে সবদিক সামলে সংসারটাকে টেনে তুলেছে। কিন্তু প্রচণ্ড মুখ, মুখের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না, গাঁ সুদ্ধ লোক সভয়ে দূরে দূরে থাকে। এমন শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করা কঠিন ব্যাপার।'

এখন আর কিছু করার নেই। এসব কথা যদি আগে জানা যেত তবে সবাই ভেবে দেখত। ভেবেই বা কোন্ কূলকিনারা পাওয়া যাবে, ভবিষ্যৎ ত আর দেখা যায় না।

ছয়

মন্দির শহর থেকে শবুদের চলে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। এরই মধ্যে এসে গেল ওদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। মা সেদিন একটু বিশেষ খাবার দাবারের ব্যবস্থা করলেন। দীননাথ কার একখানা ক্যামেরা চেয়ে এনে পটাপট সকলের ফটো তুলতে লাগল। বাবা মা ঠাকুমা ভাইবোনদের নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হল। নন্দুকে সে গ্রুপে এনে বসান গেলনা—তাকে ছাড়া বাকি সবাইকে নিয়ে ফটো হল।

শবু দীননাথকে বলল—'বাবা ও মার দুটো সিঙ্গল আর একটা জোড়া

ফটো তোলো—সিঙ্গল দুটো যেন মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হয়, আমি দূরে থেকেও তাহলে বাবা মার পায়ে প্রণাম জানাতে পারব।'

তাও হ'ল।

শবু মিতু শ্রীলা কানাই আর তপু—এই পাঁচজনকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা ঝাউবনের ভিতর দাঁড় করিয়েছে দীননাথ ফটো তুলবে বলে। কানাই বায়না ধরেছে তার একটা সিঙ্গল ফটো তুলতে হবে। দীননাথ বোঝাতে গেল, আর মাত্র একটাই ফিল্‌ম্ আছে, তাহলে সকলের ফটো তোলা হয়না। কানাই তবে ফটোই তুলবে না বলে বালির উপর দিয়ে পায়ের স্যাণ্ডেল ফেলে রেখে খালি পায়েই ছুট লাগাল। দীননাথ দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনল, কানাই মুখ গোঁজ করে দাঁড়াল, দুপাশ থেকে শবু আর শ্রীলা তার দুটো হাত ধরে আছে, শ্রীলার আর এক হাতে ঝুলছে কানাইয়ের ফেলে যাওয়া স্যাণ্ডেল জোড়া, শবুর আর একপাশে কাপড়ের ডলপুতুল হাতে তপু। সেইভাবেই একখানা কিম্ভূত কিমাকার গ্রুপ ফটো তোলা হল।

মিতুরও বোধ হয় একখানা সিঙ্গল ফটো তোলার ইচ্ছে ছিল, তার আশা নেই দেখে সে বলল—'আজকের দিনে শুধু ফটো তুলছেন, একটা সিনেমা দেখালেও ত পারতেন জামাইবাবু।'

দীননাথ বলল—'সিনেমা দেখে দিনটা নষ্ট করব কেন, কাল দেখাবো ভাল বাংলা ছবি।'

সন্ধ্যেবেলা দীননাথ ও শবু যেখানে গতবছর তাদের বিয়ে হয়েছিল সেই ভাড়া বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল একেবারে সমুদ্রের ধারে ভিক্টরদের ভাড়া বাড়ীটার সামনে। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেছে—তবু মনে হয়—এই ত সেদিন। ব্যাণ্ড বাজিয়ে মাথায় টোপর দিয়ে দীননাথ এল বিয়ে করতে, বাসর ঘর, সেই সে প্রথম সান্নিধ্য, বাসি বিয়ে, বৌভাত—ফুলশয্যা, 'শুভবিবাহ—স্বাগতম্'—সব যেন এক একটা ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাড়ী দুটো একই রকম দাঁড়িয়ে আছে, নেই সেখানে আগের সেই পাত্র পাত্রী কুশিলবেরা, ভিক্টরদের বাড়ীর দরজার উপরে দেওয়ালে নেই সেই লেখাদুটি 'শুভবিবাহ স্বাগতম্'—পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনে রোদ বৃষ্টি ঝড়ে সে লেখা মুছে গেছে। কিন্তু ওদের মনের মণিকোঠায় এখনও তার স্মৃতি জলজ্বল করছে। একটু দূরে সেই অফিস বাড়ীটা, দীননাথের দুটাকার ঘর। অফিস নাকি এখান থেকে উঠে যাবে —হয়ত কটক ভুবনেশ্বরেও চলে যেতে পারে। তার আগেই শবুরা চলে

যাচ্ছে অনেক দূরে—কলকাতায়, এখানে পড়ে থাকবে শুধু স্মৃতি। আর থাকবে বাবা-মা ঠাকুমা ভাইবোনেরা। দুজনে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হাত ধরাধরি করে বেশ কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসে রইল, অনুভব করল অতীতের পুলক শিহরণ। তারপর সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে আসতে দুজনে ধীর পায়ে বাড়ী ফিরে চলল।

বাড়ী ফিরতেই মিতু স্মরণ করিয়ে দিল—

'জামাইবাবু, কাল আমাদের সিনেমা দেখাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, দেখাব।'

সকালে বড়কাকা হৈমবাবু শঙ্খকে নিয়ে উপরে এসে বললেন—

'বৌদি, আমো ঘরে সব শোইলেনি, শঙ্খর আজি এইঠি নিমন্ত্রণ।' বড় কাকা এখনো পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে রঙ্গ করেই কথা বলেন এবং বেশীর ভাগ স্থানীয় ভাষাতেই।

পদ্মিনী দেবী বললেন—'খনার শরীর খারাপ, শঙ্খর এখানে নেমন্তন্ন—আর শঙ্খর বাবা?'

হৈম একগাল হেসে লাজুক ভাবে বললেন—'সেও শঙ্খর পাশে বসে পড়বে।'

'তবে ত তার ব্যবস্থাও এখানে করতে হবে' বলে পদ্মিনী দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ঠাকুমা নির্ঝরিণী দেবীও উপরে উঠে এলেন বড়বৌমাকে কাজে কর্মে সাহায্য করতে অবশ্য শবু ত এসে থেকেই দুবেলা মাকে সাহায্য করছে।

শঙ্খর আজ এখানেই খাওয়া দাওয়া—তাই সব সময় উপরেই তপুর সঙ্গে খেলা করছে আর বড়মার পিছন পিছন ঘুরছে। বড়মা মাছ কুটতে নীচে গেল ত তপুর সঙ্গে সেও গেল। যদি কয়লা আনতে নীচে গেল ত সেখানেও।

কয়লা নেবার সময় শঙ্খ পাশ থেকে বলল -'বড়মা, মা যখন কয়লা নেয় তখন এখান থেকে কয়লা নিয়ে ওখানে রাখে।'

পদ্মিনী দেবী ত শুনে অবাক! একই জায়গায় আলাদা আলাদা করে দু-সংসারের কয়লা রাখা থাকে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কেমন করে রাখে?'

শঙ্খ সঙ্গে সঙ্গে বড় একখণ্ড কয়লা তুলে ওদিকের কয়লার মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বলল—'এমনি করে।'

ওমা, একি কাণ্ড! এসব কাজ কেউ করে নাকি আর তাও বাচ্চাদের

সামনে? জানাজানি হলে যে লজ্জায় সবার মাথা কাটা যাবে! শুনে পদ্মিনী দেবীরই লজ্জা করতে লাগল—মেজোজাকে সাবধান করাও যায়না, হয়ত উল্টে ঝগড়াই বাধিয়ে বসবে।

দুপুরে খাওয়া মিটলে শবুকে নিয়ে শোবার ঘরে পান সাজতে বসে পদ্মিনী দেবী স্বামীকে সব বললেন।

গিরিনবাবু নিজের পদমর্য্যাদার গুণে ভাই-বৌদের সম্বন্ধে কখনো কোন মন্তব্য করেন না। কিন্তু সংসারটা ভেঙে দেয়ায় তিনি এখন এতই বীতশ্রদ্ধ যে বলে ফেললেন—

'পুরুত বাড়ীর মেয়ে ত, আর কত হবে।'

শবু বলল—'কিন্তু বাবা, এতে যে ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।'

বাবা বললেন—'হলে হবে, বুঝবে ছেলে আর তার বাবা। মায়ের আর কি? হৈমকে সেদিন রাখহরিবাবু কত বোঝালেন, নীলু, ব্রজ, ঘটকবাবু কত বলল—কারো কথা কি শুনল? ভাল কথা কানে যাবে কেন?

মা বললেন—'থাক ও কথা, এখন মাথা গরম করে লাভ নেই। শুনছো, আজ কিন্তু আমরা রাতে সিনেমায় যাচ্ছি, দীপু দেখাচ্ছে। তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো—নন্দু মা আর খনা বাড়ীতে একা থাকবে।'

সিনেমা দেখতে তপু আর শঙ্করও সঙ্গে যাচ্ছে—ওদের টিকিট লাগেনা, মিতু শ্রীলা কানাই ত আছেই।

সিনেমা দেখে ফেরার পথে কানাই বলল—

'কি যে সব সিনেমা! মেয়েটা বলল সেফটিপিন আনতে যাচ্ছি শেষে অন্য একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে গেল। কিছু বোঝা যায় না।'

তপু বলল—'না দাদা, মেয়েতো মিথ্যে মিথ্যে ঐ কথা বলে ঐ লোকটার কাছে গেল।'

ওমা, শোন কথা! ঐ টুকু মেয়ের কি পাকা পাকা কথা! নীতিবাগীশ শ্রীলা তপুকে ধমক দিল—'তুই চুপ কর, রাস্তার মাঝে চেঁচাসনে।'

মিতু নতুন শোনা একটা গানের সুর গুনগুন করে চলেছে। বাড়ীতে ঢুকতে সবাই শুনতে পায় নন্দু মাকে ডাকছে—একনাগাড়ে—

'মা খেতে দাও…মা খেতে দাও…মা খেতে দাও।'

মার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল, শবুর দু চোখেও জল। হায়রে অবোধ! আর কিছু না থাকলেও মানুষের মত ক্ষুধা তৃষ্ণা ঠিকই আছে।

আর আজকের দিনটাই শবুরা এখানে আছে, কালকেই রওনা। এর মধ্যে একদিন গিয়ে বন্ধু হীরার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। শবুরা বদলি হয়ে যাচ্ছে শুনে সে খুব দুঃখ করে বলেছিল, বন্ধুরা সব বিয়ে হয়ে এক এক করে দূরে চলে যাচ্ছে, সামনের বছর বি এ পরীক্ষা হয়ে গেলে তাকে এখানে একাই পড়ে থাকতে হবে। হীরার মা-ও মেয়েদের বিয়ের কিছু করা যাচ্ছে না বলে চোখের জল ফেললেন।

অফিস যাবার সময় দীননাথ বলে গেছে, আজ বদলির টাকা পাবে তা থেকে কিছু টাকা দিয়ে বন্ধকী সোনাগুলো ফিরিয়ে আনবে আর কুম্বর সিংএর অর্ধেক দেনা শোধ করে দেবে, বাকি টাকা কলকাতা থেকে কিছু কিছু করে পাঠাবে। আনন্দে শবু সে কথা মাকে জানাল।

মা বললেন—'খুব ভাল কথা। সোনার জিনিষ নষ্ট হতে দিতে নেই। এই ত সেদিন তোর বিয়ের বেনারসীটা হারিয়ে গেল।'

শবুর এখন আর কোনদিকে মন নেই, সব সময় মার পায়ে পায়ে ঘুরছে—মা-ও উঠতে বসতে 'শবু' 'শবু' করছেন। কতদিনের মত মা মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হবে, তাই মনের কথা বলা আর শেষ হয়না। রাঁধতে, খেতে, পান সাজতে সাজতে, দুপুরে শুয়ে শুয়ে, বিকেলে ঘর দোরের কাজ করতে করতে, চুল বাঁধতে বাঁধতে কেবল গল্প আর গল্প। মা অনেকদিন পর আগের মত যত্ন করে শবুর চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দিলেন। শবুও মনের সুখে মায়ের চুল বেঁধে দেয়। শেষে দুজনে দুজনকে সিঁদুর পরাল—নোয়ায় শাঁখায় সিঁদুর ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। এখন ত আর শবু ছোট্টটি নেই যে কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলেই হল—এখন দুজনেই সধবা, এয়োস্ত্রী। মার হাতে সিঁদুর পরতে পরতে শবু মায়ের মত স্বামীভাগ্য কামনা করে মাকে প্রণাম করে, মা-ও শবুর থুতনি ছুঁয়ে আদর করে চুমু খান, আশীর্ব্বাদ করেন। বাবা-ই শবুর আদর্শ পুরুষ। মা তার চোখে আদর্শ নারী, চিরকরুণাময়ী মা।

মাঝে মাঝে আবার নন্দুর কথা মনে হলে তার কাছে ছুটে যায়, কিছুক্ষণ পাশে বসে, নন্দুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তুই তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।' নন্দু সে আদরে আরামে চোখ বুজে থাকে, শেষে হাত দিয়ে আস্তে করে ঠেলে দিয়ে বলে 'যা।' নন্দু বোধ হয় বুঝতে পারে মেজদি এবার অনেক দিনের মত দূরে চলে যাচ্ছে—তাই সে কেন একা একা মেজদির সব আদর ভোগ করবে, আরো ত ভাই বোন আছে। এই অসুখের মধ্যেও তার বুদ্ধি বিবেচনা বুঝি ঠিকই আছে—

সে যে চিরকালই ধীর স্থির শান্ত আর বিবেচক।

রাতে দীননাথ অফিস থেকে এসে জানাল, সোনাগুলো ফেরৎ পাওয়া গেলনা। অফিসের যে লোকের মারফৎ বাঁধা দেওয়া হয়েছিল সে জানিয়েছে যার কাছে বন্ধক রেখেছিল সে লোকটা নিজের কাজে বাইরে গেছে দু চার-দিনের জন্য। বরুণ ও কুম্বর সিংএর সামনে অফিসের লোকটাকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছে—সে লোক ফিরলেই যোগাযোগ করে সোনা উদ্ধার করে কলকাতায় খবর পাঠাবে। কুম্বর সিং তাগাদা দেবে। কুম্বর সিং বড় ভাল লোক—আপাততঃ অর্ধেক টাকা শোধ দেয়া হয়েছে, তবু বলে আপনার দরকার হলে আরো কিছু টাকা এর থেকে নিয়ে যান।

সে ত ভাল, কিন্তু সময়মত সোনাগুলো ফেরৎ পাওয়া গেলনা, শবুর মনটা ভাল লাগেনা—মার মনটাও খুঁতখুঁত করে।

সাত

আজ সকালে উঠে থেকেই শবুর দুচোখে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। মার চোখও ঘন ঘন জলে ভরে উঠছে। ঠাকুমা বড়কাকীমাও বারবার উপরে এসে কথা বার্তা বলে যাচ্ছেন। বাবা আজ বিকেলে দেরী করে ডাক্তার-খানায় যাবেন একেবারে শবুরা রওনা হয়ে গেলে পর। মিতু শ্রীলা কানাই কেউ স্কুলে যায়নি। সমস্ত বাড়ী আসন্ন বিদায়-লগ্নের প্রতিক্ষায় মূহ্যমান। নন্দুর সামনে যেতে সেও দু একবার 'মেজদি' বলল, তার চোখেও জল। দুপুরে খাবার পর আজ আর মা-মেয়েতে গল্প জমল না। কাঁদবে না গল্প করবে? ভাই বোন ঠাকুমা কাকীমা সবাই তাকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে, মাঝে মাঝে দু চারটে কথা হচ্ছে, আবার একটু কান্না হচ্ছে। বাবা অভ্যাসমত খাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে খাটে শুয়েছেন—কিন্তু তাঁর চোখেও সাধা ঘুম দিবানিদ্রাটি আসছে না, যে দিবানিদ্রায় ব্যাঘাতের জন্য একদিন তিনি ছোট শবুকে হাত ধরে বাড়ীর বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছিলেন।

শবু বলল—'ঠাকুমা, চিঠি দিও।'

ঠাকুমা বললেন—'নিশ্চয় দেব, তুই কোন চিন্তা করিস না।'

'বাবা, চিঠি দিও।'

'হ্যাঁ দেব।'

মা বললেন—'আমাকে আর বলতে হবে না। তোর চিঠি পেলেও চিঠি দেব, না পেলেও দেব। তুই কিন্তু চিঠি দিস্, পৌঁছা সংবাদ অবশ্যই দিবি।' পরে মা নির্ঝরিণী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জানেন মা, বিজয়ার পর আপনার বড় ছেলে জামাইকে আশীর্বাদী চিঠি লিখেছে। আমি দেখে বললাম—"মা, তুমি শুধু কল্যাণীয় দীননাথ লিখেছ, জামাইকে বাবাজীবন লিখতে হয় জাননা? তা বলে কি, আমি হলাম গিয়ে পঞ্চাশ বছরের যুবক, আমি ওসব লিখতে পারব না। সে লিখব যখন বুড়ো হব, তপুর বরকে বাবা-জীবন ফীবন যা হয় লেখা যাবে।'

বাবা শুয়ে শুয়ে মুখ টিপে হাসছেন। তপুর প্রতি বাবার আছে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। তপুর জন্ম ও ইঞ্জেকশন আবিষ্কার একই সময় হয়েছিল। ফলে কিঙ্কু শবু থেকে আরম্ভ করে জামাই জাবু পর্যান্ত বাবা যে দূরত্ব রেখে চলতেন তপুর বেলায় তার অনেকটাই ব্যতিক্রম ঘটেছে। বাপ মেয়েতে অনেক গল্প হয়—বাবার কাজে মেয়ে সাহায্য করে হাত নুড়কুতের মত। বাড়ীটা সবে তৈরী হয়েছে, টুকটাক অনেক কাজ বাকি। আজ এখানে পেরেক ঠুকতে হয়, কাল জানালাটা ঠিক বন্ধ হচ্ছে না সেটাতে হাত দিতে হয়, বারান্দা দিয়ে কাক বেড়াল এসে খাবার জিনিষে মুখ দেয়—বারান্দা জাল দিয়ে ঘিরতে হয়। তপু সবসময় যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে বাবার পেছনে হাজির। সীমার সেলাই মেশিন সারাচ্ছেন বাবা, সেখানেও তপু। বাবা দুপুরে ডাক্তারখানা থেকে ফিরলেই তপু জিজ্ঞেস করে 'বাবা তুমি কাদ করবে না?' বাবা 'হুঁ' বলে খুটখাট কাজে লেগে পড়েন, সঙ্গে তপু—আধঘণ্টা একঘণ্টা কাজ করে তারপর স্নান করে এসে খেতে বসেন।

তপু আবার সময় সময় বাবাকে ধমকও দেয়—'বাবা, তুমি কিচ্ছু পাল না।' বাবা বলেন 'হুঁ'। তপু বলে 'বাবা, একতা গান কলতো।' বাবা তক্ষুণি ইচ্ছে করেই একটু ভুল সুরে নীচু স্বরে গেয়ে ওঠেন—'ঝির ঝির ঝির বরষায়…'। তপু থামিয়ে দেয়, বলে 'বাবা তুমি গান কত্তে পালো না। এমনি কলে গাও—দির দির দির দির দির বলতায়…'। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে তপুর শুদ্ধ করা অবিশুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ সুরে গান ধরেন 'দির দির দির দির দির বলতায়…।'

শবু ভাবে তপু কত সুখী—বাবার সঙ্গে কত সহজভাবে মেশে, একেবারে বন্ধুর মত। শবুর হিংসে হয় না। বাবার ত এখন বয়েস হচ্ছে, হাতের কাছে টুকটাক জিনিষ এগিয়ে দেবার লোক দরকার। শবুরা যে দূরে দূরে থেকেছে

সেটা কোন ভয়ে নয়, বাবা ত কখনো কারো গায়ে হাত তোলেনি, বকেওনি —এ দূরত্ব শুধু সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের, ভক্তির গভীরতার। কখনো ত মনে হয়নি যে তারা বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—বরং শবুর প্রতি বাবার স্নেহ যেন অতিরিক্তই। হিংসে করবে কেন—অভিযোগই বা কিসের? এই যে বাবা আজ দেরী করে ডাক্তারখানায় যাবেন এ ত শুধু শবুর জন্যই, আর কোন ছেলে মেয়ের জন্য বাবাকে এরকম করতে দেখা যায় না।

অফিসে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ফেয়ারওয়েল সেরে দীননাথ এসে গেছে। এখন রওনার প্রস্তুতি। বাক্স বিছানা গোছান আছে। বিবাহ বার্ষিকীতে দীননাথ শবুকে একটা ছোট্ট চামড়ার সুটকেস কিনে দিয়েছে, তাতে সাজ-গোজের সরঞ্জাম ভরা হয়েছে। বেনারসীটা হারিয়ে যাওয়াতে মা শবুকে একটা ভাল শাড়ী কিনে দিয়েছেন, একদিন পরাও হয়েছে—সেইটা পরে সে রওনা হবে। পুজোর জন্য মেয়ে জামাইয়ের শাড়ী ধুতি পাঞ্জাবী মা আগেই দিয়েছেন। ফার্নিচারগুলো অফিসের ঘর থেকে সোজা ষ্টেশনে পাঠান হয়েছে।

হীরা এসেছে বিদায় সাক্ষাৎ জানাতে, বলল—

'তুই চলে যাচ্ছিস, আর আমি এখানেই পড়ে রইলাম।'

শবু বলল—'আবার মাঝে মাঝে আসব। তোর বিয়ের খবর দিস কিন্তু, আসতে চেষ্টা করব।'

'দেখ কবে হয়' বলে হীরা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চলে যাবে বলে কয়েকটা বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ শবুরা আগেই সেরে রেখেছে বিশেষ করে প্রীতিলজ ও বড় মাসীর বাড়ীতে। ঐ দুটো বাড়ীতে শবুদের প্রাক্‌বিবাহ কালের প্রথম দেখা সাক্ষাতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

হীরা চলে গেলে সন্ধ্যের মুখে শবু দীননাথ রাতের খাবার খেয়ে রওনার জন্য প্রস্তুত হল। মালপত্তর সব রিক্সায় ওঠান হয়েছে। ঠাকুমা বাবাকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে শবু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল—'মাগো, কতদিনের জন্য যাচ্ছি, আবার কবে দেখা হবে জানি না। আমাকে তোমরা চিঠি দিও, ভুলে যেয়ো না।'

নন্দুকে আদর করে চুমু খেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল—

'নন্দু, আমি যাচ্ছি। লক্ষ্মী ভাই আমার, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। আমি তোকে কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যাব।' নন্দু একবার মেজদির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—ওর চোখেও জল।

কাকা-কাকীমাকে প্রণাম করে মিতু শ্রীলা কানাই তপু শঙ্খকে আদর করতে তারাও কাঁদতে লাগল। কানাই কেঁদে বলতে লাগল—

'মেজদি, আবার আসিস, জামাইবাবু আসবেন।'

'আসি মা' বলে শবু দীননাথের সঙ্গে রিক্সায় উঠে বসল।

মা ধরা গলায় বললেন—'আয়, তোরা সাবধানে থাকিস, পৌঁছা সংবাদ দিস। দুর্গা দুর্গা দুর্গা। এসময় চোখের জল ফেলতে নেই।

ঠাকুমা কাকীমাও বললেন—'দুর্গা, দুর্গা'। রিক্সা চলতে শুরু করল। বাবা অন্য একটা রিক্সায় ওদের পিছনে রওনা হলেন ডিসপেন্সারীর উদ্দেশ্যে—যতটা পথ একসঙ্গে যাওয়া যায়, আদরের মেয়েটাকে যতক্ষণ চোখে দেখা যায়। শবু বারবার ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়ানো মাকে দেখতে লাগল. বাড়ীটা চোখের অ'ড়াল হতে ফিরে ফিরে বাবাকে দেখতে লাগল—শেষে বাবার রিক্সাও মোড়ের মাথায় এসে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হল : —চোখের জলে শবুর চারদিক ঝাপসা হয়ে গেল. শক্ত করে দীননাথের একটা হাত ধরে রইল। অকূল সংসার সমুদ্রে এই হাতই এখন শবুর আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন।

অফিসের কিছু লোক মালপত্রসহ আগে ষ্টেশনে পৌঁছে গাড়ীতে তুলে রেখেছিল। এবার শবুরা গিয়ে সেই ইণ্টার ক্লাশ কামরায় উঠল—বসা শোয়ার ব্যবস্থাও হল। ফার্নিচারগুলো কামরার অনেকটা জায়গা আটকে রেখেছে—টেবিল, চেয়ার, আলনা এমনকি মীটসেফ পর্য্যন্ত। তার ওপর বাসন কোসন. বাক্স বিছানা স্যুটকেশ ত আছেই। চেকার এসে আপত্তি জানাতে কুম্বর সিং বদলির কথা বলতে আর কোন আপত্তি করলনা। দীননাথ সঙ্গে একজন লোক নিয়েছে, নাম হরিবন্ধু—কলকাতার বাসায় সে রান্নার কাজ করবে খাওয়া ও মাসে দশ টাকার বিনিময়ে। তাকে পাশের থার্ড ক্লাশে তুলে দিয়েছে।

কুম্বর সিং বলল—'কোলকাতায় গেলে দেখা করব। নমস্তে বাবুজী. নমস্কার বৌমা।'

দীননাথ বলল—'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখা করবে। বক্সকের জিনিষগুলোর খোঁজ খবর কোরো। নমস্তে।'

অফিসের আর যে কজন এসেছিল তারা দীননাথ ও শবুকে দুটো কর্পূরের মালা পরিয়ে দিয়ে বিদায় জানাল—'নমস্কার আজ্ঞা।'

নমস্কার। বিদায়। বিদায় শবুর জন্মস্থান, বিদায় আশৈশব পরিচিত মন্দির শহর। আবার কবে তার কোলে ফিরে আসবে জানা নেই। শবুর চোখে

অশ্রুর ঢল নামল। নিজের ভাগ্যের কথাই মনে আসে। তার ভাগ্যটাই কেমন যেন অদ্ভুত। বিয়ের পর শ্বশুর মশাইকে কাছে পেয়েছিল, কিন্তু একটা মাসও তাঁর সেবা করার সুযোগ পেল না। যে অবস্থায় বিয়ে হয়েছিল, কেউ ভাবতে পারেনি যে একবছরের মধ্যেই বদলি হয়ে এখান থেকে চলে যাবে। মাঝখানের দু আড়াই মাস ত তাকে কলকাতায় শ্বশুর বাড়ীতে কাটিয়ে আসতে হয়েছে—বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তার সঞ্চয় হয়েছে সে সময় যার কোনটাই বিশেষ সুখকর নয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ আঠারোটা বসন্তের স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা জড়ানো নিজের জন্মভূমি, বাবা মা ঠাকুমা ভাইবোনদের ছেড়ে, সুখ দুঃখের বহু স্মৃতি পিছনে ফেলে রেখে শবু চলেছে বিচিত্র এক সংসারে, যেটা তার শ্বশুরবাড়ী—স্বামীর হাত ধরে। শবুর জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে, শ্রাবণী মৈত্র থেকে শ্রাবণী লাহিড়ী রূপে, এবার শুরু হবে দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে সে ছিল আপন পিত্রালয়ে—কন্যারূপে, ছি- এক সুন্দর পরিবেশে যেমন থাকে শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। এবার বধূরূপে শ্বশুর বাড়ীতে তাকে কত কি সইতে হবে সে ভাবনা, সে বেদনার, তার পূর্ণতা-অপূর্ণতার কথা বলবে ভাবীকাল।